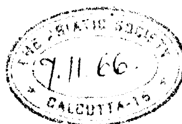
বৈশাখ, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী



বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৫ সন।

মুক্তি।

——ঃ৵ঃ——

ডাক্তারে যা বলে বলুক্ না কো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জান্‌লা দুটো,—গায়ে লাগুক্ হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া!
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে!
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ;
কত রকম কবিরাজী, কতই মুষ্টিযোগ,
একটু মাত্র অসাবধানেই বিষম কর্ম্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই ত ঘরে পরে,
সবাই আমায় বল্লে, লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি!
এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে

দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা,
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক্ একটা-কিছু,
সে কথাটা বুঝ্‌ব কখন, দেখ্‌ব কখন ভেবে আগু পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌চে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা,
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই ত আমি যে কি, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা!
শুনি নাই ত মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্চে সেই চাকাটা—ঐ যে থাম্‌ল যেন;
থামুক্ তবে! আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম্ম-দোলায় দোল্;

হেঁকেছিল, "খোল্‌রে দুয়ার খোল্‌!"
সে যে কখন আস্‌ত যেত জান্‌তে পেতেম না যে।
হয় ত মনের মাঝে
সঙ্গোপনে দিত নাড়া; হয় ত ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয় ত বাজ্‌ত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয় ত পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আস্‌তে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।
থাক্‌ সে কথা!
আজ্‌কে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌চে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেচে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।

বাইশ বছর ধরে'
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।

দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেচে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে!
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা!
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর!
জনম মরণ এক হয়েচে ঐ যে অকূল বিরাট মোহনায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়,
ভাঁড়ার-ঘরের দেওয়াল যত
একটু ফেনার মত।
এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে থাক্!
মরণ বাসরঘরে আমায় যে দিয়েচে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু!
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার করে দাও কালের পারাবার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ভারতবর্ষ।

(মানসী মূর্ত্তি)

——:*:——

যে দিন জলধি-গর্ভ হ'তে ভারতভূমি আপনার মস্তক উত্তোলন কর্‌লেন সে দিন বুঝি অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষে দেবতারা সহর্ষে আনন্দ-ধ্বনি করে' তার আবাহন করেছিলেন—আকাশ পথে দিব্যাঙ্গনারা বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে থেমে গিয়ে তাঁদের আনন্দ-পুলকিত আঁখি নত করে' একবার চেয়ে দেখেছিলেন—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ রক্ষ শূন্যপথে সব মিলিত হ'য়ে কৌতূহলোদ্দীপ্ত-চিত্তে জোড়-করে এ ধরিত্রীর পানে চেয়ে প্রণত হয়েছিল। সে দিন ঊর্দ্ধে অধঃ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঘোষিত হ'য়ে গিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের এক মহালীলা সংঘটিত হবে।

* * * * *

তারপর কে জানে কতযুগ ধরে' লোকচক্ষুর অন্তরালে জগৎ-জননী ভারতভূমি, আপনার অন্তর বাহির অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরে' তুলেছিলেন—আপনার লোভাতুর সন্তানদিগকে আপনার বুকে ভুলিয়ে আন্‌বার জন্যে। পদতলে তাঁর সফেন-তরঙ্গ পাগল সিন্ধুর অতল তলে কোটি কোটি শুক্তি-হৃদয় মুক্তায় মুক্তায় ভরে' উঠ্‌ল—খনিতে খনিতে কত মণি

মাণিক্য লালসাময় জ্যোতি বিকীরণ করে' চক্ মক্ করে' উঠ্‌ল—কল-নাদিনী গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরীর তীরে তীরে স্নিগ্ধ-শ্যামল বৃক্ষ-তল সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় ভরে গেল—বসুমতী আপনার বুক চিরে অনন্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত অপর্য্যাপ্ত অন্নদান কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

* * * * *

তারপর কে জানে কোন সুদূর অতীতের একদিন, কোন্ এক চিরতুষারাবৃত, চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশে জগত-জননী ভারত মাতার প্রথম আহ্বান গিয়ে পৌঁছিল। মানুষের স্মৃতির পটে বিলুপ্ত-প্রায় সেই অভিযান-কাহিনী কে জানে? কে জানে কত মরুর নিষ্ঠুর বক্ষের উপর দিয়ে, কত কত পর্ব্বত মালার দুরারোহ অভ্র-চুম্বিত চূড়া অতিক্রম করে', কত গহনঘন কান্তারে গোপন পথ খুঁজে খুঁজে, কত বৎসর পরে এই কল-নাদিনী নদী-সিক্ত ছায়া-স্নিগ্ধ জগন্মাতার শ্যামল-বুকে নিবিড় নীল আকাশের তলে পৌঁছে গিয়েছিল, মানব সভ্যতার সেই প্রথম পুরোহিতের দল—উন্নতশির, প্রশস্তললাট, বিশালবক্ষ, তেজো-পুঞ্জ দৃষ্টি, সরল সবল কলেবর। মানব সভ্যতার প্রথম পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বেশে জগন্মাতার বুকে এই বিশ্বমানবের মহালীলার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

* * * * *

আজ আমি আমার মানস নয়নে দেখ্‌তে পাই যে সেই চিরতুষারা-বৃত চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশ ছেড়ে যে দিন সেই সিন্ধুতীরে তাঁদের চোখের

সাম্‌নে পূর্ব্ব-দিগন্ত কনক রাগে রঞ্জিত করে', জবাকুসুম-সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধীরে ধীরে দিক-চক্রবালের নীচ থেকে আপনাকে তুল্‌লেন, সে দিন কি এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাঁদের চিত্ত মন প্রাণ সব ভরে' উঠেছিল। সেই মহাদ্যুতির করস্পর্শে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হ'ল। মানুষের মনের অন্ধকার দূর হবার সূত্রপাত হ'ল সে দিন, বিশ্বমানব ইতিহাসের সে এক জ্যোতির্ম্মণ্ডিত চিরস্মরণীয় দিন।

* * * * *

হিন্দুর সেই একদিন গিয়েছে যে দিন পঞ্চনদতীর-ভূমে বনে বনে তাপস-কবির আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সাম গান শুনে তরু লতা মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ত—বৃক্ষে বল্লরিতে ফুল ফুটে উঠ্‌ত। সেই ছায়া-সুনিবিড় বনে বনে সারা দ্বিপ্রহর আর মধুপ-গুঞ্জনের বিরাম নেই—বনকপোতের প্রাণ-উদাস করা ডাকের আর অন্ত নেই—বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রপুঞ্জে মর্ম্মর ধ্বনি তুলে সর্ সর্ করে' বাতাসের আনাগোনার আর বিরতি নেই ;—সেই বনভবনে শান্তি-সমাকুল পর্ণকুটীরে কত কত ঋষি এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌বার জন্যে ধ্যান নিরত। হিন্দুর জীবনের ইতিহাসে সেই একদিন গিয়েছে।

* * * * *

ধীরে ধীরে—ধীরে ধীরে মানুষ আপনাকে চিন্‌ল—আপনার অধিকার বুঝ্‌ল। আনন্দে বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় তাদের সকল হৃদয় ভরে' উঠ্‌ল। তাদের কণ্ঠ-সঙ্গীত পঞ্চনদের তীরে তীরে ছায়া সুনিবিড়

বনে বনে অনন্ত আকাশকে মুখরিত পুলকিত আকুলিত করে' তুল্‌ল। আপন প্রাণের অদম্য আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌লে। অন্ন আপনাকে বহু করলেন—প্রজা বহু হ'ল। পল্লী প্রতিষ্ঠা হ'ল—নগর নগরী বিনির্ম্মিত হ'ল—রাজ্য গঠিত হ'ল—সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। মানুষ আত্মবলে আপনাকে জয়যুক্ত করে' ভগবানকে সার্থক করে' তুল্‌ল।

* * * * *

তারপর কত যুগ ধরে' এই জগন্মাতার বুকের উপর একে একে কত লীলা হ'য়ে গেল—কত জ্ঞানশক্তি—ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত মহত্ত্ব গৌরব—কত ঘাত প্রতিঘাত, শান্তি সংগ্রাম—কত রক্তস্রোত কত প্রীতি ধারার ভিতর দিয়ে দিয়ে, বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদিগকে নিয়ে চল্‌লেন—হিন্দুর সে-জীবনের কাহিনী আজ মানবের স্মৃতিতে বিলুপ্ত-প্রায়।

* * * * *

অনন্ত অতীতের মসীময় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীপ্রভাতে, ইতিহাস যখন বিস্মৃতির করাল-কবল হ'তে মানুষের লীলাধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ঊষার ক্ষীণ আলোকে লেখনী হস্তে বদ্ধপরিকর হ'ল—তখনও সেই সুদূর অতীতের আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে আলেখ্য লিখিত হ'ল তাতে দেখি তখনও হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আলেখ্য-রাজি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল—তখনও

হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারি একদিন—আজ মনে পড়ে—আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নরনারী একপ্রাণে অশোকের ছত্র-পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিল। সে দিন দিকে দিকে ভারতের বাণী বহন করে' লোক্ ছুট্‌ল। উত্তুঙ্গ ভূধর তাদের গতি রোধ কর্‌তে পার্‌ল না। অকূল পরাবারের উত্তাল তরঙ্গ-মালা তাদের পথ করে' দিলে। অমৃতের সন্ধান পেয়ে সে দিনের হিন্দুরা সে-অমৃত নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে ফির্‌ল।

* * * * *

তারপর তেম্‌নি আর একদিন উজ্জয়িনীর কনক-পুরীতে জগন্মাতা হিন্দুর সভ্যতার যে এক অভ্রভেদী মন্দির গড়ে' তুলেছিলেন—ঐশ্বর্য্য গৌরব, জ্ঞান, শক্তি দিয়ে ভরে' তুলেছিলেন—সে কাহিনী আজও হিন্দুর মনে সহস্র নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। আজ আমি মানস-নয়নে দেখ্‌তে পাই—সেই সুবর্ণপুরী উজ্জয়িনী—সেই উজ্জয়িনীর পথে পথে নরনারী কলহাস্যে গতিলাস্যে নির্ভীক উন্নতশিরে বিচরণ কর্‌ছে—পথ-পাশে পাশে সহস্র বিপণিতে পণ্যরাজির আর অন্ত নেই—সে-দিন বাতাসে বাতাসে ক্ষুব্ধ হাহাকারের পরিবর্ত্তে আনন্দোচ্ছ্বসিত কলহাস্য—আকাশে আকাশে খিন্ন দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্ত্তে তৃপ্তির সুখান্বিত হিল্লোল—মানুষের অন্তরে অন্তরে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে, অনন্ত দুরাশা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবার শক্তি। মানস-নয়নে আমি দেখ্‌তে পাই—সে দিন উজ্জয়িনীর অসংখ্য চতুষ্পাঠীতে কত কত দিক দেশ হ'তে কত নরনারী এসে জগন্মাতা-

চরণে শিষ্য বেশে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে দু'এক খানি রত্ন নিয়ে আপনাকে ধন্য মনে কর্‌ছে—নগর নগরীতে সে দিন উৎসবের আর শেষ নেই—পল্লীতে পল্লীতে শিশুদের কলরবের আর শ্রান্তি নেই—শস্য-শ্যামল সহস্র পল্লীর পাশে পাশে অগণ্য নদীতে নদীতে কল কল ছল ছল হাস্যের আর বিরতি নেই। স্বর্ণ-সিংহাসনে হিন্দু সম্রাট স্বর্ণ ছত্র তলে স্বর্ণ দণ্ড করে, দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করছেন—রাজসভা হিন্দুর জ্ঞানে শক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে অলঙ্কৃত—রাজভাণ্ডার মুক্তহস্ত—ধরিত্রীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে সমুজ্জ্বল। সে দিনের ছবি আমি মানস-নয়নে দেখি আর কোথা হতে দুই বিন্দু অশ্রুজলে আমার আঁখিপাত সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

* * * * *

তারপর আরও একদিন—শুধু একদিন কেন!—আরও কতদিন—কত বর্ষ—কত শতাব্দী—এই জগন্মাতার বুকে হিন্দু জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে, ভক্তিতে, কর্ম্মে, ভোগে আপনাকে সার্থক করে' তুলেছিল। সেই অতীতকালে তরঙ্গোচ্ছাসিত অকূল পারাবারের বুকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো শুভ্র পাল তুলে হিন্দুর অর্ণবতরণী কত কত পণ্য-সম্ভার জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে দিগন্তের পরপারে কত কত দেশে ছুটল—কত কত দেশ হ'তে অর্ণবযান সপ্তসিন্ধু পার হয়ে, কত কত ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত কত ভক্তি প্রীতি নিয়ে হিন্দুর বন্দরে বন্দরে এসে লাগ্‌ল। কত যুগ ধরে হিন্দু এক হাতে শক্তি আরেক হাতে প্রেম—একদিকে কর্ম্ম আর একদিকে জ্ঞান—একদিকে ঐশ্বর্য্য আর একদিকে মুক্তি নিয়ে,

আপনাকে জান্‌ল ও বিশ্ববাসীকে জানাল। তারপর ধীরে ধীরে হিন্দুর লীলার দিন ফুরিয়ে এল। জগন্মাতার দ্বিতীয় আহ্বান কোন্ এক নবান জাতির অন্তরে গিয়ে বাজ্‌ল।

* * * * *

হিন্দুকুশের পরপারে একি গুঞ্জন-ধ্বনি আজ শুনি! যবনিকার অন্তরাল হ'তে কত লক্ষ লোকের উৎসাহ-কলরব—প্রাণের হুঙ্কার আজ হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে', মৃদু গুঞ্জনের মতো এ-পারের আকাশ বাতাসকে চঞ্চল কর্‌ল। কাণ পাত—ঐ কি শোনা যায়—প্রবল কোলাহলের মধ্য হতে মাঝে মাঝে প্রবলতর হুঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে—"লায় লা হায় লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা"! গহণ তিমিরাবৃত নিশীথের ব্যত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সিন্ধুর ঊর্ম্মিমালার মতো কোন্ নবীন জাতি আজ অদম্য প্রাণের বেগে আপনাকে আর আপনার মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌ছে না। তাকে বেরুতে হবে—বেরুতে হবে আজ আকুল স্রোতস্বিনীর মতো—হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে'—কানন কান্তার, পল্লী, নগরী, মরু, গিরি ভাসিয়ে নিয়ে—আপনারই প্রাণের বেগে—গতির আনন্দে—আনন্দের আতিশয্যে। ধীরে ধীরে গুঞ্জন-ধ্বনি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'ল—আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট—তারপর একদিন হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে'—অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে—উন্মুক্ত-কৃপাণ লক্ষ লোক—জগত-পিতার নাম হুঙ্কার কর্‌তে কর্‌তে সিন্ধুর তীরে তীরে শার্দ্দূলের মতো দেখা দিল। কৃপাণে কৃপাণে সংঘাত হ'ল—শূলে শূলে সংঘর্ষ হ'ল—

অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিতে মেদিনী আচ্ছন্ন হ'ল—বিজয়ীর বিজয় হুঙ্কারে বিজিতের নিরাশা-চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রপীড়িত হ'ল। মানব-শোণিতে ধরণী রঞ্জিত!—নদনদীর লোহিতাক্ত কলেবরে—হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত। মানব-সভ্যতার দ্বিতীয় পুরোহিত ক্ষত্রিয় বেশে জগন্মাতার বুকে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

*　　*　　*　　*　　*

তারপর সপ্ত শতাব্দী ধরে' এই দুই মহাজাতি বিরোধে মিলনে, শান্তিতে সংগ্রামে, ভয়ে ভক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কাছে আপনাকে পরিচিত কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল—পরস্পর পরস্পরকে জয় কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। তাই এই সপ্ত শতাব্দী ধরে' কখনও মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে দিগ দিগন্তে বজ্রশিখা ছড়িয়ে গেল—মেদিনী কম্পমান হল—দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিতে মিশেয়ে গেল—মানব রুধিরে বসুন্ধরা রঞ্জিত হ'ল;—আবার কখনও বরাভয়করা জগতজননীর প্রশান্ত হাস্যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বনে বনে ফুল ফুট্‌ল—বিহঙ্গ কাকলীতে কাননভূমি মুখরিত হ'ল—দিগন্তপ্রসারী শ্যামাঙ্গিনীর বুকে বুকে শ্যামশস্য আপনার মায়া বিছিয়ে দিল—শান্তির প্রলেপে যত ব্যথা সব মুছে গেল। ধীরে ধীরে মন্দিরের পাশে পাশে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হল—হিন্দুর অন্তরে অন্তরে মুসলমান ফকিরের জন্য আসন পাতা হ'ল। ধীরে ধীরে এই দুই মহাজাতি—হিন্দু মুসলমান—পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌ল। বুঝ্‌ল তারা যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে তাদের বিরাট ঐক্য—বুঝ্‌ল তারা

যে সর্ব্ব প্রথমে তারা মানুষ—আর মানুষ মানুষের কাছে যা চায় সেটা সংগ্রামের মধ্যে নেই—অবজ্ঞার মধ্যে নেই—বিচ্ছেদের মধ্যে নেই, আছে সেটা প্রীতির মধ্যে— মিলনের মধ্যে—শান্তির মধ্যে, মানুষের বিরোধ সে দু'দিনের—মানুষের প্রেম সে অনন্ত। যারা একদিন উদ্ধত-হৃদয়ে উন্মুক্ত কৃপান নিয়ে জয় কর্‌তে এলো তারা ধীরে ধীরে পরাজয় মানল—যারা একদিন শত্রুর বেশে জগন্মাতার বুকে তাণ্ডব-নৃত্য কর্‌লে তাদেকে আর একদিন অনন্তস্নেহে অভিষিক্ত করে' জগন্মাতা আপনার সন্তান করে' নিলেন।

* * * * *

সহসা আজ সিন্ধুর কল কল ছল ছল দ্বিগুনতর হ'য়ে উঠ্‌ল কেন! সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল পশ্চিম-দিক চক্রবালে পারাবার-বুক তরণীতে তরণীতে ছেয়ে গেছে। পালে পালে প্রভঞ্জনের হাওয়া তাদের, ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষীর মতো সাঁ সাঁ করে' ছুটিয়ে চলেছে—হিমাদ্রি সমান তরঙ্গের বক্ষ বিদীর্ণ করে' করে'—শুভ্র ফেন-পুঞ্জে-পুঞ্জে বারিধি-হৃদয় আচ্ছাদিত করে' করে' ছুটে আস্‌ছে সহস্র তরণী তাদেরি পানে। ধীরে ধীরে কখন গোধূলী আপনার স্বর্ণাঞ্চল খানি টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের গায়ে মিশিয়ে গেল—ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এসে দিবসের শেষরশ্মি রেখাটুকু আপনার অসিত অঞ্চলে মুছে নিলেন—তখন সেই আধআলো আধঅন্ধকারের মাঝে সহস্র তরণী এসে তটে লাগ্‌ল। হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল সেই সহস্র তরণীতে এক নবীন মনুষ্য—শ্বেতবর্ণ—নীলচক্ষু—পিঙ্গলকেশ কৌতুহলোদ্দীপ্ত তারা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তোমরা কে ?"

"আমরা বণিক।"

"তোমাদের পণ্য সম্ভার কি?"

"পণ্য আমাদের নূতন প্রাণের নবীন উৎসাহ—তরুণ হৃদয়ের অনন্ত দুর্নিবার আশা আকাঙ্খা—তপ্ত রক্তস্রোত-প্রবাহিত ধমণীর দুরন্ত কর্ম্ম-পিপাসা—ধরিত্রীর সন্তান আমরা—সপ্তসিন্দুর মানস-পুত্র আমরা।"

হিন্দু মুসলমান বল্‌লে—"তোমাদের পণ্য আমরা জানি না। তাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এ জগন্মাতার দেশ—সবার অবারিত দ্বার। এসো—তোমারও স্থানের অভাব হবে না।" বিদেশী বণিক তার পণ্য সম্ভার নিয়ে কূলে অবতরণ কর্‌ল। মানব-সভ্যতার তৃতীয় পুরোহিত বৈশ্যবেশে এ জগন্মাতার কূলে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

* * * * *

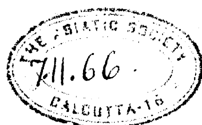
তারপর যখন রজনী প্রভাত হল তখন সেই বিদেশী বণিকের একদল চমৎকৃত হ'য়ে দেখ্‌চে যে তাদের অজ্ঞাতসারে—কখন তাদের লোহার তুলাদণ্ড সোনার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

* * * * *

এখন এই যে তিন মহাজাতি—এই যে হিন্দু মুসলমান খ্রিশ্চিয়ান—এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন মহাজাতিকে মন্থন করে' কত হলাহলের পর কবে কোন্ অমৃত উঠ্‌বে তা কে জানে? তবে অমৃত যে একদিন উঠ্‌বেই সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩



নব-বিদ্যালয়।

——:o:——

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু—

ক্যাটালগ ঘাঁটা যাঁদের অভ্যাস আছে, তাঁরাই জানেন্ যে এমন সব বই আছে যার নাম পড়েই তা পড়্‌তে লোভ হয়। আপনি আমাকে যে ফরাসী বইখানি পাঠিয়েছেন, সেখানি হচ্ছে ঐ জাতের। "নব-বিদ্যালয়", এই নাম পড়েই, এই বইয়ে অনেক নূতন সত্যের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার আশা আমার মনে জেগে উঠল; এবং শুনে সুখী হবেন যে, বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে সে আশায় আমি নিরাশ হই নি। আমাদের দেশের স্কুলকলেজের প্রতি আমরা অনেকেই যে অসন্তুষ্ট—তার প্রমাণ ত আমাদের লেখায় বক্তৃতায় নিত্যই পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলকলেজে আমাদের ছেলেরা যে মানুষ হচ্ছে না, এ কথা ত ঘরে বাইরে দু'বেলা শুন্‌তে পাই; কিন্তু কি কর্‌লে যে তা হবে, সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা বড় বেশি লোকের মাথায় নেই। তা যদি থাক্‌ত, তাহলে আমাদের এমন কথা শুন্‌তে হ'ত না যে, ইংরাজি পড়েই বাঙালীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। এর পর ছেলেদের স্কুলকলেজ ছাড়িয়ে আবার পাঠশালা ও টোলে পাঠাবার প্রস্তাব দেশহিতৈষী লোকেরা যে করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ প্রস্তাব

খুব পেট্রিয়টিক হতে পারে, কিন্তু মোটেই কাজের নয়; কেননা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার একমাত্র উপায় যে পশ্চাৎপদ হওয়া, এ বিশ্বাস যাঁদের আছে—তাঁরাও সে বিশ্বাস অনুসারে নিজেরা কাজ কর্‌তে প্রস্তুত নন্‌। সভা-সমিতিতে স্কুলকলেজের উপর ঝাল ঝেড়ে আমরা নিজেদের ছেলেদের আবার সেই স্কুলকলেজেই পাঠাই। ফল কথা এই যে, যে ভাবে শিক্ষা চল্‌ছে সে ভাবে তা চলা উচিত নয়—এ কথা বলায় ততক্ষণ কোনই লাভ নেই, যতক্ষণ না কি করে তা চালানো উচিত, সে কথা আমরা বল্‌তে পারি। সে কথা যে আমরা বল্‌তে পারি নে, তার কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ তেমনি উদাসীন।

(২)

ইউরোপেও আজকাল সে দেশের সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট। সেই অসন্তোষের ফলে বেলজিয়ম, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গুটি-কয়েক নব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বইখানিতে এর মধ্যে একটি স্কুলের শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতির আমূল বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এতে যা আছে তা মামুলি স্কুলের আনাড়ি সমালোচনা নয়। আসলে এতে সরকারি শিক্ষার এক বর্ণও সমালোচনা নেই। গ্রন্থকার স্বয়ং একটি নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টা এবং সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শিক্ষকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, তাঁর স্কুলের উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে মুখে যে-সকল কথা বলেছেন, সেই সকল কথা একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দিই। ইনি ছিলেন বেলজিয়ামের নব-ইউনিভারসিটির একজন অধ্যাপক। এঁর নাম Faria de Vasconcellos; শিক্ষাই এঁর ধর্ম্ম, শিক্ষাই এঁর কর্ম্ম, এবং স্বজাতির শিক্ষার উন্নতি-কল্পেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রফেসার ফারিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামে ব্রিজ নামক গ্রামে তাঁর এই নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জর্ম্মাণরা বেলজিয়াম অধিকার করবার পর এ স্কুল বন্ধ হয়, এবং প্রফেসার ফারিয়া জেনেভায় নির্ব্বাসিত হন। তাঁর অপরাধ, তিনি বিশ্বমানবের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, এবং সেই বিশ্বাসের উপরেই তিনি তাঁর নব-শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলেন। তাঁর মতে—এই যুগযুগান্তরের সভ্যতার ফলে মানুষ তার আদিম পশুত্ব হতে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছে, এবং তাঁর দৃঢ় ধারণা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মারামারি কাটাকাটির মূলে যা আছে তা মানবধর্ম্ম নয়—পশুপ্রবৃত্তি। মানুষের অন্তরে তার আদিম হিংস্রতা আজও লুপ্ত হয় নি—শুধু সুপ্ত হয়ে রয়েছে। যে শিক্ষার বলে মানুষের ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়, সে শিক্ষার ফলে মানুষের আদিম পশুত্ব জেগে ওঠে, এবং nationalism প্রভৃতি কথার সাহায্যে ছেলেদের অন্তরে সেই সুপ্ত ব্যাঘ্রকেই জাগ্রত করে তোলা হয়; সুতরাং শিক্ষার মন্দির থেকে ও সকল শব্দ বহিষ্কৃত করে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁর স্কুলের ছেলেদের মনে তিনি বিদেশী ও বিজাতির প্রতি মৈত্রীর ভাব উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন; তার ফলে তিনি বলেন—তারা মানুষ হয়েছে, অথচ কাপুরুষ হয় নি। প্রমাণ, শত্রুর আক্রমণ থেকে স্বজাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর স্কুলের বড়ছেলেরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। নিজে পশু না হলে যে, পশুর

বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, যদিচ অনেক বুদ্ধিমান লোকের মত তাই। বেলজিয়ামের উপর জর্ম্মাণী যে নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড আঘাত করেছে, তাতে প্রফেসার ফারিয়ার উক্ত বিশ্বাস ঘা খেয়েছে—কিন্তু ভাঙ্গা দূরে যাক্, টলেও নি। যে সময়ে জর্ম্মাণরা সমগ্র বেলজিয়ামকে পদদলিত পীড়িত ও বিধ্বস্ত কর্‌ছিল, সেই সময়ে তিনি জেনেভা-সহরে এই কথা বলেন—

"এ দুর্দ্দিনেও মানবসভ্যতার প্রতি আমাদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা সমান অটল রয়েছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে,—ব্যক্তির উপরে, জাতির উপরেও, মানবাত্মা বলে একটি পদার্থ আছে। এই যুদ্ধের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও বীভৎস অত্যাচারেও মানুষের আত্মার প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হবে না; সে অক্ষয় প্রদীপের চিরবর্দ্ধমান শিখা যুগের পর যুগে যত ঊর্দ্ধে আরোহণ করবে, বিশ্বমানবের জীবনের পথ তত আলোকিত হয়ে উঠবে"।

এর পর বোধহয় এ কথা স্পষ্ট করে বলবার দরকার নেই যে, প্রফেসার ফারিয়া একজন ঘোর Idealist; কিন্তু তার থেকে যদি কেউ মনে করেন যে তিনি একজন খেয়ালি লোক, এবং তাঁর স্কুল হচ্ছে একটি খামখেয়ালি ব্যাপার,—তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন। এই ছোট্ট বইখানির ভিতর তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষা জিনিসটে তিনি কবির চোখ দিয়েও দেখেন নি, দার্শনিকের চোখে দিয়েও নয়। সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগই এই যে, সে পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক নয়,—ও হচ্ছে আসলে একটি আন্দাজি ব্যাপার। প্রচলিত শিক্ষা, শিশু ও বালকের শরীর মন ও

চরিত্রের সম্যক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই, সে-শিক্ষার রীতি হচ্ছে মনোজগতের অন্ধকারে ঢিল মারা। যে সত্য প্রমাণিত ও পরীক্ষিত, সেই সত্যের উপরেই তিনি তাঁর নব-শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্কুলে ছেলেদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হত না। প্রফেসার ফারিয়া পাতায় পাতায় মানবাত্মার উল্লেখ করেছেন; কিন্তু মানবাত্মা বল্‌তে তিনি বোঝেন—মানুষের সেই ব্যবহারিক আত্মা, যার পরিচয় পাওয়া যায় পৃথিবীর দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, আর্টে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। তদতিরিক্ত অপর আত্মার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব; সে আত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ বিশ্বাস তিনি করেন্ যে, সে বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া—আর যারই হোক্—তাঁর সাধ্য নয়। অর্থাৎ reality-র জ্ঞানের সাহায্যে দেহে মনে ও চরিত্রে সুস্থ সবল সক্রিয় ও সক্ষম মানুষ গড়ে তোলাই হচ্ছে তাঁর ideal, এবং একমাত্র এই ideal-এরই তিনি ভক্ত। এবং এই ধর্ম্মের সাধনপদ্ধতিই হচ্ছে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি।

(৩)

ইমারত গাঁথ্‌তে হলে মানুষের পক্ষে সব আগে তার গোড়াপত্তন করা আবশ্যক, এবং তার জন্য চাই জায়গা বাছা। প্রফেসার ফারিয়ার মতে যিনি একটি নব-বিদ্যালয় স্থাপন কর্‌তে চান্, তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ঐ জায়গা বাছাই করা। এই সহজ কথাটা যে মানুষে প্রায়ই ভুলে যায়, তার পরিচয় ত আমরা নিত্যই পাই। আমরা যেখানে

একটু ফাঁক পাই, সেইখানেই স্কুল বসিয়ে দিই। গাছ পোঁতবার সময়ও আমরা এর চাইতে ঢের বেশি সতর্ক হই; যেন গাছের জীবন মানুষের জীবনের চাইতে বেশি মূল্যবান।

প্রফেসার ফারিয়ার শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র এই যে, স্কুলের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে পল্লীগ্রাম, সহর নয়। সহর নামক ইঁটের পর্ব্বতের গুহায় আজন্ম বাস করে' মানবসন্তান যে, দেহ মন ও চরিত্রে পূর্ণ-শ্রী পূর্ণ-শক্তি লাভ করবার সুযোগ পায় না,—এ কথা আমরা ষোল-আনা মানলেও অনেকে এক কড়াও মানেন্ না। খোলা আকাশের তলায় পরিষ্কার আলো ও বাতাসের মধ্যে বাস করাই যে ছোট ছেলের শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও মনের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এ কথা বুঝতে যাঁদের দেরি লাগে, তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই যে, তাঁরা কি স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁদের ছেলেদের খনির গর্ভে মানুষ হতে দিতে স্বীকৃত হবেন,—হোক্ না সে খনি বিজুলি বাতিতে আলোকিত আর বিজুলি পাখায় ব্যজনিত? ছোট ছেলের পক্ষে সহর একটি কারাগার মাত্র, সে কারাগারে আমরা যে তাদের বন্ধ করে রাখ্‌তে কুণ্ঠিত হই নে, তার কারণ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হচ্ছে আসলে জেলের পদ্ধতি। সচরাচর স্কুল যে জেলখানার আদর্শেই গঠিত হয়, এ দুয়ের সাদৃশ্যের প্রতি নজর দিলে সকলেই তা প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারবেন। এই জেলখানা থেকে ছেলেদের উদ্ধার করবার মানসেই ইউরোপে এই সব নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাধীনতাই হচ্ছে এই সব স্কুলের মূলমন্ত্র; কেননা এদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই মহা সত্যের আবিষ্কার করেছেন যে, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই মানুষ তার মনুষ্যত্ব লাভ করে, অর্থাৎ ঐ অবস্থাতেই তার দেহ মন ও চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়; এবং বলা

বাহুল্য যে, ছোট ছেলেও মানুষ,—কেননা বৃদ্ধত্ব ও মানুষ্যত্ব এক বস্তু নয়। স্বচ্ছন্দে চলবার ফেরবার দৌড়বার লাফাবার জন্য ছেলেদের পক্ষে যে মাঠ চাই, এ কথা যে আজকাল অনেকেই মানেন্ তার প্রমাণ, সহুরে স্কুলও খেলার মাঠের জন্য লালায়িত। ছেলেরা কিন্তু শুধু জমির উপর ছুটোছুটি করেই সন্তুষ্ট থাকে না, তারা গাছে চড়্‌তে চায়, জলে নাম্‌তে চায়। একমাত্র স্থলচর হয়ে তাদের সুখ নেই, মাঝে মাঝে খেচর ও জলচর হতে পারলেই তারা আনন্দে থাকে। এ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সহরের খেলার মাঠে তারা সাঁতারও কাট্‌তে পারে না, ডালেও চড়্‌তে পারে না। সুতরাং স্কুল সেই জায়গাতেই হওয়া উচিত যেখানে মাঠ আছে, গাছ আছে, জল আছে।

আমরা সকলেই জানি যে, মানবজাতি তার শৈশবে প্রকৃতির কোলেই লালিতপালিত হয়েছে; সুতরাং মানব-শিশুর পক্ষে প্রকৃতির কোলেই মানুষ হওয়া স্বাভাবিক;—কেননা যাঁরা ছোট ছেলের মনের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, আদিম মানবের সঙ্গে তাদের প্রকৃতির একটা মজ্জাগত মিল আছে। মানবজাতি যেমন প্রকৃতির সঙ্গে কারবার করে', যুগের পর যুগ ধরে, দেখে এবং ঠেকে শিখে সভ্য হয়েছে; শিশুকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষ হতে হবে; এই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টাদের মত। প্রকৃতির হাত ধরে এবং প্রকৃতিকে হাতে ধরেই মানুষের মন যে সজ্ঞান এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই বিশ্বাসের বলেই নব-বিদ্যালয়ের নব-শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়েছে। যখন মানসিক শিক্ষার অধ্যায়ে এসে পড়্‌ব, তখন সে পদ্ধতির নূতনত্ব ও সার্থকতার পরিচয় দেব। এস্থলে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট

হবে যে, শিক্ষার এই নব-পন্থীদের মতে সহুরে স্কুলে তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং স্কুলের স্বস্থান হচ্ছে সহরের বাইরে।

স্কুলের আস্তানা সহরের বাইরে হলেও বহুদূরে হওয়া উচিত নয়—এই হচ্ছে প্রফেসার ফারিয়ার মত। তাঁর স্কুল ছিল ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের রেলের পথ। স্কুল যে একটি বড় সহরের এক ঘণ্টার রেলপথের বাইরে হওয়া উচিত নয়—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়মত। এ অবশ্য একটি নূতন কথা,—সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর কি বক্তব্য আছে শোনা যাক্। তিনি বলেন্—

"লোকালয়ের বাইরে স্কুল স্থাপনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা আমাদের ছেলেদের একটা বড় সহরের সংস্পর্শ থেকে একেবারে দূরে রাখ্‌তে চাই;—কিম্বা রাজধানী নামক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মানুষের হৃদয়মনের শিক্ষার জন্য যে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে, টলষ্টয়ের মত তা প্রত্যাখ্যান কর্‌তে চাই। এ কথাটা আমি খুব স্পষ্ট করে খুব উঁচু গলায় বল্‌তে চাই যে, এই প্রকৃতির কোলে ফিরে আসার অর্থ আমাদের কাছে এ নয় যে, আমরা বনবাসের কোনরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কিম্বা দৈবী-শক্তিতে বিশ্বাস করি। সেরকম অদ্ভূত বিশ্বাস যে আমাদের নেই—এ কথাটা পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক, কেননা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, এমন লোক ঢের আছেন যাঁদের ধারণা যে আমাদের নব-বিদ্যালয়ের প্রধান গুণই এই যে, আমরা সহরের সয়তানের বেড়াজাল ছিড়ে পালিয়ে এসেছি। লোকালয়-বহির্ভূত মাঠের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার সুফল যে কি, তা পূর্ব্বেই বলেছি; কিন্তু সহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবার সুফল থেকেও আমরা ছেলেদের বঞ্চিত কর্‌তে চাই নে।"

আমাদের ভাষায় বল্‌তে হ'লে, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ যে একই আশ্রম, প্রফেসার ফারিয়া এ কথা মানেন্‌ না। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংসার থেকে পালাতে শেখানো নয়, তার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। প্রথম আশ্রমের সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে তার দ্বিতীয় আশ্রমের উপযোগী করায়। স্কুল সন্ন্যাসীর আশ্রমও নয়, ভিক্ষুর মঠও নয়। এঁদের মতে বিদ্যালয় হচ্ছে সংসার-রঙ্গালয়ের নেপথ্যশালা। জীবন নাটকের অভিনয় সকলকেই ক‌র্‌তে হবে, সে নাটক ট্রাজেডিই হোক্‌ আর কমেডিই হোক; সেই অভিনয় ভাল করে' সুন্দর করে' কর্‌তে শেখানোটাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—সুতরাং সে শিক্ষাশালা প্রথমে নেপথ্যেই রাখা দরকার। শিক্ষানবিশীর যুগে সামাজিক জীবনের যবনিকার অন্তরালে যাবার এও একটা কারণ।

এখন দেখা যাক্‌, সহরের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্কটা নিকট হওয়ায় ছেলেদের কি লাভ। মানুষের যুগযুগান্তরের জ্ঞানকর্ম্মের ফল প্রতি দেশে বড় বড় সহরেই সঞ্চিত রয়েছে; তারপর যে উপাদানের সাহায্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম বৃদ্ধি লাভ করে, সে উপাদানও ঐ বড় বড় সহরেই সংগৃহীত হয়। একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা দরকার। এই নব-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বস্তু,—বই নয়। নব-বিদ্যালয়ে বইয়ের শিক্ষা ছেলেদের বস্তুজ্ঞানের অনুসরণ করে। এই কারণেই Museum, Zoo, Botanical Gardens প্রভৃতিতে নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের ঘন ঘন যাতায়াত কর্‌তে হয়, এবং বলা বাহুল্য এ সব জিনিস বড় সহরেই থাকে—পাড়াগাঁয়ে থাকে না। তারপর নব-শিক্ষকের দল, ছেলেদের ভাল ছবি দেখানো এবং কনসার্ট শোনানো তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং সহৃদয়তার অনুশীলনের জন্য একান্ত

প্রয়োজন মনে করেন, এবং উঁচুদরের ছবি দেখতে হলে, উঁচুদরের গানবাজনা শুন্‌তে হলে, সহর ব্যতীত গত্যন্তর নেই। দেশের বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা শোনাও এঁদের মতে শিক্ষার একটি প্রধান উপায়। ছেলেরা বড় হলে যে-সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে, সেই সামাজিক জীবনের সকল উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়ে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না। সংক্ষেপে, প্রফেসার ফারিয়ার বক্তব্য এই যে,—একদিকে যেমন সামাজিক জীবনের যত কিছু কদর্য্যতা ও হীনতা সহরে পুঞ্জীভূত হয়েছে, অপর দিকে তেমনি সে জীবনের যত কিছু সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব ঐ সহরেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সুতরাং সহরের পাপ ও কদর্য্যতা থেকে ছেলেদের দুরে রাখবার জন্য ছেলে-দের সহরের বাইরে রাখা যেমন দরকার; সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করবার জন্য ছেলেদের সহরের সন্নিকটে রাখাও তেমনি দরকার।

আর এক কথা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্বাধীনতাই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের মুলমন্ত্র। তাই এ শ্রেণীর স্কুলের শাসনতন্ত্র হচ্ছে স্বায়ত্ত শাসন। স্কুলের শাসন সংরক্ষণ সবই ছেলেদের হাতে,—এমন কি ছেলেদের পঞ্চায়তে মাষ্টারদের কোনই স্থান নেই। প্রফেসার ফারিয়া এই ছাত্রশাসনতন্ত্রের লম্বা বর্ণনা করেছেন। সে সব কথা বারান্তরে বল্‌ব। এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলা দরকার যে, স্বায়ত্ত শাসন বজায় রাখবার জন্য স্কুলের পক্ষে সহরের কাছ ঘেঁসে থাকা দরকার। কেনাকাটি হাটবাজার ত ছেলেদেরই করতে হয়—তা ছাড়া দরকার পড়লে উকীলের পরামর্শ, এঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নেওয়া প্রভৃতি প্রাপ্ত

বয়স্ক লোকদের কাজও ছেলেদেরই কর্‌তে হয়। সহরের বিরাট কর্ম্মজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, এবেলা ওবেলা তাদের সহরে যাতায়াত কর্‌তে হয়। স্কুলের বিষয়কর্ম্মের ভার ছেলেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদের স্বাবলম্বন শেখানো।

(৪)

এই নব-বিদ্যালয়ের আর একটি নিয়ম আছে, যেটি আমার কাছে ভারি নূতন লাগল। এ স্কুল অবশ্য বোর্ডিং স্কুল, কিন্তু তা হলেও এ স্কুলে সস্ত্রীক হেডমাষ্টার ছাড়া অপর কোনও মাষ্টারকে থাক্‌বার স্থান দেওয়া হয় না। এর প্রথম কারণ, এ স্কুল পরিবারের আদর্শে গড়া। ছেলেরা এ স্কুলে যথার্থই গুরুগৃহে বাস করে, গুরু এবং গুরু-পত্নীই তাদের পিতৃমাতৃস্থানীয়। সংসারে আমরা যেমন এক পরি-বারের ভিতর আর এক পরিবারকে স্থান দিতে স্বতঃই নারাজ—কেননা ও দুয়ে ভাল করে খাপ খাওয়ান যায় না; তেমনি এই নব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা একের বেশী গুরুকে সেখানে স্থান দিতে নারাজ—কেননা, এই পারিবারিক স্কুলে নানা গুরুকে একত্র রাখলে তাদের পরস্পরকে খাপ খাওয়ানো যায় না। প্রফেসার ফারিয়া বলেন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এই নিয়ম করতে বাধ্য হয়েছেন। একাধিক মাষ্টারকে একান্নবর্ত্তী করবার ফলে দুটি একটি নব-বিদ্যালয় ভেঙ্গে গেছে। অনেক সন্ন্যাসীতে যে গাজন নষ্ট হয়—এ হচ্ছে তাঁর কাছে পরীক্ষিত সত্য। তাঁর বিশ্বাস পাঁচটি মাষ্টারকে একত্র রাখলে তাঁদের ভিতর দলাদলির সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ বিষয়ে

ভাললোক মন্দলোকের কোন কথা নেই। মানুষ যতই ভাল হোক না, তার ধাত বলে একটা জিনিস আছে—এবং অনেক স্থলে মতে মিললেও, পাঁচজনের ধাতে মেলে না। এবং পাঁচজনে যত কাছাকাছি যত ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকে, তাদের পরস্পরের ধাতু-বৈষম্য তত ফুটে ওঠে। প্রফেসার ফারিয়া বলেন—যে ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষ প্রকাশ্য-বিরোধে না দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ই থাকে এবং প্রচ্ছন্ন বিষের মত তা অলক্ষিতে স্কুলদেহকে জর্জ্জরিত করে। এই কারণে স্বয়ং প্রফেসার ফারিয়া ব্যতীত তাঁর স্কুলের সকল মাষ্টারই ব্রাসেল্‌সে বাস করতেন—অতএব ব্রাসেল্‌স্‌ হাতের গোড়ায় না থাক্‌লে এ স্কুল চলত না।

যদি বলেন, যে-গাঁয়ে স্কুল সেই গাঁয়েই মাষ্টারদের আলাদা বাসা করে দিলেই ত হত, ব্রাসেল্‌স্‌ পাঠাবার কি দরকার ছিল?—তার উত্তর, তাঁর নব-বিদ্যালয় ক্রোরপতির স্কুল নয়। এঁদের নব-শিক্ষা-পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য নব-বিদ্যালয়ে বহু মাষ্টার এবং অতি উঁচুদরের মাষ্টার চাই—কেননা প্রফেসার ফারিয়া বলেন, স্কুলের ভালমন্দ, যারা চালায় তাদেরই উপর নির্ভর করে, নিয়মাবলীর উপর নয়। তাঁর ৩৫টি ছেলের স্কুলে ১৭টি মাষ্টার ছিল, এবং এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে এক একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্কুলের তহবিলে লাখ দুলাখ টাকা না থাক্‌লে এ দরের মাষ্টারদের সব বাঁধা মাইনের চাকর করে রাখা যায় না। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাসেল্‌স্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হপ্তায় একদিন আধদিন এসে এঁরা ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে যেতেন। এ কাজ তাঁরা আহ্লাদের সঙ্গেই করতেন, কেননা সহরে ছদিন সকাল সন্ধ্যে কাজ করে একদিন গাছ-

পালা ফুলফলের দেশে গিয়ে দিনমান ছোট ছেলেদের নিয়ে কাটানতে এঁরা অতিশয় আনন্দ বোধ করতেন। এই পালায় পালায় পড়ানতে স্কুলের কোনই ক্ষতি হত না; কেননা নব-বিদ্যালয়ে এক-দিনে পাঁচ বিষয় পড়াবার নিয়ম নেই। একদিনে একটি, বড় জোর দুটি বিষয় পড়ানো হয়, তার বেশী নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে অবসর মত, এই নব-বিদ্যালয়ের সবিশেষ পরিচয় দেব।

রাঁচি
১০।১১।১৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।



গুরু।

—:০:—

"অচলায়তন" নাটক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে, অনেকের এইরূপ ধারণা। এ দেশের দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় কিছুদিন ধরিয়া এ সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা চলিয়াছিল, তাহাতে লোকের এরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে নাট্যকলার আজও কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। বড় নাটক অভিনয় করিবার মত অভিনেতা দেশে দুর্লভ। উপযুক্ত দর্শকও সুলভ নয়। কাজেই নাটকের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারার যা প্রধান সহায়, অভিনয়, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত আছি। কাজেই সম্প্রতি অচলায়তনকে কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়া 'বিচিত্রা' ক্লাবে "গুরু" নাম দিয়া অভিনয়ের যে উদ্যোগ হইতেছে, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়—ইহার নাম "গুরু" হওয়াই উচিত—"অচলায়তন" ইহার negative দিকের নাম।

গুরু বলিলে কি বোঝায়—তাঁহার কর্ম্ম কি? তিনি বাহির হইতে যে কিছু আনিয়া দেন তাহা নহে, আমাদের মধ্যে যাহা অব্যক্ত হইয়া আছে তাহাকেই তিনি বাহির করিয়া আনেন। মানবের অন্তরে যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, গুরু নিজের প্রাণের অগ্নিশিখার স্পর্শে

তাহাকে প্রদীপ্ত করিয়া দেন। আমাদের মধ্যে যে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া আছে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিবার জন্য, গুরুর প্রয়োজন।

চারিদিকের বস্তুপুঞ্জ আমাদের নীচের দিকে টানে। প্রাণ আপনার ভিতর আহুতি দিয়া 'টিস্থ্' পুড়াইয়া শরীরকে উত্তপ্ত রাখিতেছে—নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তাহার অনবরত চেষ্টা, বহির্জগতের যে একটি চাপ আছে, যাহার চেষ্টা তাহাকে বিধ্বস্ত করা, তাহার বিরুদ্ধে নিজেকে খাড়া রাখা। পৃথিবী আমাদের টানিতেছে শোয়াইয়া দিবার জন্য। আমরা যে খাড়া হইয়া আছি, চলিতেছি, সে প্রাণের জোরে। নিশ্চেষ্ট হওয়া কি না, সমস্ত জড়ের সহিত মিলিয়া যাওয়া।

জড়জগৎ বৃহৎ, আমরা ক্ষুদ্র। সুতরাং জড়ের সঙ্গে প্রাণের এই জোঝাজুঝি একান্ত কষ্টকর। যে প্রচণ্ড শক্তি নিশ্চেষ্টতার দিকে টানিতেছে তাহার কাছে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে বিশ্রাম পাই। মাটিতে শয়ন করি, তাহাতে আমাদের আরাম হয়।

প্রাণের ধর্ম্ম ইহার উল্টা। প্রাণ আপনাকে স্বীয় শক্তির দ্বারা নিশ্চেষ্টতা হইতে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। শিখার ধর্ম্ম এ নহে যে একবার তাহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, আর সব হইয়া গেল; নিত্য নিয়তই তাহাকে চেষ্টার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে হয়, তাহার সেই চেষ্টাই আলোক, তাহাই জ্যোতিরূপে আমাদের কাছে প্রকাশমান। কেবলি পুড়িতেছে, চলিতেছে, বাড়িতেছে, উঠিতেছে—বিপুল জড়-জগতের মধ্য হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতেছে—এই প্রকাণ্ড উদ্যম, ইহাই প্রাণ।

এই যুদ্ধে প্রাণ এক একবার পরাভবের দিকে যায়। আগুনও জ্বলিতে জ্বলিতে বারবার পরাভবের দিকে যায়। যে ব্যক্তি তাহার উপরকার

ছাই ঝরাইয়া দেয়, সে ত নূতন কিছু দেয় না, সে ভিতরের আগুনকে বাহির করিয়া আনে মাত্র। আত্মার প্রাণশক্তি যখন আরামের ছাই চাপা পড়ে, তখন সেই আরামকে দূর করিবার জন্য আসেন গুরু। ইন্ধন আপনাকে জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য যদি চেষ্টা না করে, তবে তা নিবিয়া যায়। নিবিয়া যাওয়াটাই সহজ অবস্থা, আরামের অবস্থা।

গুরু মানুষই হউন, আর দেবতাই হউন, ঘা দিয়া দুঃখ দিয়া, আমাদের ভিতরকার যে তেজ ম্লান হইয়া আসিতেছিল তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেন। আধ্যাত্মিক প্রদীপটি যাহাদের অন্তরে ম্লান হইয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই গুরুর অপেক্ষা, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে করিতে ছিল—যিনি খোঁচাদিয়া, আঘাত করিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া তোলেন।

চেষ্টার অভাবই জড়তা, প্রাণ মানুষের ভিতরের স্বতঃচেষ্টা। কিন্তু সব বিষয়ে, নব নব চেষ্টার সাহায্যে যদি প্রাণকে টিঁকিয়া থাকিতে হয়, তাতে ব্যাপার বড় কঠিন হয়। আমাদের প্রতিদিনই যদি খড়কুটা দিয়া ঘর তৈয়ারি করিতে হইত, শয়ন করিতে হইলে তুলা ধুনিয়া তোষক প্রস্তুত করিতে হইত, তৃষ্ণা পাইলেই কূপ খনন করিতে হইত, তাহা হইলে অবশ্য মনে হইতে পারিত, প্রাণের ক্রিয়া খুব প্রবলভাবে চলিতেছে। কিন্তু এ-অবস্থা চলিতে পারে না। প্রাণের ধর্ম্ম নিয়ত চলা কিন্তু আমাদের শক্তি পরিমিত বলিয়া সে শক্তিকে আমাদের বাঁচাইয়া চলিতে হয়। পলিতা যদি আগাগোড়া জ্বলে তবে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রদীপ ততটুকুই জ্বলে যাহাতে আলো হয়, যাহা না জ্বলিলে তাহার চলে না। প্রাণ তেমনিই ব্যবস্থার দ্বারা শক্তির অতিব্যয় নিবারণ করে।

এমনি করিয়া সমাজে প্রথা জিনিসটির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক-বার আমাদের যদি ভাবিতে হইত, দেখা হইলে গুরুজনদের সঙ্গে কি ব্যবহার করিব– শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কোনও দিন ডিগবাজী খাইলাম কোনও দিন বা জিহ্বা বাহির করিলাম—তবে বড়ই মুস্কিল হইত। তাই বাঁধা নিয়ম হইল প্রণাম করা। মানুষ বাড়ী তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দেয়, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখলের জন্য। শক্তির অপব্যয় নিবারণের জন্য প্রাণকে এইরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে, অর্থাৎ সামাজিক কল গড়িতে হইয়াছে।

সামাজিক বিষয়ে যত কিছু তর্ক সে হইতেছে—জড়ের সহিত কারবারে, কলবস্তুকে যতটা স্বীকার করিয়াছি, তাহার পরিমাণ উচিত কি না, এই লইয়া। আপনার ভিতর হইতে যে চেষ্টা, প্রাণ, সেই চেষ্টাকে তুমি কত দূর মানিবে, এই লইয়া তর্ক। প্রাণকে যদি বড় জায়গাতেও ঘুম পাড়াইয়া রাখি, সকল জায়গাতেই যদি বাঁধা নিয়মে চলি, তবে চলাই হয় না। যে জাতি সুদূর অতীতের লোকাচার, দেশাচার, মনু পরাশর, এইসকলের উপর সব বিষয়ের বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় তামসিক হইয়া যায়, তাহার অধঃপতন কে ঠেকাইবে!

আমাদের সব বাঁধা, এমন কি ধর্ম্ম এবং আচারও বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আমরা নিজে যাহা কিছু করিতে পারিতাম, তাহার বরাত দেওয়া রহিল, সংহিতা স্মৃতির উপর। আমার চলায় প্রয়োজন নাই —এক জায়গায় ঘানির মত ঘোরাই হইল আমার চলা। নিয়ম যখন অতিরিক্ত হইয়া উঠে, তখন প্রাণের সার্থকতা চলিয়া যায়। মানুষ তখন ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মত হইয়া উঠে। সে যখন জড়ের সহিত,

আপনার আশপাশের সহিত, বনিবনাও করিয়া চলিতে চায়, তখন তাহার চলার পথে বাধা আসে।

গুরু আপনার প্রচুর প্রাণশক্তি লইয়া আসেন, এই বাধা দূর করিয়া দিবার জন্য।

অতএব "অচলায়তনের" অর্থ সুস্পষ্ট। ইতিপুর্ব্বের "রাজা" নাটকে ব্যক্তিবিশেষের কথা ছিল—"সুদর্শনা" কি করিয়া অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। "অচলায়তন" সমাজের কথা, অনেকের কথা।

এইখানেই সমস্যা। পরস্পরের সহিত পরস্পরের যোগ যেখানে বিচিত্র সেখানে প্রত্যেকের জন্য নূতন করিয়া ভাবা সম্ভব নহে। মানুষের প্রয়োজন বশতঃই মানুষকে সামাজিক কল তৈয়ারি করিতে হইয়াছে।

আমাদের সুবিধা হয় বলিয়া যদি প্রাণের সব কাজের ভার কলের উপর দিই, তাহা হইলে যাহার কাজ দাসত্ব করা, সে হয় প্রভু। ইতিহাসে দেখা যায় রোমকেরা যখন তাহাদের দাসদের উপর সব কাজের বরাত দিতে লাগিল, তখন তাহারা তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বড় বড় সমাজের পতন এমন করিয়াই হয়। সমাজের যখন অবনতি হয় তখন সে কল অর্থাৎ organisation-এর উপর সব বরাত দেয়। তাহার তেজ যত মরে, বল যতই কমে, সে ততই কলের উপর বরাত দিয়া নিজের শক্তি বাঁচাইতে চায়। হয়ত ভারতবর্ষও এই কাজ করিয়াছে। যতই তাহার দুর্গতি ঘনাইয়া আসিয়াছে, ততই কলের উপর বরাত দিয়া প্রাণশক্তিকে সে নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিবার দিকেই প্রাণের উদ্যম, এবং তাহাতেই তাহার আত্মরক্ষা। ছোট ছেলে চেঁচাইবে, কাঁদিবে, দৌড়াইবে, এ তাহার পক্ষে ভাল। কিন্তু ধাত্রীর পক্ষে ইহা বিষম অসুবিধা জনক। ধাত্রী সেইজন্য কখন কখনও আফিম খাওয়াইয়া ছেলেকে ঝিমাইয়া রাখে। যাহারা পরের ভার লয়, ইহাতে তাহাদের খুবই সুবিধা। সমাজের ধাত্রী দেখে, যেখানে প্রাণ প্রবল, সেখানে নিয়ম শাসনের ব্যতিক্রম ঘটে। কাজেই তাহাদের কসিয়া বাঁধিয়া, কিম্বা আফিমের ড্যালা খাওয়াইয়া নিস্তেজ করিয়া রাখিতে তাহার চেষ্টা হয়। বৌদ্ধ যুগের সময় হয়ত এদেশে প্রাণের একটু চাঞ্চল্য আসিয়াছিল—তাহার পর আমাদের রঘুনন্দনের দল সমাজকে আচারের বড় একটি আফিমের ড্যালা খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কোনও বিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু উত্তর শিয়রে শুইবে না; পশ্চিমে বসিবে না ইত্যাদি। আমাদের দুর্গতির হয়ত এ এক কারণ। অথবা হয়ত পোলিটিক্যাল কারণে আমরা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলাম—এবং ক্লান্ত মানুষকে শোয়ান সহজ; যে সবল, যাহার তেজ আছে, তাহাকে পাড়িয়া ফেলা সহজ নহে। তাই রঘুনন্দনের দল যখন চিন্তা না করা, দ্বিধা না করার মশারিঘেরা বিছানা করিয়া দিলেন, তখন শুইয়া পড়িলাম। হয় প্রাণ আপনিই নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া ইহা ঘটিল, নচেৎ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কমানো দরকার মনে করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ হইল।

গুরুর কাজ হইতেছে, কল যত আরাম দিক্‌, তাহার হাত হইতে মানুষকে উদ্ধার করা। তিনি জানেন, সচেতন প্রাণই বল, জড়ের কাছে সে যেখানে জয়ী, সেইখানেই তাহার সার্থকতা, তাই যথার্থ গুরু

বিপ্লবকে বহন করিয়া আসেন। লোকে তাঁহাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে মনে করে বাঁধা মন্ত্র যিনি কানে দেন, তিনিই গুরু। কিন্তু মানবের গুরু রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া, বিপ্লবের বাহনে আসেন—তিনি সেই কথা বলিতে আসেন যাহা আমরা সহজে মানিব না, শুনিব না। গুরু আসা গুরুতর ব্যাপার। বিধাতা যখন আমাদের প্রার্থনা শোনেন "যদ্ভদ্রং তন্নয়াসুব" যা ভদ্র তাই দাও—তখন তিনি দুই হাতে মশাল লইয়া আসেন—বড় ভয়ানক সে কাল! যিনি বলিয়াছেন "যুগে যুগে সম্ভবামি" তিনি যখন আসেন, তখন দেশে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়, সেদিন দারুণ দুঃখের দিন! তাঁহারও অপমানের দুঃখের শেষ নাই। যখন আরামে আছি, তখন যে আরাম ভাঙ্গিতে আসে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতেই হয়।

প্রাণ নিজেকে আঁকড়াইয়া থাকে—'মমি'র সঙ্গে যে বীজ ছিল, ৩।৪ হাজার বৎসর পরেও অনুকুল অবস্থার মধ্যে পড়িবামাত্র তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল! মানুষের ভিতর যে প্রাণশক্তি আছে তাহাও সহজে মরিতে চায় না। বাঁধা নিয়মের দাসত্ব করিতে করিতে, বিশ্বের সহিত অব্যবহিত ভাবে আনন্দের যে যোগ, তাহা পাইবার ব্যাকুলতা সমাজের অন্তরে মরিয়া যায়—তবুও তাহার মধ্যে এক একজন থাকিয়া যায়, প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের প্রাণকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করিবার ব্যথা যাহাদের কিছুতে মরে না। 'পঞ্চক সেই ব্যক্তি—যাহার প্রাণ মরিয়াও মরিতে চাহে না, চতুর্দ্দিক হইতে পিষ্ট হইয়াও যে বাঁচিয়া থাকে। "অচলায়তন" তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—মন্ত্র আওড়াইতে গিয়া তাহার মুখ হইতে গান বাহির হইয়া পড়ে।

সমাজে যখন এই শ্রেণীর দুই একটি মানুষ দেখা দেয় তখনই বুঝিতে হইবে, গুরুর আগমনের পথ প্রস্তুত হইতেছে। দেশে যখন, এমন সকল লোক উঠিতে থাকেন যাঁহারা বলেন "আমি বাঁধা মত মানিব না, কিন্তু আমার ভিতর যে বিচার বুদ্ধি আছে তাহাকে মানিব" তখন বুঝিতে হইবে গুরু অসিহস্তে আসিতেছেন—দশের চিত্তের চাঞ্চল্য, প্রাণের বেদনা, তাহারই আভাস দেয়। হঠাৎ একটা স্থলে দরজা খোলে, প্রাণবায়ুর স্পর্শে সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে দোদুল্যমান হইতে থাকে। ক্রমে গুরু আসেন।

গ্রীষ্মে সব শুকাইয়া গিয়াছে। নিজের ভিতর হইতে জোগাইবার রস আর নাই—সব তলানিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। তখন সমস্ত বিশ্ব ব্যাকুল হইয়া বলিতে থাকে 'এস' 'এস'! অমনি গুরু আসেন তাঁহার বজ্র লইয়া, বিদ্যুৎ লইয়া। সরসতায় তিনি আকাশ ভরিয়া দেন। যাহারা মরিয়াছিল তাহারা বাঁচিয়া ওঠে, পীতবর্ণ শ্যামল হইয়া ওঠে, জরা নবীন যৌবনে পরিণত হয়। এই ঘটনা মানুষের জীবনের মধ্যেও দেখিতে পাই। সমাজ যখন কল, ধর্ম্ম যখন আচার-মাত্র, তখন সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন গুরু। প্রাচীর নীচের—চিত্ত আকাশ ভরিয়া যখন পূর্ণতার ঋতু আসেন, তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে, তাহার ত কোনও সীমা নাই!

লোহার দরজায় ঘা দিতে দিতে মনে হয়, বৃথা এই চেষ্টা। রুদ্ধ দরজাকে মুষ্টি আঘাত করিয়া হস্ত শুধু রক্তাক্ত হইতে থাকে। চেষ্টা অবশ্য জীবনের একটা লক্ষণ। কিন্তু এখানে ঠেলিয়া, ওখানে ভাঙ্গিয়া কিছু করা বড় শক্ত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বড়, তাঁহারা গলা ভাঙ্গিয়া মরিলেন, কিন্তু দরজা একটু ফাঁক করা আর হইয়া উঠিতেছে না। আকাশ

ভরা পূর্ণতা লইয়া গুরু আসুন—পড়ুক আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্র—সব এক মুহূর্ত্তে ঠিক হইয়া যাইবে। অনেক দিনের এই দুর্গ, মন ইহাকে মানিতে চায়, বুদ্ধিকে ইহা আচ্ছন্ন করে। পুনরাবৃত্তির পথে ঠুলি দেওয়া গরুর মত চলিয়াছি, এই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার কান্না কবে উঠিবে!

আমাদের জীবনে নিশ্চেষ্টতা সবদিক হইতে আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। প্রাণশক্তি কমিয়া আসিয়াছে, কাঁটা ফুটিলে তাহা যে বিষাক্ত ক্ষত হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গোড়ায় যে প্রাণশক্তিকে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, সেখানে যখন জোয়ার আসিবে তখনই সব সার্থক হইবে। মূলে, অধ্যাত্মিক জীবনে, প্রচুর প্রাণধারা বর্ষণ করিয়া গুরু আমাদের রক্ষা করিবেন। হাজার রূপ ধরিয়া তিনি আসিবেন। হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি বাস করিতেছেন—"বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা"—তিনি মহাত্মা, সকলের আত্মার মধ্যে তিনি কাজ করিতেছেন, সকল মনুষ্যের মধ্যে তিনি "নিবিষ্টঃ।" তিনি যখন আসেন তখন আত্মায় আত্মায় জাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হয়,—একাজ কোনও একজনের সাধ্য নহে। বসন্ত ঋতুর মত সব দিক দিয়া সকলকে তিনি পত্রপুষ্পে ভরিয়া দেন, বর্ষার মত সমস্ত তিনি প্লাবিত করিয়া দেন। ইহাই 'অচলায়তনের' বাণী।

শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মজুমদার।

নববর্ষ।

——:০:——

নূতনপন্থীদের বিরুদ্ধে পুরাতনপন্থীদের তরফ থেকে এই একটা প্রকাণ্ড অপবাদ ক্রমাগত আসে যে, তারা প্রাচীনের আদর জানে না; এ অপবাদ বড় কম অপবাদ নয়। প্রাচীনই ত সত্য, সেই ত আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এবং সেইই ত সৃষ্টির শেষদিন অবধি সমস্ত বাধাকে তফাতে ঠেলে দিয়ে সজোরে দাঁড়িয়ে থাকবে। এত বড় সত্য যস্মিন পক্ষে, তস্মিন পক্ষে জনার্দ্দিন না থেকে যে যেতে পারে না, সে কথা নূতনপন্থীদের অবিদিত নেই। তবু তারা নূতনকে এত করে চায় কেন?—সকল অকাট্য যুক্তির সমস্ত আটক ভেঙ্গে নূতনত্বের বাণ যে আজ আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে গর্জ্জে উঠেছে,—সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্যে,—আর চোখের সুমুখে প্রতিদণ্ডে যে তার জলোচ্ছ্বাস মাটির বাঁধের প্রত্যেক পরমাণুকে কাঁপিয়ে তুলছে, একি তবে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড একটা?—না, তা নয়।

জগতে তারাই তত সংরক্ষণশীল, যারা নূতনকে যত বেশী করে আমল দেয়; আর তারাই সকলের চেয়ে পুরাতনকে চাইতে শিখেছে, যারা প্রতিক্ষণে তাদের সাদর অভ্যর্থনার রঙীণ নিশান আর দেবদারুর সবুজ পত্র সজ্জিত করে রেখেছে, নিত্যনূতনকে আদর করে গ্রহণ করবার জন্যে। হে নববর্ষ, প্রাচীনের উপাসক আমরা তাই তোমাকে সাদরে আহ্বান করছি—তুমি এস!

কোনও প্রাচীন ব্যক্তি ৯০ বৎসর বয়সে এমন একটা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন যার নাম তিনি জীবনে কখন শোনেন নি, এবং সেই একই কারণে সে রোগের ঔষধের কোন তল্লাস তিনি সমস্ত বৈদ্যশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পান নি। কোন আধুনিক ডাক্তার তাঁর জন্যে ইংরেজী ঔষধের ব্যবস্থা করায় তিনি বলেছিলেন, "বাপু হে! আজকালকার ওষুধগুলো দিয়ে আমার প্রাচীনত্ব নষ্ট কোরো না"; তাইতে আধুনিক ডাক্তারটি উত্তর করেন,—"মশাই, আপনার প্রাচীনত্ব যাতে আরো পাকা হতে পারে, অর্থাৎ আরও দশ বছর বেঁচে থেকে আপনি যাতে মরবার সময় বলে যেতে পারেন যে পুরো-পুরি century up করেছি, তারি বন্দোবস্ত করছি। আমার নতুন ওষুধ আপনার প্রাচীনত্বকে আরো প্রাচীন হবার অবসর দিচ্ছে মাত্র—নষ্ট করছে না।" আমরাও প্রাচীনপন্থীদের ডাক্তারবাবুর মত-করে ভরসা দিচ্ছি, তাঁদের পুরাতন যাতে আনাভি-শুভ্র-শ্মশ্রুরাজী পরিশোভিত হয়ে যুগ যুগ ধরে আপনাকে পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে পুরাতন হতে পুরাতনতর করে তুলতে পারে, তারি চেষ্টা করছি। আর সেইজন্যেই পুরাতনের রাজদরবারে নূতনের দূতকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এত ঘন ঘন পাঠান হচ্ছে; এতে পুরাতনের রাজত্ব দৃঢ় হয়ে উঠবে, তার শক্তি আরো অক্ষুণ্ণ হবে—এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের বলে গেছেন একটা "নতুন কিছু" করতে (অবশ্য ব্যঙ্গ করে)। এখানে "নতুন কিছু" অর্থে সৃষ্টিছাড়া কিছু, অর্থাৎ যা জগতের কোন-কিছুর সঙ্গে খাপ খায় না—একটা খাপছাড়া কিছু। আমাদের নূতন অবশ্য আদবেই তা নয়, বরং

আমার বোধ হয় এ জগতে কিছু যদি খাপছাড়া বদনামের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে আমাদেরই ঐ নূতন। সেই ত পুরাতনকে বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চলবার ক্রমাগত সাহায্য করে আসছে; সেই ত কালকের জগতকে আজকের জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে, হাত ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে; সেই ত তাকে প্রতিক্ষণে খাপছাড়া হতে দিচ্ছে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আজও তাকে সৃষ্টিছাড়া হবার সমস্ত আশঙ্কা, সমস্ত সম্ভাবনার হাত হতে, সেই ত মা'র মত করে আগ্‌লে রেখে দিয়েছে। তাই আমরা আজ প্রাচীনের জীর্ণ দেউলের সর্ব্বোচ্চ পৈঠার উপর দাঁড়িয়ে নবীনকে সাদরে আহ্বান করছি, আমাদের প্রাচীনকে মহিমান্বিত করে তোলবার জন্যে। হে নবীন! তুমিই ত প্রাচীনের সমস্ত তালুক মুলুক আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে রক্ষা করে আসছো, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর মত। তুমিই ত প্রাচীনকে আজও নিঃস্ব হবার সমস্ত সম্ভাবনা হতে বাঁচিয়ে রেখেছ, তাই তোমার উপাসক আমরা নিজেদের সকলের চেয়ে সংরক্ষণবাদী বলে গর্ব্ব করে থাকি। তাই তোমাকে যারা ভালবাসে, তাদের আমরা সকলের চেয়ে প্রাচীন-ভক্ত বলে শ্রদ্ধা করি।

নবীনের ঐ সূক্ষ্ম গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে কত বড় প্রাচানতার গাম্ভীর্য্য যে লুকিয়ে রয়েছে, তা যদি সকলে দেখতে পেতো, তাহলে নবীনের জন্যে ঘরে ঘরে উৎসব জেগে উঠতো, তার আগমনের পথ কুসুমাস্তৃত হয়ে উঠতো।

যা অপরিচিত তাইত নূতন, যাকে চিনতে যত বেশী দেরি হয় সে তত বেশী নূতন; আর পূরাতন সেই, যাকে দেখলেই চিনতে পারি। আজকের এই যুগে আমরা কি চিনিনা বেশী করে জাতিভেদ-বিদ্বেষকে

জাতিভেদ-প্রিয়তার চেয়ে? আমরা কি চিনিনা, বিধবাবিবাহকে একাদশী-তত্ত্বের গূঢ়তার চেয়ে? আমরা কি চিনিনা বঙ্কিম বাবুকে তর্কপঞ্চাননের মুণ্ডিতমস্তকপরিশোভিত বিশাল বপুর চেয়ে? এরাই কি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অর্গল একে একে খুলে দিয়ে একেবারে তার অন্তস্তলে অতি বড় পরিচিতের মত প্রবেশ করেনি? আর অন্যগুলো বাইরে রাজপথে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে নেড়ে একে একে ফিরে যাচ্ছে নাকি?—তবে পুরাতন কে? হে নবীন! তুমিই পুরাতন। তুমিই ত প্রতিক্ষণে যা-কিছু নূতন আছে তাকে আমাদের কাছে পুরাতন করে তুলছো; তুমিই ত যা-কিছু অপরিচিত তাকে পরিচিত করে তুলছো। হে নববর্ষ! তাই তোমাকে প্রাচীনের তরফ থেকে অভিনন্দন দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর। হে প্রাচীন! হে চিরন্তন! তোমার আগমনী তাই আজ আকুল কণ্ঠে গাইছি; তোমার পূজার অর্ঘ্য তাই এত ভক্তি এত শ্রদ্ধার সঙ্গে রচনা করছি—তুমি এস। তোমার আগমনে সমস্ত দেশ জেগে উঠুক,—তন্দ্রা টুটে, আলস্য অবসাদ জড়তা দূরে ঠেলে দিয়ে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

পত্র।

—:০:—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু,—

তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্য, লোকে বলে তার প্রধান কারণ—তোমার রূপ আছে। তোমার প্রতি আমার প্রীতির প্রধান কারণ ঐ না হলেও যে প্রথম কারণ, এ কথা অস্বীকার করা আমি মোটেই আবশ্যক মনে করিনে। আমি জীবনের অর্দ্ধেকের চাইতে বেশী পথ পার হয়ে এসেছি, এবং চোখ চেয়ে চলা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কিন্তু এত দিনেও পথিমধ্যে এ সত্যের আমি সাক্ষাৎ পাই নি যে, রূপের অভাবেই গুণের পরিচয়। রূপ যে একটা গুণ, এবং অসামান্য গুণ—এ কথা অস্বীকার করবার জন্য এত লোক যে কেন এত উৎসুক, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। রূপ হচ্ছে বিধাতার নিজের হাতের লেখা পরিচয়পত্র,—তা সে জড়েরই হোক, আর জীবেরই হোক। শুধু তাই নয়, ও পত্র হচ্ছে, ইংরাজিতে যাকে বলে খোলা-চিঠি। ভগবান বিশ্বমানবের চোখের সুমুখে তা ধরে দিয়েছেন—সে সুপারিস অগ্রাহ্য করার ভিতর বিনয় নেই, বিচার নেই,—আছে শুধু হয় অন্ধতা নয় পরশ্রীকাতরতা।

দাঁড়াও, এ কথা শুনে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠো না। ভগবান মানুষকে যা দিয়েছেন, তার যথেষ্ট মর্যাদা থাকলেও—মানুষ নিজে যা

দিতে পারে, মানুষের কাছে তার মূল্য ঢের বেশী। রূপ শুধু পূর্ব্ব-রাগের জন্ম দেয়, কিন্তু যে সব কারণে সে রাগ অনুরাগে পরিণত হয়, তার সংখ্যা অসংখ্য; কেননা এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রবৃত্তির চাইতে তার প্রকৃতি প্রবল। প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তের, প্রকৃতি চিরদিনের। তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্য, তার বিশেষ কারণ, তুমি একাধারে আমার শিষ্য ও গুরু। কথাটা একটু নতুন শোনাচ্ছে। কিন্তু তা বলে কি করা যাবে? কথাটা যে সত্য! সত্যকথা ত চিরদিনই নতুন শোনায়। সত্যের ধর্ম্মই ত এই যে, তা কখনও পুরোণো হয় না, কিন্তু মানুষকে তা যুগে যুগে নতুন করে চিন্‌তে হয়। এই নিয়েই ত যত মুস্কিল। সে যাই হো'ক্, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে মনের কারবারে পরস্পরের আদান প্রদানের সম্বন্ধ, এ ব্যাপার এতই প্রত্যক্ষ যে, তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। গুরু যদি হন শুধু বক্তা, আর শিষ্য শুধু শ্রোতা—তাহলে পৃথিবীতে গ্রামোফোনের তুল্য আর দ্বিতীয় গুরু নেই। যদি পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে যেখানে গুরু কালা আর শিষ্য বোবা, তাহলে আর যিনিই হন, তুমি আমি সে দেশের লোক নই। কে কার কাছ থেকে মনের খোরাক কতটা আদায় কর্‌তে পারে, এই নিয়ে যেখানে পরস্পরের রেষারেষি জেগে ওঠে, সেইখানেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পাকা। তুমি তর্ক করে, প্রতিবাদ করে, আপত্তি জানিয়ে, উপদেশ দিয়ে আমাকে অস্থির করে তোলো,—এই গুণেই ত তুমি আমার প্রিয়শিষ্য।

তুমি আমাকে প্রবন্ধ লেখা থেকে ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করেছ। এ অনুরোধ আমি আদেশ হিসেবে শিরোধার্য্য কর্‌ছি। আমার মনেও কিছুকাল হতে প্রবন্ধের প্রতি বিরতি জন্মেছে। তার কারণ

প্রবন্ধ জিনিসটে সাহিত্য কিনা, এই নিয়ে আমি এদানিক মাথা বকাচ্ছিলুম, কিন্তু কোনও একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি; এমন সময়ে তোমার একটি কথায় আমার সকল দ্বিধা দূর করে দিলে। তুমি লিখেছ—"প্রবন্ধ স্ত্রীলোকে পড়ে না, পড়্‌তে চায় না, পড়্‌তে পারে না এবং পড়্‌লে কাতর হয়ে পড়ে।"

এ কথা যে সত্য, তা অস্বীকার করবার জো নেই। প্রবন্ধ জিনিসটি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ছাঁচে ঢালাই করা; এবং ইউক্লিড আর যারই হন্—স্ত্রীলোকের প্রিয় লেখক নন। ও-জাতির কাছে আসল বস্তুই হচ্ছে Q. E. D.—তার প্রমাণ-প্রয়োগ যেমন অবান্তর, তেমনি বিরক্তিকর। ভাল কথা, ইউক্লিড সম্বন্ধে সেদিন কোন্ একখানা বইয়ে একটা কথা পড়ছিলুম, যা শুনে তুমি না হেসে থাক্‌তে পার্‌বে না। ও ভদ্রলোক স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে থাক্‌তেন! এর কারণ শুন্‌লে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ইউক্লিড ছিলেন মেগারার অধিবাসী। তখন মেগারার সঙ্গে আথেন্সের ঘোর শত্রুতা চলছিল। মেগারার লোকের আথেন্সে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, সে নিষেধ অমান্য করে কেউ আথেন্সে দেখা দিলে তার প্রাণদণ্ড হত। ইউক্লিড কিন্তু নিজের প্রাণের চাইতে তাঁর গুরু সক্রেটিসের মুখের কথা এত বেশী বহুমূল্য মনে কর্‌তেন, যে তিনি মেয়ে সেজে রাত্রিযোগে আথেন্সে যাতায়াত কর্‌তেন। তাঁর রূপের গুণে তাঁর ছদ্মবেশ কখনও ধরা পড়ে নি। এমন অভিসারিকার কথা এ দেশে কেউ কখন পড়েছে, না শুনেছে? এর পর তাঁর মন থেকে যে ঐ সব ভীষণ প্রতিজ্ঞা বেরবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ইউক্লিড নারীবেশই ধারণ করুন আর যাই করুন, যে লেখার ভিতর ইউক্লিডের রূপ আছে, তা মেয়ে-

ভোলানো লেখা নয়। অতএব দাঁড়াল এই যে, প্রবন্ধের স্থান—সাহিত্যের না হোক—বাংলা সাহিত্যের বাইরে। তুমি একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছ, সে হচ্ছে এই যে, আমার প্রবন্ধ এদেশের অনেক পুরুষেও "পড়ে না, পড়্‌তে চায় না, পড়্‌তে পারে না, এবং পড়্‌লে কাতর হয়ে পড়ে"।

এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ কার জন্য লেখা? তার সন্ধান আমি সম্প্রতি পেয়েছি।

কোনও সমালোচক লিখেছেন যে, আমার হাত থেকে যা বেরয় তা হচ্ছে সব "চক্‌চকে খেলনা"। অর্থাৎ আমার লেখা আসলে ছেলে ভোলানো। এই সমালোচনাই প্রমাণ যে আমার লেখা সার্থক হয়েছে—কেননা বাংলাদেশে আমার লেখার খোদ্দেরের অভাব হবে না।

সে যাই হো'ক, তোমার কথায় প্রবন্ধ লেখায় না হয় খতম দিলুম—তারপর কি লিখব? কবিতা? গদ্যের অসি ছেড়ে পদ্যের বাঁশি ধরব? সাহিত্যের স্কুলে এরকম ডবল-প্রমোশান পেতে কার না লোভ হয়, কিন্তু এ বয়েসেও ও-লোভ যে সম্বরণ কর্‌তে না শিখেছে, তার হাত থেকে—অসি বাঁশী ত বড় জিনিস—কলমও কেড়ে নেওয়া উচিত! পঞ্চান্ন বৎসরের লোককেও যে ধরে বেঁধে অসিধারী করা যায়, তার প্রমান ত আজ নানাদেশে পাওয়া-যাচ্ছে। কিন্তু Conscription-এর সাহায্যে মানুষকে যে বংশীধারী করা যায়, এর প্রমাণ আজও মেলে নি। এর কারণ হিংসা করবার ক্ষমতা বুড়োহাড়েও থাকে, কিন্তু আনন্দ দেবার শক্তি যৌবনেরই সহোদর।

দেখো, কে কি লিখবে তার চেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে কে কি পড়বে। তুমি কি পড়ে এই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবে, সে বিষয়ে আমার

পরামর্শ চেয়েছে। আমি বলি, যে লেখার রূপ নেই তা তুমি পড়োনা, হোক না সে লেখা ওজনে ভারি। তুমি যদি রচনার রূপ উপভোগ কর্‌তে শেখো, তাহলেই তুমি মনোজগতে মুক্তপুরুষ হয়ে যাবে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

“রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়”

তাঁর কথা অবলম্বন করে' আমি বল্‌ছি যে, যে রূপের ভিতর কামগন্ধ নেই, সে রূপের সন্ধান শুধু আর্টে পাওয়া যায়। অবশ্য এ স্থলে “কাম” শব্দ তার কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝলে চল্‌বে না। যে রূপ মানুষের কামনার বহির্ভূত, সেই রূপ যে চিনতে শিখেছে, একমাত্র সে-ই রসের স্বরূপের সাক্ষাৎ পায়। বলা বাহুল্য একই লেখা এক-জনের কাছে কামগন্ধে ভুরভুর কর্‌তে পারে, কিন্তু আর একজনের কাছে তার ভিতর কামের নামগন্ধও না থাক্‌তে পারে। সেটা নির্ভর করে কার মন কোথায় আছে তার উপর—কামলোকে না রূপলোকে?

কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা যে রকম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে করে কি লিখব কি পড়ব তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশে আর লেখাপড়া করা চল্‌বে কিনা? এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, দেশে যখন মহামারি দেখা দেয়, তখন লোকে পুজো সরস্বতীর করে না, করে রক্ষাকালীর; অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার মানুষে সহজ উপায় বার করেছে—মৃত্যুরই উপাসনা করা। আত্মরক্ষার এ প্রচেষ্টা নিরর্থক বলে' কোনও লাভ নেই, কেননা, এ চেষ্টার মূলে যা আছে তা হচ্ছে মানুষের প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞা নয়,—বিচলিত হৃদয়।

আজ আমাদের পশ্চিম আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে। যে সমরানল সমগ্র ইউরোপে ও অর্দ্ধেক এসিয়াতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে; সে আগুন শুন্‌ছি আমাদের ঘরেও লাগবার সম্ভাবনা; এবং সে সম্ভাবনাও সুদূর নয়, কেননা যে যুগে বাস্প আর বিদ্যুৎ হয়েছে মানুষের বাহন, সে যুগে 'দূর' শব্দের কোনও জানা শোনা মানে নেই। এ সকল দুর্নিমিত্ত দেখে আমরা সকলেই ভীত না হয়ে পড়ি, ত্রস্ত হয়ে উঠেছি। তাদৃশ ভীত না হবার কারণ, আমরা আমাদের চিরকেলে অভ্যাসবশত সাপকে লতা বলে' মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, যদিচ আমরা সকলেই জানি, লতা বল্‌লেও সাপ সাপই থাকে এবং তার কামড়ে মানুষ মরে। আর জর্ম্মাণি যে সে সাপ নয়, একেবারে অজগর।

এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য তা বলে দেবার ভার রইল, আমাদের পলিটিকাল নেতাদের হাতে। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে" এ কথা যদি সত্য হয়—এবং এ কথা যে সত্য তা এক পলিটিসিয়ান ছাড়া আর কে অস্বীকার কর্‌বে—তাহলে দেশের লোককে তাদের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হতে, আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। কেননা সাহিত্যের কাজ, কাউকে কর্ত্তব্য শেখানো নয়, সকলকে আনন্দ দেওয়া।

এ পর্য্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। তারপর প্রশ্ন ওঠে এ অবস্থায় সরস্বতীর সেবকদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য। প্রথমেই মনে হয় এ সমস্যার সহজ মীমাংসা হচ্ছে সাহিত্যের দোকানপাট তুলে দেওয়া। এই আসন্ন বিপদের দিনে আমরা লিখতে পারি, কিন্তু সে লেখা পড়বে কে? কিন্তু দোয়াত কলমের সংস্রব না হয় আমরা ত্যাগ করলুম, তাই বলে কি দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে পুঁথির

সংস্পর্শ ত্যাগ করা সঙ্গত হবে? ঝড় বলো, ভূমিকম্প বলো, বন্যা বলো, এ সব ব্যাপার অতি ভীষণ হলেও ক্ষণস্থায়ী, আর সাহিত্য অতি সুকুমার হলেও চিরস্থায়ী। সুতরাং দুর্দ্দিনেও তা অপরিহার্য্য। তবে সুদিনের সাহিত্য ও দুর্দ্দিনের সাহিত্য অবশ্য এক নয়।

গেটে বলেন, দেশে যখন মহামারি উপস্থিত হয় তখন লোকের পড়া উচিত টনিক সাহিত্য। এ উপদেশ যখন গেটের তখন, আমাদের সকলকে তা মাথা পেতে নিতে হবে। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে "টনিক" বিশেষণের সার্থকতা কি তা আন্দাজ করতে পারলেও দুকথায় বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে কোন্ সাহিত্য যে টনিক নয়, সে কথা বলা তেমন শক্ত নয়।

প্রথমত আমাদের চল্‌তি সাহিত্যের কথা ধরা যাক্। যে সাহিত্যের দিনে দুবার জন্ম হয়, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আর বক্তৃতার মঞ্চে, আর যার নাম পলিটিকাল সাহিত্য, তা অবশ্য মোটেই টনিক নয়। সে সাহিত্যের যে রস, তা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে রস মিশ্র এবং লোকে বলে তা বিলেতি। করুণ রসের "সোডার" সঙ্গে বীররসের "আসিড" মিশিয়ে তা তৈরি কর্‌তে হয়। তাই পলিটিকাল সাহিত্য প্রথমত আপাদমস্তক ফেনিল, তার পর সে সাহিত্য উথলে ওঠে অথচ তার ভিতর তাপ নেই, ফোঁস ফোঁস করে অথচ তার ভিতর প্রাণ নেই। সে সাহিত্য যে এতটা লোকপ্রিয় তার কারণ, ও ফেন গলাধঃকরণ করবার সময়, ভোক্তার ভিতরটা ক্ষণিকের জন্য চিন্‌চিন্ করে' ওঠে, আর সে মনে করে জিনিসটা ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্দ্ধক। বলা বাহুল্য ও ধারণা একটা ভ্রান্তি মাত্র। অথচ আমাদের রাজনীতি, দেশের মনের অগ্নিমান্দ্যের জন্য

কোনও টনিক অদ্যাবধি তৈরি করতে পারে নি। ও সাহিত্যের যা কিছু হেরফের সে শুধু ঐ দুই বস্তুর মাত্রা নিয়ে। আমাদের পলিটিক্সের যে দুদল হয়েছে তার কারণ এদের এক দলের সাহিত্যে সোডার ভাগ বেশী, আর এক দলের সাহিত্যে আসিডের।

আজকের দিনে এ সাহিত্য যে রূপধারণ করেছে তাতে মানুষকে চাঙ্গা করা দূরে থাক, দ্বিগুণ দমিয়ে দেয়। এই রক্ত-সন্ধ্যার করাল আলোকে আমাদের সকল অক্ষমতা, সকল দৈন্য, আরও বেশী করে ফুটে উঠছে। অমনি আমাদের পলিটিকাল সাহিত্য, আমাদের দুরবস্থার ছবি নৈরাশ্যের কালীতে এঁকে সকলের চোখের সুমুখে ধরে দিচ্ছে। আমাদের ইতিহাস যদি অন্যরূপ হত তাহলে আমরা যে অন্যরূপ হতে পারতুম, এই কথাটা নানাসুরে নানাছাঁদে বলা হচ্ছে,—কিন্তু আমরা অন্যরূপ হলে যে আমাদের ইতিহাস অন্যরূপ হতে পারত, এমন কি এখনও হতে পারে, এ কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। ইতিহাস যে মানুষ গড়ে তা আমরা সকলেই জানি,—কিন্তু আমাদের এটাও জানা উচিত যে মানুষেও ইতিহাস গড়ে। এ সত্য যদি আমরা উপেক্ষা না করতুম, তাহলে ইতিহাস আমাদের গড়্‌ত না, আমরা ইতিহাস গড়তুম। মানুষের জীবন কতক অংশে অদৃষ্ট ও কতক অংশে পুরুষকারের অধীন। যে সাহিত্য পুরুষকারের গুণ গায় তাই টনিক, আর যা অদৃষ্টের দোষ দেয় তাই আণ্টি-টনিক।

সুতরাং টনিক সাহিত্যের সন্ধানে আমাদের বর্ত্তমানের দৈনিক সাহিত্যের বাইরে যেতে হবে। এবং আমরা ভারতবর্ষের অতীতের যত দূরদেশে যাব, তত বেশী টনিক সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাব।

বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই, কিন্তু সে

সাহিত্যের যে দুটি একটি বাণী আমার কানে এসে পৌঁচেছে তার তুল্য টনিক কথা ভূভারতে আর নেই। গায়ত্রী মন্ত্রের মত, আত্মার বল-কারক মন্ত্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। ওর ভিতর কোনও রূপ ভিক্ষা, প্রার্থনা, দরবার, কিম্বা আবদারের নামমাত্র নেই। মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বরেণ্য বস্তু যে আলোক, বাইরের এবং ভিতরের, এ সত্য যদি আমরা বিস্মৃত না হতুম তাহলে আমাদের এ দুর্দ্দশা হত না।

তার পর প্রাচীন যুগের আগাগোড়া সংস্কৃত সাহিত্য টনিক, তা সে ধর্ম্মশাস্ত্রই হোক্ আর মোক্ষশাস্ত্রই হোক্। গীতা যে, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দেয় না—তা সকলেই জানেন। মনুও যে দেন না, তার পরিচয় মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখতে পাবেন। সেকালে যিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্তেন তাঁর মহাপ্রস্থানের দুঃসাহিসকতার কথা কল্পনা করতেও আমাদের রোমাঞ্চ হয়। এমন কি, সংস্কৃত কামশাস্ত্রে যে কামের চর্চ্চার কথা আছে তা কর্তে পারে শুধু সেই লোক— যার হৃদয় পাষাণে আর দেহ ইস্পাতে গড়া। ও সাহিত্য অবশ্য টনিক নয়, একেবারে বিষবড়ি!

হয়ত অনেকে বলবেন, এ সব শাস্ত্র সাহিত্যই নয়। তথাস্তু। অতঃপর সাহিত্যেই আসা যাক্। মহাভারত যে টনিক এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই।

রামায়ণ অবশ্য মহাভারতের সমশ্রেণীর কাব্য নয়। এ কাব্য আর্য্য-সভ্যতার সঙ্গে অনার্য্য সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী। এই সংঘর্ষে অবশ্য আর্য্যসভ্যতাই জয়ী হয়েছিল, কিন্তু এ কাব্যের অন্তরে উত্তরাপথের টনিক সভ্যতার সঙ্গে দক্ষিণাপথের অটনিক সভ্যতার স্পর্শের প্রথম

পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই সূত্রে sentimentalism প্রবেশ লাভ করে।

ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে যথার্থ কাব্যের রাজ্যে এলেও আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই যে—সংস্কৃত কাব্য যত প্রাচীন তত টনিক, এবং যত অর্ব্বাচীন তত অস্বাস্থ্যকর। ভাসের নাটকের সঙ্গে জয়দেবের পদাবলীর তুলনা করলে এ সত্য সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিমধ্যের ইতিহাস এই অধঃপতনের ইতিহাস। যুগের পর যুগে তার দুর্ব্বলতা যে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, একই শ্রেণীর পূর্ব্বাপর কাব্যের তুলনা করলে তার প্রমাণ অসংখ্য পাওয়া যায়। শকুন্তলার রসের সঙ্গে উত্তররাম চরিতের রসের সেই প্রভেদ, হৃদয়ের রক্তের সঙ্গে চোখের জলের যে প্রভেদ। অমরুশতক মকরধ্বজ কি না জানি নে—কিন্তু ভর্তৃহরির শতকের প্রতি শ্লোক যে strychnine-এর পিল তাতে আর সন্দেহ নেই। এক কথায় মন্দাকিনীর জল টনিক, ভোগবতীর নয়। আর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে অর্ব্বাচীন কাব্যের সেই প্রভেদ, মন্দাকিনীর সঙ্গে ভোগবতীর যে প্রভেদ।

আমার কথা ভুল বুঝোনা। আমি এ কথা বলতে চাইনে যে, যে লেখা টনিক নয় তা সাহিত্য নয়। তাহলে ত বাংলা ভাষার বারো আনা লেখা সাহিত্যের বাইরে পড়ে যায়। আমার বক্তব্য এই যে, যে সাহিত্য টনিক নয়—মহামারীর প্রকোপের ভিতর তার পঠন পাঠন সমীচীন নয়; অবশ্য যদি গেটের মত আমরা মান্য করি।

আমি নিজে যে ও মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি নে, তার প্রমাণ, যুদ্ধের নাম শোনবামাত্রই, প্রথম কথা যা আমার মনে পড়ে গেল, সে হচ্ছে

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। এই যে মানব সভ্যতার শেষ কথা তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডেও আমার এ বিশ্বাস টলাতে পারে নি, কেননা এ ব্যাপার এই সত্যেরই প্রমাণ দিচ্ছে যে, মানুষ আজও তার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে নি। নর সংস্কৃত-বানর কিম্বা বানর নরের অপভ্রংশ এ নিয়ে জীবতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে আজও তর্ক চল্‌ছে। তাত্ত্বিক ও তার্কিকদের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই, মানুষেও মর্কটে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত যথেষ্ট মিল আছে। মর্কটের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কি না জানি নে—কিন্তু মানুষের ভিতর যে মর্কটত্ব আছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। মানুষে মানুষে যা প্রভেদ, সে হচ্ছে প্রধানত এই মনুষ্যত্ব ও মর্কটত্বের অনুপাত নিয়ে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এ হচ্ছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বাণী, অতএব আমাদের অন্তর্নিহিত মর্কট সে বাণীকে অবজ্ঞা করে' উপহাস করে' বলে, ও হচ্ছে দুর্ব্বলের ধর্ম্ম।

এ অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ, যে যুগে ভারতবর্ষ এই ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেছিল সেই হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব শক্তির যুগ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে কলায়, সাম্রাজ্যে ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের কৃতিত্বের আর তুলনা নেই। তার কারণ, শুধু রণক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকলক্ষেত্রে যারা বীর তারা ছাড়া আর কেউ ও ধর্ম্ম যথার্থ গ্রহণ ও পালন কর্‌তে পারে না। কেননা ও ধর্ম্ম অনুসরণ করবার ভিতর যে বীরত্ব, তা ক্ষণিকের নয় চিরজীবনের। সে বার্য্যের অন্তরে অগাধ করুণা আর অটল ধৈর্য্য সমান থাকা চাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে বীরের ধর্ম্ম, সে জ্ঞান আদি বৌদ্ধদের পূর্ণমাত্রায় ছিল সেইজন্যে তাঁদের কথা-সাহিত্যের নাম "অবদান" অর্থাৎ বীর কাহিনী।

এ সাহিত্য আমি পূর্ব্বে কখনও শ্রদ্ধাভরে পড়ি নি,—কেননা জাতকমালার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় থেকে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে ও হচ্ছে ছোটছেলের সাহিত্য। কিন্তু সেই জাতকমালা সে দিন আবার পড়্‌তে গিয়ে তার ভিতর এক মহাবস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, সে হচ্ছে মানুষের আত্মনির্ভরতার মহত্ব। বৌদ্ধযুগ যে শক্তির যুগ, তার কারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মানুষকে তার আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌তে শিখিয়েছিল। শাক্যসিংহ যে, মানুষের হাতেগড়া মানুষের পায়ের বেড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তাদের হাতের কড়া ও খুলে দিয়েছিলেন—তাঁর ধর্ম্মপুত্রেরা দেবতার কাছেও হাতজোড় কর্‌তেন না। তাঁদের চিরনির্ভর স্থল ছিল, নিজের ধর্ম্মবল ও নিজের কর্ম্মবল। তুমি ভাব্‌ছ আমি আজ কি একটা খেয়ালের মাথায় বৌদ্ধদের আকাশে তুলে দিচ্ছি। এ সব যে আমার কল্পনা নয় তার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে সুপারগ জাতকের গল্পটি বলছি।

পুরাকালে ভারতবর্ষে একটি মহাসত্ত্ব পরমনিপুণমতি নৌ-সারথি ছিলেন। তাঁর যাত্রাসিদ্ধির গুণে লোকসমাজে তিনি সুপারগ নামে প্রসিদ্ধ হন। কোনও এক সময়ে সুবর্ণভূমির বণিকগণ সাগরপারে যাবার সংকল্প করে সুপারগের দ্বারস্থ হন। বার্দ্ধক্যবশত তখন তাঁর দেহ জরাশিথিল হয়ে পড়েছিল, দৃষ্টিক্ষীণ হয়ে এসেছিল, স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়েছিল, বলে' প্রথমে তিনি মহাসমুদ্র যাত্রা কর্‌তে স্বীকৃত হন নি; নিজের জীবনের ভয়ে নয়, যাত্রীর বিপদ আশঙ্কা করে। বণিকগণের নির্বন্ধাতিশয্য অতিক্রম কর্‌তে না পেরে অবশেষে তিনি ভরুকচ্ছ হতে মহাসমুদ্র যাত্রা কর্‌লেন। দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেল, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সে ঝড়ের বর্ণনা এত সুন্দর

যে তা অনুবাদ করবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন কিন্তু এখন তার সময় নেই। সে বর্ণনা তুমি জাতকমালায় পড়ে দেখো। এই ঝড়ের মধ্যে সাংযাত্রিকেরা কে কি করলেন শোনো—

"নিজ নিজ সত্ত্বগুণ অনুসারে কেউ বা ত্রাসদীন হয়ে পড়্‌ল, কেউ বা বিষাদমূক, কেউ বা স্বদেবতার নিকট প্রাণ যাচ্ঞা কর্‌তে লাগল, কেউ বা ধীরভাবে অবস্থিতি কর্‌তে লাগল, কেউ বা প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হল।"

তখন যারা ভয়বিষাদে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল সুপারগ তাদের সম্বোধন করে বল্‌লেন—

"যারা মহাসমুদ্রে অবতরণ করে তাদের কাছে এইরূপ ঔৎপাতিকক্ষোভ পরিক্লেশ মোটেই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়;—অতএব তোমরা বৃথা বিষাদকে আশ্রয় করো না। বিষাদ, বিপদের প্রতিকারবিধি নয়—সুতরাং দীনচেতা হওয়ায় কোনও লাভ নেই। যারা ধীর কেবলমাত্র তারাই কার্য্যউদ্ধারে দক্ষ, কেন না তারা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা কৃচ্ছ্র অবস্থা হতে উদ্ধারলাভ করে। তোমরা সকলে বিষাদ দৈন্য পরিহার করে এ বিপদ হতে যাতে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করো। যে প্রাজ্ঞ তার ধৈর্য্যজ্বলিত তেজ সর্ব্বার্থসিদ্ধি-লাভে অগ্রহস্ত।

ঝড় কিন্তু উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল শেষে যখন সকলে প্রাণের আশা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হল তখন সাংযাত্রিকেরা

"কেউ বা রোদন কর্‌তে লাগল, কেউ বা কখন বিলাপ, কখন চিৎকার কর্‌তে লাগল, কেউ বা ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে জড় পদার্থের মত অবস্থিতি কর্‌তে লাগল, কেউ বা ভয়কাতরচিত্তে ইন্দ্রকে প্রণাম কর্‌তে লাগল, কেউ বা আদিত্যকে কেউ বা বসুকে কেউ বা বায়ুকে কেউ বা সমুদ্রকে। কেউ বা মন্ত্র জপ কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল, অপর অনেকে বিচিত্র আকারে বিধিমত প্রকারে

দেবীকে প্রণাম করতে লাগল। কেউ বা সুপারগের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে আক্ষেপ করতে লাগল।"

এই ব্যাপার দেখে সুপারগ সাংযাত্রিকদের সম্বোধন করে বললেন "তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য ধরে থাকো উদ্ধারের একটী উপায়ের কথা আমার মনে হয়েছে।" এই বলে তিনি দক্ষিণ জানু নৌকাবক্ষে স্থাপন করে নৌকাকে প্রণাম করে এই শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

"আমি আমার আত্মাকে যতই স্মরণ করছি, ততই আমার স্মরণ হচ্ছে যে যত দিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি কখনও প্রাণীহিংসার চিন্তাও মনের মধ্যে স্থান দিই নি। এই সত্যবাক্যবলে ও আমার সেই পুণ্যের বলে এই নৌকা বড়বার মুখহতে প্রতিনিবৃত্ত হউক।

অমনি বায়ুর বেগ মন্দীভূত হল, নৌকা বড়বার মুখ হতে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে, মহাসমুদ্রের বক্ষে, নির্ম্মল আকাশে রাজহংসীর মত শোভা পেতে লাগল।

সাহিত্য এর চাইতে আর কত বেশী টনিক হতে পারে? এই যুদ্ধের ঝড় যদি ভারতবর্ষের ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে ভারতবাসীদের অবস্থা যে ঐ সাংযাত্রিকদের মতই হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমাদের কপালে অমন সুপারগ মিলবে কি না? আজ এইখানেই শেষ করি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

২৬শে এপ্রিল ১৯১৮

বীরবল।

দেশের কথা।

—:*:—

গত বৎসরের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষে পদার্পণ। তাঁর আগমনে, আমাদের পলিটিকাল আত্মা যে কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অতিমাত্র চঞ্চলতায় ও মুখরতায়। কিন্তু আজ যখন সোরগোল মাতামাতি অনেকটা কমে এসেছে, তখন একটু ধীরভাবে ভেবে দেখা যাক্ ব্যাপারটা হ'ল কি।

মণ্টেগু সাহেব এসেছিলেন বোধহয় আমাদের পলিটিকাল জ্ঞান এগজামিন কর্‌বার জন্যে। তিনি আমাদের কাছে থেকে তাঁর প্রশ্নের লিখিত জবাব আর মুখের জবাব, দুইই নিয়েছেন। শুন্‌তে পাই vivaতে আমাদের অধিকাংশ নেতাই একদম ফেল করেছেন—কিন্তু লিখিত জবাবে সকলেই ফাষ্টক্লাস পাস করেছেন। Problem কষতে আমাদের তুল্য আর কে আছে?—তা সে জ্যামিতিরই হোক্ আর রাজনীতিরই হোক্। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এ পরীক্ষার জবাবগুলি সব যদি একত্র করে ছাপানো যায়, তাহলে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, যা পড়ে আমরা চিরজীবন হাস্‌তে পার্‌ব; এক কথায় ও গ্রন্থ হবে নব-ভারতবর্ষের নবকথা সরিৎসাগর।

সে যাই হোক, মণ্টেগু সাহেবের আগমনের একটা মস্ত সুফল ফলেছে। আমরা আমাদের পলিটিকাল দাবীর আরজি প্রস্তুত কর্‌তে

বাধ্য হবার দরুণ, আমাদের নিতান্ত অস্পষ্ট পলিটিকাল মনোভাবকে স্পষ্ট কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। এ একটি মহালাভ। আমরা আজ সকলেই জানি যে, আমাদের পলিটিক্সের নানা দলের কে কি চান্‌। এর ভিতর থেকে একটি খুব মোটা সত্য বেরিয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে—স্বরাজ শব্দের অর্থ বাংলা একভাবে বোঝে, আর বাকি ভারতবর্ষ আর একভাবে বোঝে ;—অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে অন্য প্রদেশের পলিটিকাল নেতারা স্ব স্ব প্রদেশের যথার্থ মুখপাত্র। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাকি ভারতবাসীদের এ বিষয়ে মনের অমিল এতটা বেশী যে, এ অমিলের মুল কোথায় তা একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বরাজ হচ্ছে ইংরাজি self-governmentএর ভাষায় অনুবাদ, অতএব-home-rule এরও অনুবাদ—কেন না ও দুই একই বস্তু, তফাৎ যা তা ভাষায়। একটির ভাষা সাধু, আর একটির অসাধু। এ কথা শুনে অবশ্য ও দুই দলই প্রতিবাদ করে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, ও দুই সমাসের আভিধানিক অর্থ এক হলেও, ব্যঞ্জনায় প্রভেদ ঢের। কিন্তু এ দুই পক্ষের প্রতি নজর দিলেই দেখা যায় যে উভয়ের প্রভেদ, ব্যঞ্জনার নয়—ব্যক্তির। তথাপি স্বরাজ অর্থে যে ভারতবর্ষের নানাদেশে, নানাদলে, নানালোকে নানা বস্তু বোঝে, তার দেদার দলিল মণ্টেগু সাহেবের সেরেস্তায় পাওয়া যাবে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের প্রতি দলের পকেটে এক একটি নিজস্ব মনগড়া স্বরাজ আছে ; অথবা সকলের মুখে ও পদ থাক্‌লেও, কারও মনে ও পদার্থ নেই। বোধহয় এই কারণে শেষটা গত কংগ্রেসে সকল প্রদেশের সকল নেতা এক হয়ে কংগ্রেস-লীগের মুসাবিদা গ্রাহ্য করেছেন। এ কথা ত সবাই জানেন। কিন্তু এ কথা হয়ত সবাই জানেন, না যে,

এ ব্যাপারে একমাত্র প্রতিবাদী হয়েছিল বাংলা। কংগ্রেসের গ্রীনরুমে যাঁদের প্রবেশাধিকার আছে তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কোনও বাঙ্গালী, কংগ্রেস-লীগের দুহাতে গড়া স্বরাজ মাথা পেতে নিতে পারেন নি; কেননা তা গ্রাহ্য করে নেবার কোনও বৈধ কারণ নেই। স্বরাজের প্রথম আরজি বড়লাট সভার উনিশ জন দেশীসভ্য দস্তখত করে ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। সে আরজি অবশ্য একটা খসড়া বই আর কিছুই নয়, কেননা সে আরজি রাতারাতি তৈরি কর্‌তে হয়েছিল, সবদিক ভেবেচিন্তে একটা পাকা দলিল তৈরি করবার তাঁদের অবসর ছিল না; অন্ততঃ এই ত তাঁদের কৈফিয়ৎ। সেই খসড়াই একটু আধটু বদলসদল করে নিয়ে কংগ্রেস-লীগ আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং এ দুয়ের প্রভেদ যা, তা উনিশ বিশ। অথচ কংগ্রেস এই জিনিসই শিরোধার্য্য করে নিলেন,; শুধু তাই নয়, আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে এমনটি আর হয় নি, হবে না, হতে পারে না।

এই সূত্রে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক রাজনৈতিক দর্শনের একটি নূতন তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের উচ্চমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝাড়া একঘণ্টা ধরে আমাদের মনে এই কথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে,—মানুষে যখন তার বাসগৃহ তৈরি করে, তখন সে গৃহ ভিৎ থেকে গেঁথে তুল্‌তে হয়; কিন্তু কোনও জাতি যখন তার বাসগৃহ তৈরি কর্‌তে চায়, তখন সে গৃহ ছাদ থেকে গেঁথে নামাতে হয়। আমাদের পলিটিকাল আশা গোড়াতে অত উচ্চ না হলেও ক্ষতি নেই। অপর কোনও ক্ষেত্রে অপর কোনও ব্যক্তি এ রকম কথা বল্‌লে আমরা তা রসিকতা মনে করতে পারতুম। কিন্তু এ রসিকতা নয়—এ হচ্ছে সেকেলে পলিটিক্‌সের একটা মোটা কথা;

এর অর্থ হচ্ছে শাসনতন্ত্র জাতির পক্ষে নিজে গড়ে তোলবার জিনিস নয়, কিন্তু উপর থেকে তার মাথায় চাপিয়ে দেবার জিনিস।

রাজনীতির এ আদর্শ বাঙ্গালী গ্রাহ্য করতে পারে না কেননা না তা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাঙ্গালীর কাছে ন্যাসনালিজমের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্ম্মের চর্চ্চা, এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও বরণীয়, যার অন্তরে একটি বিশেষ জাতির স্বধর্ম্ম পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠবার পূর্ণ অবসর পায়। অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যই তার ন্যাসনালিজমের অটল ভিত্তি। দেশের মত বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জাতির মতি বলে একটি জিনিস আছে। এক একটা জাতির মনের এক একটা বিশেষ গতি আছে; এবং সে গতির এক একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে। বাঙ্গালী জাতির মতির পরিচয়, রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার যত মহাপুরুষদের কথায় ও কাজে পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে কেবলমাত্র রাজনীতিগত নয়— কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী উদার, ঢের বেশী ব্যাপক। আমরা জীবনে ও মনে সমান মুক্তির প্রয়াসী। তাই আমাদের রাজনীতি আমাদের জীবনবেদের বহির্ভূত নয়, অন্তর্ভূত,—এবং একাংশ মাত্র। বাঙ্গালীদের কাছে একটা বিশেষরকম শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের কৃতার্থতার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ আপোষ মীমাংসা করে, জোড়াতাড়া দিয়ে, যে স্বরাজের আদর্শ খাড়া করলেন, তাতে প্রতি প্রদেশের প্রতি জাতির স্ব-বস্তুটি চাপা পড়ে গেল।

এতে পলিটিকাল বুদ্ধিরই যে কি পরিচয় দেওয়া হল, তাও বোঝা কঠিন। এ সত্যও কি সুস্পষ্ট নয় যে, গোটা ভারতবর্ষের যুক্ত-স্বরাজ্য প্রতি প্রদেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত

হবে, এবং অন্য কোনও উপায়ে হবে না। অথচ বাংলার সকল নেতাই ঐ অদ্ভুত রায়ে সায় দিলেন ও সই দিলেন। এর পরেও লোকে বলে বাঙ্গালীর discipline এর জ্ঞান নেই। বাঙ্গালী নেতারা অপর প্রদেশের নেতাদের দ্বারা যত সহজে নীত হন, এমন আর কেউ হয় না। বাঙ্গালীর আশার কথা এই যে, তারা জাতি হিসাবে সহজে কারও দ্বারা নীত হয় না।

আমার বিশ্বাস আমার এ কথায় সকল বাঙ্গালীই সায় দেবেন যে, আমাদের ঘর আমরা নিজহাতে নীচে থেকেই গেঁথে তুল্‌তে চাই, উপর থেকে গেঁথে নামাতে চাই নে। আশা করি, আমাদের নেতারা এই সত্য মনে রাখবেন যে, যেখানে গোড়ায় মিল নেই, সেখানে গোঁজা মিলন দিয়ে কোনও লাভ নেই, শেষটা ভুগতেই হবে। নিজের ideal ভ্রষ্ট হলেই মানুষের সকল কার্য্য নষ্ট হয়, কেননা ideal-এর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার আত্মশক্তি হারায়।

(২)

আমি আগে এক সময় বলেছি যে, আমাদের স্বরাজ লাভের কথা শুধু ঘরের কথা নয়—বাইরেরও কথা, এবং তা যতটা না ঘরের কথা তার চাইতে ঢের বেশী বাইরের কথা। দেখা যাক্‌ এ কথাটা সত্য কি না।

যে স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী আজ লালায়িত সে স্বরাজ যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত হবে—এ কথা ত সর্ব্ববাদীসম্মত। এ ছাড়া অপর কোনরূপ স্বরাজের আমরা কল্পনাও

করতে পারি নে ; যদি কেউ পারেন, তাহলে তাঁর কল্পনাশক্তি কোনরূপ জ্ঞানের দ্বারা সংযত বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত নয়। যাঁর কাছে স্বরাজ্য ও স্বপ্নরাজ্য একই বস্তু তাঁর সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর করবে, এবং সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে। এক কথায়, পৃথিবী জুড়ে যে মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে—আমরা এই তিন চার বছর ধরে তারই একটি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক অভিনয় করে আসছি, এবং সেই নাটকের যবনিকা না পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অভিনয়ের সার্থকতা আমরা টের পাব না।

এই মহানাটকের শেষাঙ্ক এই দেশে অভিনীত হবারও শুনছি একটা সম্ভাবনা ঘটেছে। সুতরাং এ যুদ্ধের ভিতরকার কথাটা আবার তোলা যাক্।

গত চল্লিশ বৎসরের জর্ম্মাণ মতিগতির সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব লাভ করাই হচ্ছে Imperial Germany-র রাজনীতির উদ্দেশ্য, এবং তার রণনীতি হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। বর্ত্তমান জর্ম্মাণ দর্শন এই রাজনীতির উত্তরসাধক, এবং জর্ম্মাণ বিজ্ঞান এই রণনীতির ক্রীতদাস। এক কথায়, এ যুদ্ধ সকল জাতির ন্যাসনলিজিমের বিরুদ্ধে জর্ম্মাণ ইম্পিরিয়া-লিজমের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যদি জর্ম্মাণী জয়লাভ করে, তাহলে পৃথিবী হতে ন্যাসনলজিমের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাবে, এবং যে স্বরাজের দিকে আমরা দেশসুদ্ধ লোক হাত বাড়িয়েছি, এবং যা আশু আমাদের হাতে আসবার সম্ভাবনা আছে তা গন্ধর্ব্বপুরীর মত এক নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ কথা আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি

বলে,—আমার মতে আমাদের সকলকে সকলরকম দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ করে স্বদেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একমাত্র কামনার বলে স্বরাজ লাভ করা যায় না,—তার পিছনে থাকা চাই জাতির মহৎ কর্ম্মফল। আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্বর্গরাজ্যের ভোগের মেয়াদ—মানুষের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যের উপর নির্ভর করে। স্বরাজলাভ আর স্বদেশরক্ষা যে একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; তবে তার কোনটি সদর আর কোনটি মফঃস্বল, এই নিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি মতভেদ আছে। এর কোনটি আগে কোনটি পরে, এই নিয়ে আমাদের পলিটিকাল দলে এমন একটা তর্ক বেধেছে, যার ফলে ভ্রাতৃবিরোধ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুরুশিষ্যে মনান্তর প্রভৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল, এ সব ন্যায়ের তর্কে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না, এমন কথা আমি বলি নে। ওরও সময় আছে, কিন্তু আজকের দিন সে সময় নয়। কাল হয়ত আমাদের জাতীয় শক্তির পরিচয় দিতে হবে, এবং সে পরীক্ষার জন্য আজ আমাদের, অন্ততঃ মনে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

১লা মে ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙ্গালীর শিক্ষা।

——৹*৹——

(১)

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য সরকারী কমিশন বসিয়াছে। সাগরপার হইতে গুণী জ্ঞানী সভ্যেরা আসিয়া মন্ত্রণা সভায় বসিয়াছেন। লর্ডকর্জ্জনের তৈরী কাঠামের উপর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী, অনেকটা যাঁর নিজের হাতে গড়া, সাগরের এ পারের লোক হইলেও ঐ সভায় তাঁহাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবং দুই কোটী বাঙ্গালী মুসলমানের স্বার্থের হিসাবে কোন ভুলচুক না হয়, তাহার দৃষ্টির জন্য আলিগড় হইতে উচ্চ গণিতজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিত সভাসদ হইয়া আসিয়াছেন। আশা ও আশঙ্কায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে বাঙ্গালীর শিক্ষার দু' একটা মোটা সমস্যার আলোচনা করা যাক্।

কি প্রাচীন কি আধুনিক সমস্ত সভ্য সমাজেই শিক্ষা ব্যাপারটী লইয়া নানা রকম সমস্যা উঠিয়াছে। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, আর সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার সুব্যবস্থাই বা কি এ দুই বিষয়েই যথেষ্ট মত ভেদ আছে। এবং দুইটী রাশিই যদি অব্যবস্থিত হয়, তবে তাহাদের সমবায়ে কেমন জটিল বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা গণিতের সাহায্য ব্যতীতও সহজেই বোঝা যায়। আর এ বিষয়ে মতভেদও অতি

স্বাভাবিক; বরং মতের প্রকার ভেদ কিছু কম হইলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। একে তো শিক্ষা জিনিসটী, তা তার প্রণালী সে রকমই হোক, অনেকটাই অজানা মাটিতে বীজ ছড়াইয়া ফসলের আশায় বসিয়া থাকার মত। কোন জমিতে যে কেমন বীজে কোন ফল ফলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। যে পথে চলিয়া বৈদ্য চিকিৎসক হয় বসিয়া নিন্দুক লোকে রটায়, সেই ঠেকিয়া শেখার পথটা এখানে অনেকটা সঙ্কীর্ণ, কেননা এক জমিতে দুইবার বীজ বুনিবার উপায় নাই। এবং শিক্ষার তত্ত্ব ও শিষ্যের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর পুঁথি ও পাণ্ডিত্য থাকা স্বত্বেও, যে-মন লইয়া শিক্ষককে কাজ করিতে হয়, কোনও বৈজ্ঞানিক আচার্য্যের যন্ত্রের মধ্যে তাহা ধরা দেয় না। সমস্ত মনস্তত্ত্বই সাধারণ মনের তত্ত্ব, অর্থাৎ যে মন কল্পনায় আছে কিন্তু বস্তুগত্যা নাই। আর শিক্ষকের কারবার হইল বিশেষ মনকে লইয়া, যাহা এই নিয়মের জগতে প্রায় খাপছাড়া অনিয়ম, যাহার বিকাশ ও বিকারের রীতি দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় গুহাহিত ও দুর্জ্ঞেয়। সেই জন্য দেখা যায় অতি-অবৈজ্ঞানিক সেকেলে ধরণের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়াও মানুষের মন বিকশিত হইয়া ওঠে, আবার অত্যন্ত টাট্‌কা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ইহার 'সনাতন জড়তায়' ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কোনও প্রণালীরই ফলটা প্রবর্ত্তকের আশানুযায়ী বা নিন্দুকের ভবিষ্যৎ বাণীর অনুরূপ পুরাপুরি রকমে ফলে না। সুতরাং শিক্ষার প্রণালী লইয়া তর্কে কোনও পক্ষেরই একবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। কেননা ফলের কষ্টিপাথরে প্রণালীকে কষিয়া এমন কিছু দেখান যায় না, যাহাতে তার্কিককে নিরুত্তর করিতে পারা যায়।

(২)

তারপর শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে একটা নিত্য চিরস্থির অংশ হয়তো বা আছে। কিন্তু চিরকালই নানা নৈমিত্তিক লক্ষ্য, কখনও জীবন যুদ্ধের টাট্‌কা রক্তে রঙ্গিন হইয়া, কখনও বা কেবল অস্থিরতার চাঞ্চল্যেই মানুষের দৃষ্টিকে তাদের দিকেই টানিয়া রাখিয়াছে। কখনও সমাজ, কখনও রাষ্ট্র, কখনও ধন, কখনও শক্তি, কখনও বাক্‌পটুতা, কখনও বা কেবল জীবিকা, শিক্ষার একমাত্র অন্তত প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মানুষে প্রচার করিয়াছে। এবং ইহাদের কোনটিই মানুষের কাছে তাচ্ছিল্যের সামগ্রী না হওয়াতে সকলের দাবীই মানুষ উপস্থিতমত মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তর্কেও কোন পক্ষেরই একবারে অজয় পত্র লিখিয়া দিবার মত, পরাজিত হইবার আশঙ্কা নাই।

কিন্তু এ সকল তত্ত্ব ও তর্ক সব দেশের ও সব কালের সাধারণ সমস্যা, বাঙ্গলা-মাসিকের পণ্ডিতদিগের ভাষায় 'বিশ্ব সমস্যা'। পণ্ডিতগণের উপরেই ইহাদের নিরাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার দুই একটা বিশেষ সমস্যার আলোচনা শুরু করা যাউক্।

(৩)

বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজে হালে যে শিক্ষা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে একটা বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। সকল পক্ষই বলিতেছেন এ শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা নয়; যেমনটী হওয়া উচিত এ শিক্ষা তেমন শিক্ষা নয়। কিন্তু অসন্তোষ সাধারণ হইলেও অসন্তুষ্টির মূল এক

নয়। আর সেই ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতেই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী লইয়া নানা মতভেদের শাখা, কখনও পাতা কখনও কাঁটা মেলিতেছে।

এ দেশের শিক্ষা লইয়া যাহারা চিন্তা করেন এবং চিন্তা না করিলেও কথা বলেন তাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবল পক্ষ হইলেন দেশশাসক আমলাতন্ত্রের সভ্যেরা, এবং তাঁহাদেরি জ্ঞাতি কুটুম্ব ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দানের দরবারে, স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায়, নিজেদের ভোজের মজলিসে আমাদের শিক্ষার গলদ যে কোথায় তা বেশ স্পষ্ট কথাতেই ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন এই যে, বাঙ্গালীর ছেলেরা সেক্সপীয়র মিণ্টন পড়িতেছে, বার্ক মিল মুখস্থ করিতেছে, লিবিগ ফ্যারাডের তত্ত্ব ঘাঁটিতেছে, এসব একবারে নিরর্থক ও নিষ্ফল। এসব ছেলেরা ত স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া ওকালতি ডাক্তারির বাজারে ভিড় করিবে, না হয় মুন্‌সেফী ডিপুটীগিরির উমেদারীতে ফিরিবে, আর অধিকাংশই সরকারী ও সওদাগরী আফিসের কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইবে। ইহাদের জন্য এ শিক্ষা কেন? ধান কলাই যার লক্ষ্য সে কেন গোলাপের কেয়ারীতে পরিশ্রম করে? অর্থাৎ দেশব্যাপী ব্যবহার ও বাণিজ্যের যে কল চলিতেছে, তার চাকা গুলিকে স্বচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় চালাইয়া লইবার মত মজুর, মিস্ত্রী, বড় জোর ফোরম্যান মিকানিকের উপযোগী যে শিক্ষা, তাহাই হইল বাঙ্গালীর যথেষ্ট এবং যথার্থ শিক্ষা। ইহার জন্য 'ম্যাম্‌সন্ য়্যাগ্‌নিষ্টেশের' সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অনুশীলন প্রয়োজন হয় না; বড় সাহেবের মনঃপুত চল্‌তি ইংরেজিতে কাজের চিঠি মুশবিদা করিতে জানাটাই

বেশী দরকার। আর সেই পত্র রচনায় মিল্টনের ভাষা কোনও সাহায্য ত করেই না, বরং বিদেশীকে বিপথেই লইয়া যায়। সুতরাং আমাদের স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষা যেমন অনুপযোগী তেমনি ফাল্‌তো। আর শিক্ষার এই বাহুল্যটা যদি কেবল নিষ্ফলই হইত তবুও সে এক রকম ছিল। কিন্তু ইহার কিছু ফলও ফলে, এবং আশঙ্কার কথা এই যে ফলটা সমস্তই কুফল। পশ্চিমের সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শণ ইতিহাস মুখস্থ করিয়া পূব দেশের লোকদের মাথা ঠিক থাকে না। পশ্চিম যে পশ্চিম এবং পূব যে পূব এই সাধারণ জ্ঞানটাও লোপ হয়। এবং যে সকল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পশ্চিম দেশের জন্যই প্রচার করিয়াছেন এই অত্যন্ত পূব দেশেও এরা হাতে কলমে সে গুলির প্রয়োগ দেখিতে চায়। এই সকল তত্ত্ব কথায় 'মানুষ' শব্দের অর্থ যে পশ্চিম দেশীয় শ্বেত-বর্ণের মানুষ এ সহজ কথাটা ইহারা বুঝিতে পারে না। যতই কেন জিয়গ্রাফি মুখস্থ করুক না ল্যাটিচুড লঙ্গিচুডের জ্ঞানটা ইহাদের কিছুতেই পাকা হয় না। ফলে নিজেদের অবস্থায় ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এমন কি যে শাসকসম্প্রদায় এই দেড়শ বছর ধরিয়া নিশ্চল শান্তির মধ্যে পূর্ব্ব দেশের লোকদের পক্ষে যতটা সম্ভব ইহাদিগকে সেই উন্নতির পথে অতি সন্তর্পণে, সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের উপরেও ইহারা ক্ষণে ক্ষণে বিরাগের ভাব দেখায়; উন্নতির গতির মন্থরতায় অসহিষ্ণু হইয়া মনে করে ছাড়া পাইলে বুঝি আরও একটু দ্রুত চলিতে পারে। এবং শাসনের কলটা যে নিজেরা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া চালাইতেও বা প্যারে এমন কল্পনাও ইহাদের মনে আসিয়াছে। এমন কি কলটা এ রকম না

হইয়া অন্য রকম হইলেও একবারে অচল হয় না এমন কথাও ইহারা বলিতে সুরু করিয়াছে। এ সকলি যে বাহুল্য শিক্ষার বিস্তৃত ফল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

(৪)

দেশের লোক বলে, এবং বলিতে সাহস না করিলে মনে ভাবে, শিক্ষাটা যে কেবল বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়াই দিতে হইবে সেই বা কোন স্থিরসিদ্ধান্ত। বর্ত্তমানে আমরা ছোট কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। শিক্ষাটা সেই ঈপ্সিত ভবিষ্যতের অনুকূল করিয়াই আরম্ভ হোক না। আর জীবিকার জন্য যে টুকু দরকার শিক্ষার পরিমাণ যে, ঠিক সেই টুকুই হইবে এ ব্যবস্থা ত অপর কোন দেশে দেখা যায় না। আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজের দেশে যে শিক্ষা পাইয়া আসেন, প্রাচীন গ্রীস রোমের সাহিত্য ইতিহাসই ত তাহার প্রধান উপকরণ। এদেশে যে কাজে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইতেছে সে কাজে ঐ শিক্ষা কতটা সাহায্য করে এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। আফিসের বাহিরেও কেরাণী কেরাণীই থাকিবে এত বড় দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া ত সহজ নয়!

প্রজার সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীদের এ দেশের উপযোগী শিক্ষার আদর্শের এই প্রভেদ, ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার প্রথম সমস্যা; যাকে বলা যায় শিক্ষার রাজনৈতিক সমস্যা। রাজপুরুষেরা দেখেন আমাদের বর্ত্তমান, আমরা ভাবি আমাদের ভবিষ্যৎ। তাঁরা চান সেই শিক্ষা যেটা বর্ত্তমান শাসনরীতি ও অন্যান্য নীতির অনুকূল। আমরা

কামনা করি এমন শিক্ষা যেটা ভবিষ্যৎকেই আমাদের নিকটে আনে। তাঁদের দৃষ্টি এক দিকে, আমাদের চোখ অন্য দিকে।

(৫)

আমাদের রাজপুরুষেরা যে আমাদের ভবিষ্যৎটাকে একবারে অস্বীকার করেন এমন কথা বলি না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করিতে হয় যে তাঁদের অনেকে আমাদের যে একটা ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে, যেটা বর্ত্তমানের চেয়ে অন্য রকম, হয়ত মহত্তর এবং বৃহত্তর, এ কথা প্রকাশ্যেই বলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা বলেন সে ভবিষ্যৎ এতই সুদূর ভবিষ্যৎ যে তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও বুদ্ধিমান লোকই বর্ত্তমানের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যে ভবিষ্যৎ এখনও স্বপ্নলোকের কল্পনাতেই আছে, জাগ্রত লোকের বস্তু-জগতে তার স্থান নাই। অর্থাৎ যেটী পারমার্থিক ভাবে আছে, কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে নাই। সুতরাং তাকে কথায় স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাজে স্বীকার করা নির্বুদ্ধি ও অকেজো লোকের লক্ষণ।

শিক্ষার এই রাজনৈতিক সমস্যাটী অতি জটিল ও ব্যাপক। এবং এই ব্যাপক সমস্যা হইতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির ছোট, বড়, কঠিন, সুকঠিন নানা রকম সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং দিন দিন হইতেছে। ইহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের কথা বোঝেন না; আমরা তাঁদের কাজে আশঙ্কিত হইয়া উঠি। আমরা বলি আমাদের গরীব দেশ, শিক্ষাটা যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়সাধ্য করা হোক; তাঁরা ভাবেন সস্তা অর্থ যে খেলো ইহাদের সে জ্ঞান ত নাই। দেশে স্কুল কলেজ বাড়িতেছে, পড়ুয়া তার চেয়েও বাড়িতেছে;

আমরা উৎফুল্ল হইয়া ভাবি শিক্ষার বিস্তার হইতেছে; কর্ত্তৃপক্ষ শিহরিয়া বলেন এ সব ছেলে বাহির হইয়া করিবে কি, সরকারী ও সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি আর ত খালি নাই।

যা হোক এই রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার উপায় শিক্ষানীতির মধ্যে নাই। এ জটিলতার নিবৃত্তি শিক্ষাতত্ত্ববিদের এলাকার বাহিরে। দেশ বিদেশের পণ্ডিত একসঙ্গে করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। কেননা এ সমস্যার মীমাংসা হইবে শিক্ষানীতি ক্ষেত্রের বাহিরে, রাজনীতির ক্ষেত্রে। সুতরাং আর পুঁথি না বাড়াইয়া সমস্যান্তরে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

(৬)

আমাদের শিক্ষার দ্বিতীয় সমস্যা হইল অন্নসমস্যা। দেশের অনেকে প্রচলিত শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে, সে শিক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থানের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়া ছেলেরা যেকয়টা চাকরী ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত হইয়া বাহির হয় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য, এবং ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুপাতে সে সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে অন্নাভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং বর্ত্তমানেই তাহার মূর্ত্তিটা যেমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেশের শিক্ষা যদি শিক্ষিতের এই অন্ন-সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে না পারে তবে তাহা ব্যর্থ শিক্ষা, যাহার পরিবর্ত্তন না হইলে দেশের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গলা দেশের এই অন্নাভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমস্যা যে দিন দিন উৎকট হইয়া উঠিতেছে সেদিকে চক্ষু বুজিয়া কোনও লাভ নাই। এবং ইহার একটা ব্যবস্থা না হইলে যে জাতিরও মঙ্গল নাই তাহাও নিশ্চিত সত্য। ইংরেজ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার,—যাঁর একটা অভ্যাস ছিল সকলের জানা অত্যন্ত সাধারণ তথ্য হইতে গভীর তত্ত্ব কথার নিষ্কাশনের চেষ্টা করা,—তাঁর একখানি সুপরিচিত গ্রন্থের একটী অধ্যায়, তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, জীবের কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন ; সুতরাং যে বিধিব্যবস্থা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে তাহার দাবী, যে সকল বিধিব্যবস্থা, তাহাকে আর সব কাজের উপযুক্ত করে, তাহাদের চেয়ে প্রবল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্নাভাব মোচনের ব্যবস্থা যে আর না করিলেই নয় এ কথা সমর্থনের জন্য জীববিদ্যার এই আদিতত্ত্বে যাইবার প্রয়োজন হয় না। আজ বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর ঘরে ঘরে দারিদ্র্য যে কেমন করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতেছে, স্বাস্থ্যকে বিদায় দিতেছে, দেহ মনের সমস্ত স্ফুর্ত্তি ও আনন্দকে পিষিয়া মারিতেছে, মনুষ্যত্বকে পাহাড় প্রমাণ ভারের নীচে চাপা দিতেছে, তাহা দেখিলে স্বয়ং মোহ মুদ্গরের কবিও অনর্থের অর্থ যে কি তাহা, নিত্য না হোক অন্তত মাঝে মাঝে, ভাবিয়া দেখিবার উপদেশ দিতেন।

কিন্তু আমাদের অন্নসমস্যা এমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন। অন্নসংগ্রহকে জাতির সমস্ত চেষ্টা ও প্রতিভার কেবল প্রথম নয় প্রধান লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যার একটা উত্তর খুঁজিবার প্রলোভন স্বাভাবিক। কিন্তু রোগনাশের উৎসাহে

রোগীর প্রাণান্ত ঠিক চিকিৎসা নয়, যদিও সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবল সাফল্যে চিকিৎসিতের মৃত্যুসংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। বাঙ্গালীর এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কেবল অন্নে জীব বাঁচে কিন্তু জাতি বাঁচে না।

(৭)

অন্ন সংস্থানের নিক্তিতে ওজন করিয়া স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষাকে ঝুঁটা সাব্যস্তের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা প্রকৃত কথা এই যে ছাত্রের জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া এ শিক্ষার লক্ষ্যই নয় এবং হওয়া উচিত নয়। এ লক্ষ্য কি তাহা একবার 'সবুজপত্রে' আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির অধিকার নাই। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রকে শিক্ষিত করা। কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত অন্নে সকলেরই সমান প্রয়োজন। সুতরাং সমাজে ও রাষ্ট্রে শিক্ষিতেরও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা চাই। এই শিক্ষিত শ্রেণীই হইল সমাজের মধ্যমণি, সমাজ বৃক্ষের অমৃত ফল। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে জাতির বর্ত্তমান প্রাণ-হীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দেশের সমস্যা এই যে, শিক্ষিত শ্রেণীর অন্ন-সংগ্রহের পথ যথেষ্ট মুক্ত নাই। কেন নাই, সে আলোচনা নাই করিলাম। কিন্তু সমস্যা এ নয় যে, যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা শিষ্যের জীবিকা অর্জ্জনকেই লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইতেছে না।

প্রচলিত শিক্ষার যে সমালোচনার কথা বলিতেছি তার প্রধান কথা এই যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছেলেরা এমন শিক্ষা পাইতেছে না যাহাতে চাকুরী, ডাক্তারী, ওকালতির রুদ্ধপ্রায় সঙ্কীর্ণ গলিতে আর

ভীড় না করিয়া, শিল্প বাণিজ্যের প্রশস্ত রাজপথে অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইতে পারে। এই সমালোচনার মধ্যে যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সত্যের আড়ালে গোটা কয়েক বড় বড় মিথ্যা সব সময়েই উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তাহাদের তাড়াইতে না পারিলে এই সত্যের প্রকৃত চেহারাটী প্রকাশ হইবে না।

(৮)

প্রথম, বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিল্প বাণিজ্যের যে শিক্ষা দিবে তাহা তার সাধারণ সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্ত্তে নয়; ঐ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের জন্যই বিশেষ শিক্ষা। যাঁরা মনে করেন প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা হাতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করিলেই দেশের দারিদ্র্য সমস্যার মীমাংসা হইবে, তাঁদের সরল বিশ্বাসে অবশ্য মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের শিল্প বাণিজ্য বিষয়টী কি, তাহার অস্পষ্ট ধারণাও তাঁদের আছে কি না তাহাতেও সন্দেহ না করিয়া উপায় থাকে না। যে সব জাতি দেশের শিল্প বাণিজ্যকে দেশের উচ্চ শিক্ষা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র চালান যায় ভাবিয়াছিল, আজ পৃথিবীর শিল্প বাণিজ্যের দৌড়ে তারা যে দিন দিন পিছাইয়াই পড়িতেছে তাহা ত আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। দেশের উচ্চ শিক্ষাকে সংকীর্ণ করিয়া শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলার কল্পনা, আহার বন্ধ করিয়া কেবল কুস্তিতে শরীর গড়ার চেষ্টার মতই ভয়ানক।

(৯)

আচার্য্য হেলম্‌হোল্‌ৎস একবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করে, সে সত্য ঘরকন্নার কাজে লাগিবে কিনা সে চিন্তা তার নয়। আজ জার্ম্মাণিতে কি সুর বাজিতেছে জানিনা। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, জ্ঞানের এই নিষ্কাম সাধনা বন্ধ হইলে ক্রুপের কারখানাও বেশী দিন খোলা থাকিবে না। আর যে শিল্প বাণিজ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না দেশের উচ্চ শিক্ষিতকেও তাহাতেই রত করান, এই পৃথিবী জোড়া প্রতিযোগিতার যুগে, সমাজ নীতির কথা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র ধন বিজ্ঞানের চোখও যে কত বড় অপব্যয়; তাহাতে যে অন্নসমস্যার সমাধান না হইয়া কেবল জটিলতার বৃদ্ধিই হয়, তাহা অল্প চিন্তাতেও বোঝা যায়। শোনা যায় অবস্থা বিশেষে বাঘও নাকি ধান খায়। কিন্তু সেটা ব্যাঘ্র সমাজের সে খুব উৎসাহের কারণ তাহা প্রবাদও বলে না। মনু ব্রাহ্মণের যে বৈশ্য বৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আপদ্ধর্ম্ম আনন্দের কারণ নয়। বাঙ্গলাদেশের যে মুষ্টিমেয় লোক এখন উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছে তারও অর্দ্ধেককে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনা, দেশে শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় নয়। সে পথ হইল দেশের উচ্চ শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করিয়া, এ যুগের শিল্প বাণিজ্যের যে বিশেষ শিক্ষা, যাহা কেবল উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব, দেশে তাহার ব্যবস্থা করা।

(১০)

দ্বিতীয় কথা কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেলেদের পুঁথিগত এমন কি ল্যাবরাটারীতে পরীক্ষাগত শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই

বাঙ্গলাদেশ দেখিতে দেখিতে শিল্পশালায় ও বাণিজ্যাগারে ভরিয়া উঠিবে এমন দুরাশার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু সে শিক্ষাকে সফল করিবার উপায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে নাই। সে শিক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে দেশের লোকের, হয়ত বা দেশের রাজার উদ্যম বা নিশ্চেষ্টতার উপর। বাঙ্গলার অন্ন সমস্যার জন্য দায়ী তার প্রচলিত শিক্ষা নয়; এবং কেবল শিক্ষার বদল ঘটাইয়া সে সমস্যার পুরণও সম্ভব নয়। বেশ মনে আছে যখন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বি, এস্, সি' পড়াইবার প্রথম আয়োজন হয় তখন অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আর ভাবনা নাই। এই সব বিজ্ঞানে-কৃতবিদ্য ছেলেরা দেশে বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নাভাবের একটা কিনারা করিবে। আজ 'এম্, এস, সি; বি এল্' এ বাঙ্গলার সব উকীল লাইব্রেরী ভর্ত্তি হইয়া উঠিল! ছেলেরা বিজ্ঞান শিখিল বটে, কিন্তু সে শিক্ষাকে দেশের সমাজ ও দেশের রাষ্ট্র কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারিল না।

তারপর শেষ কথা কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কথা, তা এই। উচ্চ শিক্ষায় যার অধিকার আছে তাকে সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্র কাহারও নাই। এখানে উচ্চ শিক্ষিতের জীবিকা উপার্জ্জনের পথে বিঘ্নবাহুল্যের কথা তোলা নিষ্ফল, কেননা জীবিকার অধিকারের চেয়ে এ অধিকারের দাবী কিছু কম নয়। কাজেই সে পথের মাপে উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছামত প্রসার বা সংকোচ ঘটান চলে না। কথা এই, আর কোনও ফল বা নিষ্ফলতার প্রমাণে উচ্চ শিক্ষার বিচার হয় না; ঐ শিক্ষাই সে শিক্ষার চরম্ ফল। কেরাণীরও উচ্চশিক্ষা বিফল নয়, যদিও কেরাণীগিরিতে তা কাজে

লাগে না। কারখানার মালিকেরও সে শিক্ষা অনাবশ্যক নয়, যদিও তার অভাবে টাকা উপার্জ্জনের কোনো অসুবিধা হয় না। জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, এ শিক্ষার অধিকারী কত লোকের সে জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাফল্যের পরীক্ষা কত বেশী সংখ্যক অধিকারীর কাছে সে শিক্ষা সহজ লভ্য হয়। মানুষের জন্যই জীবিকা, জীবিকার জন্য মানুষ নয়। জীবিকার মাপে উচ্চ শিক্ষাকে কাটিয়া খাটো করার প্রস্তাব বিছানার মাপে শরীরকে ছাঁটার প্রস্তাবের মতই সুবুদ্ধির পরিচায়ক! তা যত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীই সে প্রস্তাব করুন না কেন, আর যত বড় পণ্ডিতই তার সমর্থন করুন না কেন।

(১১)

শিক্ষামন্দিরের বাহিরে আমাদের দেশে শিক্ষা লইয়া যে সব সমস্যা তার কতক কতক দেখা গেল। এইবার বহিরাঙ্গন পার হইয়া মন্দিরের ভিতরে আসা যাক্।

বর্ত্তমানের প্রচলিত শিক্ষাকে যখন কেবল শিক্ষার মাপেই ওজন করি, কেবল জ্ঞান, ভাব ও রুচির আলোতেই তাকে পরখ করি, তখনও দেখি এ শিক্ষায় আমরা কেহই সন্তুষ্ট নই; এবং এখানেও অসন্তোষের কারণ এক নয় ভিন্ন ভিন্ন।

দেশে একদল আছেন যাঁরা হালে চলতি শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে তাঁরা যখন স্কুল কলেজে পড়িতেন তখন শিক্ষাটা যে রকম পাকা হইত এখনকার ছেলেদের শিক্ষা সে রকম হইতেছে না। দুই শিক্ষার তফাত কোথায়, এবং বর্ত্তমানের শিক্ষা কোনখানে কাঁচা

তাহার অনুসন্ধান করিলে, কথার হেরফের বাদে যাহা বাহির হইয়া পড়ে তাহা এই ;—

পূর্ব্বকার দিনে ইংরেজি, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষাটা যেমন পাকা রকমের হইত এখনকার ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা তার কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। তখন শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শব্দ শিখিবার জন্য অভিধান মুখস্থ করিত, 'গ্রামার' 'ইডিয়ামে' নির্ভুল হইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিত, 'ষ্টাইল' দোরস্ত করিবার জন্য বেন্‌জন্‌সন হইতে স্যামুয়েল জন্‌সন্ পর্য্যন্ত কারো লেখাই কণ্ঠস্থ করিতে বাকী রাখিত না। আর ফলও ফলিত চেষ্টার অনুরূপ। এই সব কৃতবিদ্য লোকের মুখের ইংরেজি শুনিয়া বড় বড় সাহেবদেরও চমক লাগিত; নাম না দিয়া খবরের কাগজে লেখা বাহির করিলে বাঙ্গালীর লেখা না সাহেবের লেখা এ লইয়া তর্ক উঠিত। আর আজ দুই ছত্র নির্ভুল ইংরেজি লিখিতে বি এ পাশ ছেলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠে। শিক্ষার অবনতি আর বলে কাকে!

উঁচুদরের ইংরেজি শেখাই উচ্চশিক্ষা কি না এ প্রশ্ন তোলা অবশ্য নিরর্থক। কেননা সে সম্বন্ধে এঁদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই। তবে খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে এদের মধ্যে কেহ কেহ সংশয়ীদের একবারে নিরুত্তর করিবার জন্য এই শিক্ষার দুই একটা অবান্তর মাহাত্ম্যও কীর্ত্তণ করেন। তাঁরা বলেন আমাদের বর্ত্তমানে যা কিছু উন্নতি তার মূলই ত ঐ ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, এবং ঐ ভাষাই হইল বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ঐক্যসূত্র। কিন্তু ইহার পরেই কোন ইংরেজি ইতিহাস আগাগোড়া মুখস্থের উপর বক্তার বর্ত্তমান পাণ্ডিত্য খ্যাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এমনি গম্ভীরভাবে সে কথার সুরু হয়

যে আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির অর্থ তাঁদের মত পণ্ডিত লোকের আবির্ভাব না আর ও কিছু, এবং ভারতবর্ষের ঐক্য ইংরেজি 'ইডিয়ামের' ঠিক কতটা বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, অথবা কোনো কোনো বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণের মত হ্রস্বদীর্ঘের বিন্দুমাত্র গোল ঘটিলেই সর্ব্বনাশ, সে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আর সাহসই হয় না।

আমাদের দেশের ঠিক এই দলটিই বাঙ্গালীর স্কুল কলেজে বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা দিবার প্রস্তাবে একবারে চম্‌কিয়া উঠিয়াছেন। চম্‌কাই-বারই কথা! শিক্ষার অর্থই হইল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা; তাকেই যদি খর্ব্ব করা যায় তবে শিক্ষার আর বাকী থাকে কি? কেননা সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, দর্শণ বল, বিজ্ঞান বল, সবই হইল উপলক্ষ্য। যেমন কথাচ্ছলে নীতি শিক্ষা, এও তেমনি নানা ছলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা। নিতান্ত লক্ষীছাড়া ভিন্ন পথের মোহে বাড়ীর কথাটাই আর কার ভুল হয়! এঁদের মধ্যে যাঁরা কলেজের অধ্যাপক তাঁরা আরও কঠিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কুপারের কবিতার সৌন্দর্য্য, কি অ্যাডিশনের রসিকতার রস তাঁরা বাঙ্গলা ভাষায় ছেলেদের বুঝাইবেন কেমন করিয়া? সমস্যা গুরুতর। যে সব পুঁথিতে ঐ সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ ও রসিকতার ব্যাখ্যা আছে সেগুলিও যে ইংরেজি ভাষাতেই লেখা! আর এ কথাও ঠিক অনেক ইংরেজ লেখকের কবিত্ব ও রসিকতা আমরা ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করিতেছি, মাতৃভাষার শাদা চোখে দেখিলে যে ভক্তি নাও টিকিতে পারে। প্রমাণ, য়ুরোপ মহাদেশের লোকেরা, যাঁরা ভাষা শিখিবার উপায় স্বরূপে নহে, সাহিত্য হিসাবেই ইংরেজি সাহিত্য পড়েন তাঁরা হয়ত সে সব লেখকের নামও শোনেন নাই। এমন কি খোদ ইংলণ্ডেই

তাঁদের অনেকে অচল হইয়া উঠিলেন। আমাদের নিষ্ঠা কিন্তু অটল।

যাক্ এই পরিবর্ত্তনভীরু অতীতপন্থীদের কথা ছাড়িয়া দেই। এঁরা নিজেদের ইংরেজি জ্ঞানের যতই বড়াই করুন না কেন, গত শতাব্দীর প্রথমে যাঁরা এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন এঁরা তাঁদেরি বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সংস্করণ। সংস্কৃত পড়িলেই চিত্তে জড়তা আসে, আর ইংরেজি শিখিলেই মন স্বাধীন হয়। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠি বর্ষ বয়সে এ উপকথা বাঙ্গলা দেশের বালককেও বিশ্বাস করান কঠিন।

(১২)

বাঙ্গলা দেশের স্কুল কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙ্গালী যে আর, সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহার মূলে অতীত নয় ভবিষ্যৎ। আগেকার দিনের ইংরেজি শিক্ষার পাকা গাঁথনির সঙ্গে তুলনা হালের শিক্ষার উপর আমাদের বিরক্তির কারণ নয়। কারণ হইল বর্ত্তমান পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাব, কলার রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর শক্তি ও কৃতিত্বের যে একটী ছবি কতক অস্পষ্ট কতক স্পষ্ট হইয়া এ যুগের বাঙ্গালীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে শক্তির উদ্বোধনে ও কৃতিত্বের সহায়তায় দেশের প্রচলিত শিক্ষার সামর্থ্যের অভাব। বর্ত্তমানের উপর আমাদের সমস্ত বিরাগেরই মূল এইখানে। যা কিছু এই ভবিষ্যতের প্রতিকূল তা আমাদের অসহ্য। যাহা এর অনুকূল নয় তাহা আমাদের চোখে মূল্যহীন। বিশুদ্ধ ইংরেজির অনর্গল বক্তৃতায় বড় সাহেবের চমক লাগাইবার লোভ আমরা এক রকম

ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমরা ভাবিতেছি সেইদিনের কথা যেদিন বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালী কি ভাবে এবং লেখে তাহার খবর না রাখিলে বড় সাহেবের দেশের বড় পণ্ডিতেরও চলিবে না। বাহিরের লোকের কাণে এ কথা নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন গর্ব্বের মত শুনাইবে। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইহাই অন্তরের কথা এবং সেই কারণেই বাঙ্গালীর শিক্ষার প্রধান কথা।

(১৩)

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীল মোহরে যাঁরা advancement of learning 'জ্ঞানের প্রসার' ছাপ বসাইয়া ছিলেন advancement কথাটার কি অর্থ তাঁদের মনে ছিল বলা কঠিন। অবশ্য আমরা জানি বেকনের যে পুঁথির নাম হইতে কথাটি লওয়া, সে পুঁথির প্রতিপাদ্য হইল, কেমন করিয়া নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার হয়। কিন্তু এও জানি যে পশ্চিমের অনেক কথা পূব দেশে আসিলে অর্থের বদল হয়। সুতরাং অসম্ভব নয় যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীলমোহরে ঐ কথাটার আদি অভিপ্রেত অর্থ, জ্ঞানের 'প্রসার' নয় জ্ঞানের 'প্রচার'। জ্ঞানের সীমা বিস্তার নয়, পূর্ব্বদেশের অন্ধকারে পশ্চিমের আলোক বিস্তার। সে যাই হোক এ কথা নিশ্চয় যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা আরম্ভ হইল তাহার একমাত্র লক্ষ্য ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বার্ত্তা দেশের মধ্যে প্রচার করা; বাঙ্গালীকে এই নূতন সাহিত্য ও নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করা। এই জ্ঞান ও বিদ্যা পরের হাত হইতে লওয়াই যে চরম সার্থকতা নয়,

ইহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে ইহাকে বহন করিতে জানিতে হয়, ইহাকে সৃষ্টি করিতে না জানিলে যে ইহাকে আপনও করা যায় না এ কথা তখন বাঙ্গালীর মনে হয় নাই; মনে হইবার কথাও নয়। সে দিন ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে আসিয়াছিল দেবতার দানের মত। আমরা ভাবিয়াছিলাম ইহাকে স্বীকার করিয়া ঘরে তোলার নামই অমৃতত্বের অধিকার। এ যে স্বর্গের মন্দাকিনী নয় পাতালের ভোগবতী, ইহাকে যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, আর যে মাটি খুঁড়িতে না জানে ইহা যে তার কাছে অমৃত নয়, কেবলই তোলা জল, কখনও ঘোলা কখনও কিছু নির্ম্মল, সে কথা বুঝিবার তখনও সময় হয় নাই। তাই যে শিক্ষার লক্ষই হইল অন্যের আবিষ্কৃত জ্ঞান, অন্যের সৃষ্ট রস, অন্যের আহৃত বিদ্যা কেবলি নিশ্চেষ্ট ভাবে গ্রহণ করান, তাহাকেও আমরা পরম সমাদরে সমস্ত মন দিয়া বরণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে এ শিক্ষাতেও বাঙ্গালীর মন বেশী দিন নিশ্চেষ্ট থাকিল না। আমাদের মনের যে অংশটা পূর্ব্ব হইতেই সচল ছিল, সেই ভাষা ও সাহিত্যের দিক, এই নূতন শিক্ষা ও ভাবের স্পর্শে নব বসন্তের সাড়া দিল। নব-যুগের অভিনব ভাব প্রকাশের উপযোগী শক্তিশালী, সৌন্দর্য্যময় ভাষা আমরা গড়িয়া তুলিলাম। বাঙ্গলার নবীন সাহিত্য আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও পুষ্ট করিতে লাগিল। তবুও এই সাহিত্যকে পরীক্ষা করিলেই নূতন শিক্ষা প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ধরা পড়ে। দেখা যায় কাব্য ও রসসাহিত্যবাদে এ সাহিত্যের বেশীর ভাগই অনুবাদ ও সঙ্কলনের সাহিত্য। যে তৈরী ভাব ও চিন্তা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কাছে আসিয়াছে তাহাকেই বাঙ্গলা পোষাকে দেশের কাছে

দাঁড় করান মাত্র। আমাদের সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাও য়ুরোপীয় জ্ঞানে বিজ্ঞানের অতি সাধারণকথা ইংরেজি পুঁথি হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সে যুগই ছিল প্রচারের যুগ। বঙ্কিমের 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের' কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এই সব অতি সাধারণ কথার সংগ্রহও বাঙ্গালী সেদিন 'বিষ বৃক্ষের' লেখনীর অযোগ্য মনে করে নাই।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম যুগে যে অতি-মানুষ-বাঙ্গালী, প্রাচ্য সভ্যতার শিখরে দাঁড়াইয়া মোহহীন চক্ষুতে পশ্চিমের সভ্যতাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিজের জাতির সম্পর্কে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর তাঁর কোথায় লোভ ছিল তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে লর্ড আম্‌হার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে দুইটী কথা খুব সুস্পষ্ট। প্রথম বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখান নাই। দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁহার লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালীর বুদ্ধির ধারাকে এমন পথে প্রবাহিত করান যাতে জ্ঞানের ভূমি সরস ও উর্ব্বর হয়। দ্বিতীয়ত তিনি চাহিয়াছিলেন য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বৃক্ষটীকে শিকড়শুদ্ধ দেশের মাটিতে রোপণ করিতে ('planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe') যেখানে আমাদের মনের রসে ও রৌদ্রে, এ দেশেই সে গাছে নব কিশলয় দেখা দিবে, নূতন ফুলে ও নূতন ফলে মানুষের সভ্যতার শোভা ও সম্পদ বাড়াইবে। কিন্তু যে ইংরেজি শিক্ষা দেশে আরম্ভ হইল তাহা রামমোহনের ঈপ্সিত

শিক্ষা নয়। ইহার লক্ষ্য য়ুরোপের জ্ঞানের বৃক্ষ এদেশে রোপণ করা নয়; সেদেশ হইতে কিছু ফুল, ফল, পাতা আনিয়া এদেশের লোকের চোখের সম্মুখে ধরা। যাহাতে ঘর সাজান যায়, কিন্তু বাগান করা চলে না। আর সে ঘরের সজ্জাও নিত্য নূতন ধার করিয়া আনিতে হয়, কেননা জ্ঞানের তোলা ফুল পাতাও এক রাত্রিতেই বাসি হইয়া যায়।

(১৪)

এ পত্রের পর একশ বছর অতীত হইতে চলিল। আজ বাঙ্গালী অন্তরের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনুভব করিতেছি রাজা রামমোহন স্বজাতির মানসিক শক্তিতে যে বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন তাহা অত্যুক্তি নয়। আজ সাহিত্যে, চিন্তায়, বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর সৃষ্টির বিশ্ব মানবের সভ্যতার সভায় স্থান পাইতেছে, এবং আমরা বুঝিতেছি ইহা কেবল সাফল্যের সূচনা মাত্র। এই সামান্য সফলতার প্রারম্ভকে বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার শক্তি এ জাতির মধ্যে আছে। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন এ শক্তিকে পূর্ণ ভাবে জাগাইয়া তোলা। ইহাকে সংহত করিয়া সৃষ্টির পথে, মুক্তির দিকে ছাড়িয়া দেওয়া। ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার বিশেষ উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত কাজ।

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্যাও এই খানেই। আজ বাঙ্গালীর প্রয়োজন সেই শিক্ষায় যাতে জাতির বুদ্ধি ও প্রতিভা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। নিজের প্রাণে সেই প্রাণের স্পর্শ পায়, যার সঞ্জীবনী রস মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া নিত্য নূতন ফলপুষ্পে তার দেহকে মণ্ডিত করিতেছে।

কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চলিতেছে সেই প্রথম কালের প্রাচীন শিক্ষা, প্রাণের সঙ্গে যার কোনও সম্বন্ধ নাই, কাঠের মূর্ত্তি লইয়াই যার কারবার।

বাঙ্গালীর মনের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া জ্ঞানের রাজ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যার লক্ষ্য নয়, যার উদ্দেশ্য হইল বাঙ্গালীকে ঘরে বসাইয়া জ্ঞান রাজ্যের, ছাপা ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখা। আজ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাকশালায় অন্ন পাকের আগুনের প্রয়োজন, কিন্তু তার হাতে কেবল আছে টিনের কৌটার তৈরীখাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম।

স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলাই ভাল এখনকার দিনে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য রাজ্যার দেশ হইতে যে সব অধ্যাপকের আমদানী হইতেছে তাঁহারা এ যুগে বাঙ্গলা দেশে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দিবার অধিকারী নহেন। তাহার সহজ কারণ য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের যথার্থ যোগ নাই। কেন না য়ুরোপের চিন্তার রাজ্যে তাঁরা কেহ ভাবুক নহেন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কেহ কর্ম্মী নহেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার ফেরিওয়ালাকেও গুরুর আসনে বসাইয়া যে দিন আমরা ফল পাইয়াছি সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। দেশী বা বিদেশী আজ বাঙ্গালীর আচার্য্য হইবার কেবল তাঁরই অধিকার, চিন্তার রাজ্যে যিনি নূতন ভাবনা ভাবিতে পারেন, জ্ঞানের আকাশে নূতন আলো যাঁর চোখে পড়ে। এই আচার্য্যদের সাহায্যেই আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকে সফল ও সজীব করিবার একমাত্র উপায়। ইহার অভাবে বড় বাড়ী, ভাল আসবাব, এমন কি বহুমূল্য যন্ত্রপাতি সকলি বৃথা। আর এইটী ঘটিলে

সকল অভাবের মধ্যেও আমাদের শিক্ষারও প্রাণ ও শক্তিলাভে বিলম্ব ঘটিবে না।

নূতন সৃষ্টির বেদনার পুলকে বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে কলায়, সাহিত্যে বিজ্ঞানে নূতন রস, নূতন ভাব, নূতন জ্ঞানের দিকে তার চিত্ত উন্মুখ। এই নব জাগ্রত সৃষ্টিরশক্তিকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার যাহা সহায় সেই শিক্ষাই এ যুগে বাঙ্গালীর প্রকৃত শিক্ষা। পরের পণ্যে মহাজনী আমরা অনেক দিন করিলাম। এখন শিল্পশালার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কি শিল্প বাণিজ্যে, কি ভাবে চিন্তায় দোকানদারী করিয়া তৃপ্তির দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎকে আমরা বরণ করিয়াছি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। স্বল্পতুষ্টির প্রবল প্রলোভন হইতে মানবসভ্যতার বিধাতা বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

বিবাহের পণ।*

——ঃ※ঃ——

আজকাল মস্ত একটা সোরগোলের তর্কের বিষয় হচ্ছে, বিবাহের পণ। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শোনা যায় যে, সমাজে যতগুলি কুরীতি ও কুসংস্কার আছে সবগুলি মিলে আমাদের ততটা সর্ব্বনাশ করে না যতটা করে এই এক বিবাহের পণ। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, নভেলে, সব রকম সাহিত্যেই এ বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা চল্‌ছে; রঙ্গমঞ্চের মার্ফতেও লোকের মনটাকে সু-রাহায় আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে; আর যেই থেকে থেকে দুই একটী কুমারী পরিধেয় সাড়ীর সঙ্গে কেরোসিন তৈল এবং অগ্নির সংযোগ করে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হচ্ছেন, অম্নি এক একটা তুমুল হৈঃ চৈঃ উঠ্‌ছে এবং এমন কি সেই হিড়িকে দু' চারটী উৎসাহী যুবক কাগজে স্বাক্ষর ক'রে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হচ্ছেন যে তাঁরা বিবাহে পণ নেবেন না। কিন্তু এত লেখালেখির ফল যে কি হচ্ছে তা আমিও জানি, আর সব বাঙ্গালীরাও জানেন। বিবাহে পণ নেওয়া আমরা সকলেই বলি মন্দ কাজ, কিন্তু প্রতি-কারের চেষ্টাটা আমার মনে হয় যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মত।

---

* এ বিষয়ে গত কার্ত্তিকের "উপাসনা" পত্রিকায় একটি অতি জোরাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। প্রবন্ধের নাম, "একটি ভাববার কথা"। লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত। এত সাদা কথা এত সিধে ভাবে বলবার ক্ষমতা মাসিকপত্র লেখকদের মধ্যে নিত্য দেখা যায় না।

সম্পাদক।

বিবাহের সময় কেন যে পণের কথা ওঠে তা অনেকেই ভেবে দেখেন না, মনে করেন যে দেশের শিক্ষিত যুবকেরা একটু সৎসাহস প্রদর্শন ক'রে যেমন তেমন পাঁচপেঁচে রকমের মেয়েদের, শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা সুন্দরী কি কুৎসিতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না ক'রে, কেবল হাত পা আস্ত আছে এইটুকুমাত্র দেখে, বিবাহ কর্‌লেই এই উৎপাত থেকে দেশটা মুক্ত হবে। মেয়ের বাপেরা এবং অপুত্রকেরা বুঝতেই পারেন না যে, ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখে এত নীচপ্রবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে কেন, যে তাদের এবং তাদের বন্ধুবর্গের কুলে-শীলে উৎকৃষ্টা মেয়েদের বিবাহ কর্ত্তে ইতস্ততঃ করে। অনেকে আবার কল্পনার চক্ষে অতীতের সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে কেবল এই বলে আক্ষেপ করেন যে "আহা সেকালে আমাদের বাপ পিতামহের আমলে কোনই হাঙ্গামা ছিলনা, বিয়েতে জোর ৫১৲ পণ ছিল, তাও বরের কুলের উচ্চতা অনুসারে দেওয়া হত—আজকাল কুলের খোঁজে কাজ নাই, দাও কেবল টাকা আর টাকা।" অধিকন্তু কাগজে সহিকরা ছেলেদের কামড় আরও বিষাক্ত—তাঁরা পণ নেন না বটে কিন্তু এত বেশী খুঁতখুঁতে মন নিয়ে আসরে নামেন যে, হয় মেয়েদের ডানাকাটা পরী হতে হবে, তাতেও বোধ হয় কুলাবে না—কিম্বা তাদের অভি-ভাবকদের ঐশ্বর্য্যের বাতাসটা এ রকম বওয়া উচিত যে বর যেন কেবলমাত্র ঘ্রাণ দ্বারা অনুমান কর্ত্তে পারেন যে, এস্থলে দরকশাকশি না করেও, যা চাওয়া যেতে পারে তার অপেক্ষা বেশী পাবেন। অতএব সকলেরি ভাবা উচিত যে এ কু-প্রথা আমাদের দেশে কেন এল এবং এর প্রতিকারই বা কি।

সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ ; এমন কি সকল বিষয়ে আদর্শ-যুগ। সে যুগে

কোনও কষ্ট ছিল না, সুতরাং সে যুগের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্; কিন্তু এই যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এ প্রথার ততটা চল ছিল না তার কারণ কি? যতদূর আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ দুইটি—প্রথম খাদ্যদ্রব্যের প্রচুরতা, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ। সেকালে বিবাহের সময় স্বামীকে ভাব্‌তে হত না যে সে স্ত্রীপুত্রাদিকে খাওয়াবে কি করে, আর কন্যার পিতাকেও ভাব্‌তে হত না যে জামাতা যদি উপার্জ্জন না করেন তা হলে পুত্রা আর পৌত্রাদির খাওয়াবার কি ব্যবস্থা হবে। খাওয়া পরার অভাব না থাকায় সহজেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত হবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল; এবং বালকবালিকা-বিবাহ চলিত হওয়ার দরুণ বর অপেক্ষা বরের ঘরের খবরের আবশ্যকতা বেশী হ'ল এবং বরের বিদ্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্যটা বেশী লক্ষ্যের বিষয় হ'ল; জাতিকুল মাপ-কাটি হওয়াতে সমাজে বর কন্যার দর ছেলে মেয়ে হিসাবে সমান ছিল—বিবাহের বাজারে ছেলে ব'লে বরের বিশেষ একটা মূল্য ছিল না এবং কন্যার বিবাহ দিয়ে স্বচ্ছন্দে তাকে ও তার ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার সামর্থ্য থাকার জন্য, কন্যার পিতার নিকট কন্যার জন্ম পাপের ভোগ বলে মনে হত না। ছেলেবেলাতে ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়ে গেল, তারপর যার কপালে যে ছেলে যেমন কৃতী হল। কারও স্বামী বা মূর্খ হ'ল, কারও স্বামী বা পণ্ডিতাগ্রগণ্য হ'ল। কোনও কালে কোনও দেশের স্ত্রীপুরুষের সংখ্যায় যে বিশেষ বৈষম্য আছে তা মনে করা ভুল—হয়ত বিশেষ কারণবশতঃ সাময়িক কিছু প্রভেদ থাক্‌তে পারে কিন্তু অচিরেই তা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্ততঃ আমার মনে হয় না, যে বাংলাদেশে এই সব অসুবিধার হেতু, ছেলেমেয়ের সংখ্যার বৈষম্য। বহুবিবাহ যখন প্রচলিত ছিল তখন স্ত্রীলোকের

সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যা অপেক্ষা দশ বিশগুণ বেশী ছিল না, এবং আজকাল যে, পাত্রের এত অভাব তা census রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে যে এ মনে করা ভুল যে, পুরুষের সংখ্যা মেয়ের সংখ্যা অপেক্ষা কম। আজকাল যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই তার কারণ এ নয় যে বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের খুব উন্নতি হয়েছে, বরং তার কারণ এই যে অন্নসমস্যা এমন উৎকট হয়ে উঠেছে যে ছেলেদের কতকটা উপার্জ্জনের রাস্তায় এগিয়ে না দিয়ে বিবাহ দিতে বরের বাপও ইতস্ততঃ করেন এবং কন্যার পিতাও তেমন ছেলেকে সুপাত্র মনে করেন না। বাল্যবিবাহ ও জাতিকুলের কালে যতগুলি সুপাত্র ছিল ততগুলিই সুপাত্রী ছিল, সুতরাং বিবাহে কোনও গোল ছিল না। আজকাল পাত্রের সংখ্যার অল্পতা না থাক্‌লেও সুপাত্রের অত্যন্ত অভাব। আমাদের দেশের মেয়ের কোনও দাম বাড়ে নি, এমন কি বড়লোকের অশিক্ষিতা মেয়েও গরীবের শিক্ষিতা মেয়ের অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়া—অথচ পক্ষান্তরে কতকগুলি ছেলের, তাদের উপার্জ্জন ক্ষমতা অনুসারে বা উপাধির অল্পাধিক্য হিসাবে মূল্য বেড়েছে। সকল কন্যার পিতার ইচ্ছা যে এমন পাত্রে মেয়েকে দেন যে তা অন্ততঃ অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ না থাকে, কিন্তু দিনকাল দেখে এবং চাকুরী-ডাক্তারী ওকালতীগতপ্রাণ বাঙ্গালীদের অবস্থা দেখে তাঁরা কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপধারী ছেলেগুলিকেই সুপাত্র মনে করেন।

সব মেয়েরই বিবাহ দিতে হবে অথচ তাদের মধ্যে সমাজ এমন কোনও জিনিস দেখ্‌তে শেখেনি যাতে ক'রে একটী মেয়ে আর একটী মেয়ে অপেক্ষা বধূ হিসাবে অধিক বাঞ্ছনীয়া হয়। বেশী লেখাপড়া শেখা অনেক স্থলে দোষের মধ্যেই গণ্য হয়! রূপের অবশ্য একটু

দাম আছে কিন্তু তাও খুব বেশী নহে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিবাহযোগ্যা মেয়ে অনেক কিন্তু জামাতা কর্ত্তে পারা যায় এমন পাত্র কম। অতএব ঐ কয়টী সুপাত্রের জন্য মেয়ের বাপদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং তাঁরা নিজেরাই দাম বাড়িয়ে দেন। একজন উপাধিকারী পাত্রের সহিত যে কন্যার পিতা ৫০৲ মাহিনা পান তিনিও বিবাহ দিতে উৎসুক, যিনি ৫০০৲ পান তিনিও আগ্রহান্বিত আর যিনি হয়ত ৫০০০৲ রোজগার করেন তিনিও সুশিক্ষিত বলে তাকে জামাতারূপে পেতে ইচ্ছুক। ছেলে এ অবস্থায় নিলামে চড়ে; এবং এই তিন জনের ডাকাডাকিতে ছেলের দাম এত বেশী চড়ে যায় যে প্রথমোক্ত লোকের বসতবাটী বন্ধক পড়ে। একটু অনুধাবন করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, বরপণটা প্রত্যক্ষভাবে বরের বাপ স্পষ্টতঃ চাইলেও কন্যার পিতারাই জোর করে তাঁদিকে দেন। আমাদের দেশে যখন বিবাহ কোর্টশিপ করে হয় না, এবং যখন বরের পিতা বা অভিভাবক বধূ বাছাই করে থাকেন, আর মেয়েরা যখন সকলেই এক দরের, এমন অবস্থায় কোনও কারণ আছে কি, যে কন্যার পিতা যে টাকাটা জোর করে দিচ্ছেন তা কেন ফেলে দেওয়া হবে, বা বরের পিতা কেন একজন বড় কুটুম্ব কর্ব্বেন না? ব্যাপার এমন ত নয় যে ছেলের বিবাহ না দিয়ে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হচ্ছে, তবে তিনি নিজের মনোমত স্থানে বিবাহ দেবেন না কেন? এ অবস্থা যে-কোনও দেশের পক্ষে অতি দুর্ভাগ্যের অবস্থা বল্‌তে হবে যখন খাওয়াতে পার্ব্ব না মনে করে লোক বিবাহ করে না, এবং সন্তানাদি জন্মালে আরও কষ্ট বাড়বে মনে করে, লোকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাতে বাধা দেয়। কিন্তু প্রায় দেশই যখন

এইরূপ দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট এবং ভারতবর্ষও যখন তা হতে মুক্ত নয় তখন বিবাহও যে অর্থনীতি দ্বারা শাসিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি ? বিবাহের পর সন্তানাদি হলে তাদের কি খাওয়াব এবং তাদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যয় কোথা হ'তে আসবে এই সব ভেবে ছেলের বাপ আর ছেলের বিবাহ অল্প বয়সে দেন না। এই মনে করে যে, পাশকরা জামাতা অন্ততঃ করে খেতে পারবে, কন্যার পিতার পাত্র সন্ধান করতে করতে কন্যার বালিকা অবস্থা উত্তীর্ণ হয় এবং পিতাও বিবাহের পর একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হন। এর প্রতিকার কিন্তু হাহুতাশ নয়, সভা সমিতি বক্তৃতা নয়, এমন কি ছেলের কিম্বা ছেলের বাপের "পণ চাহিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাও নয়। শ্রীমতীরা আত্মহত্যা করে তাঁদের পিতাদের সম্পত্তি রক্ষা করেন বটে কিন্তু সামাজিক লাভ যে তাতে কতদূর হয় ঠিক বলা যায় না—প্রত্যুত আমার মনে হয় যে সাধারণ লোকেরা এই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাদের বাহবা দিয়ে এবং তাদের কার্য্যের অনুমোদন করে সমাজকে দুর্ব্বল করছেন এবং একটা নূতন প্রকারের সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করছেন। এরূপ স্থলে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে তবে উপায় কি ? যে কয়টী উপায় আমার নিকট সমীচীন মনে হয় তা এইখানে লিখছি।

১। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপের মূল্য কমানো। যতদিন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মার্কামারা লোকেরা অপরের অপেক্ষা সহজে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে ততদিন উপাধির দাম কন্যার পিতাকে নগদ গুণে দিতেই হবে। পাসের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমেচে বলে মনে হয়, এবং আজকাল অনেকে শুধু পাসকরার তুলনায় চাকুরে ছেলেকে বেশী পছন্দ করেন। আজকাল যে রকম চাকুরির বাজার তাতে পাসের দাম

ক্রমশঃ কম্‌বে। এর মূল্য দ্রুত কমাতে হ'লে উচ্চ শিক্ষার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক। আশুবাবুর আমলে যে বেশী ছেলে পাস হচ্ছিল তাতে দেশের অন্য কোনও উপকার হোক বা নাই হোক, শুধু পাস করা ছেলেই যে সুপাত্র এই ভুলধারনা অনেকটা দূর হচ্ছিল। যখন সকলে দেখ্‌বে যে অনেক পাস করা ছেলে উদরান্নের সংস্থানে অপারগ তখন লোকে উপার্জ্জনক্ষম ছেলেদেরই সুপাত্র মনে কর্‌বে—তা তারা যে কোনও সদুপায়েই উপার্জ্জন করুক না কেন। কতকগুলি লোক অবশ্য চিরকাল থাকবেন যাঁরা কেবল বিদ্যা দেখেই কন্যার বিবাহ দেবেন, কিন্তু সাধারণতঃ কন্যার পিতা এইটুকু দেখবেন যে এমন পাত্রে মেয়ে দিচ্ছেন যে তার অন্নবস্ত্রের কষ্ট না হয়।

২। প্রচুর সংখ্যায় উপার্জ্জনক্ষম সুপাত্রের সৃষ্টি এবং কেবলমাত্র কয়েকটী ব্যবসায়কে সম্মানের চক্ষে না দেখা। কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক ছেলেদের অবলম্বন কর্‌তে হবে, লোকেদের মন থেকে এ সব কার্য্যের হীনতা সম্বন্ধে যে ভুলধারণা আছে তাহা অপসৃত কর্‌তে হবে, এবং তাদের দেখাতে হবে যে এ সব কার্য্য যারা করে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেবলমাত্র পাসকরা ছেলে অপেক্ষা সহজে হয়। মোট কথা কন্যার পিতাদের জানতে হবে যে এ সব উপায়ে উপার্জ্জনক্ষম ছেলেরাও সুপাত্র।

৩। সুপাত্রীর সৃষ্টি। আজকাল মুড়ী মিছরির এক দর। কি রকমের শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া উচিত তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যে কোনও শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হ'ক না কেন মেয়েদের সুশিক্ষিতা করা উচিত এবং সাধারণকেও এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যে ঐ সুশিক্ষিতা পাত্রীগুলি অপেক্ষাকৃত সুপাত্রী, অতএব

অধিকতর বাঞ্ছনীয়া। ছেলেদেরও পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তারা যেন এ জ্ঞান লাভ করে যে জীবন কৃতার্থ কর্ত্তে হ'লে ঐ শিক্ষিতা সুপাত্রীই লাভ কর্ত্তে হবে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হ'লে বিবাহের আগ্রহটা উভয় পক্ষের হবে এবং পাত্রের মূল্য নিয়ে যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হবে। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন যে এক সুপাত্রেই রক্ষা নেই, আবার সুপাত্রী সৃষ্টি আর সুপাত্রীর জ্ঞান—এতে মেয়ের কেনা বেচা আরম্ভ হয়ে কুরীতিটা আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তা নয়, একটু ভেবে দেখলেই সকলে দেখ্‌তে পাবেন যে মেয়ের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দাম কম্‌বে।

আগ্রা ১৩ই মার্চ্চ ১৯১৮

শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী।

নবীন সাহিত্যিক।

—:০:—

"বয়সে বালক বচনে নয়
সে ছেলেকে মন্দ সকলে কয়"

সাহিত্যের আসরে ঠিক এ কথাটী না হলেও মাঝে মাঝে এবম্বিধ মন্তব্য শোনা গিয়ে থাকে। এবং পূর্ব্বপক্ষ এ মন্তব্যের নিরাসকল্পে বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনেকানেক সাহিত্যিকের নজির এনে হাজির কর্‌লেও সমালোচকের মন তাতে ভেজে না! বরং উল্টো বিপত্তিই দাঁড়ায়! কারণ, তত্তৎ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সব লেখক নাকি এক এক জন "অবতার" কাজেই তাঁদের পক্ষে যা "লীলাখেলা", সাধারণ সাহিত্যিকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই দূষণীয়।

আমার মন কিন্তু এতে সায় দেয় না। সামাজিক সার্থকতা ওর যাই আর যতই থাক্ না, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস উক্ত শ্লোকাংশ নিতান্ত নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয়। বচন-বিন্যাসমাত্রকে সাহিত্য সৃজন, আর সাহিত্যকে সর্ব্বথা সামাজিক পদার্থ বলে ধরে নেওয়াতেই আমাদের ওরূপ ভুল হয়ে থাকে। সাহিত্য যদি স্থান, কাল এবং সমাজকে অতিক্রম করে' সুদূরকে সন্নিহিত করবার, অজানাকে প্রকাশ করবার, অবহেলিতকে অনুরঞ্জিত করবার সঙ্কেত না জান্ত; মানুষের ভবিষ্যতের আশার নীহারিকাকে যদি আকার দিতে না

পারত, শতেক পাকে তা যদি বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতার বজ্র-আঁটুনীতেই বাঁধা পড়ে থাক্‌ত—তবে তার যে বিশেষ আদর হতো সমাজে, এমন ত আমার বোধ হয় না! কারণ, ওরূপ বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের ত্রিবিদ্যা ত জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে ঘরে ঘরে কাগজে কলমে না হোক কায়মনোবাক্যে আবালবৃদ্ধবণিতা আমরা সবাই সাধন করে আস্‌ছি।

অভিজ্ঞতা সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সন্দেহ নেই;—কিন্তু অনুভূতিই হয়েছে সাহিত্যের প্রাণ। বেদমন্ত্রে যতক্ষণ না মৃৎ-প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, ততক্ষণ তা যেমন নিতান্ত জড়সমষ্টিমাত্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্য-সৃজন-প্রয়াসও তেমনি কথার কথা। অস্থি-সমাবেশপরিশূন্য জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়; কিন্তু চেতনালেশ-পরিহীন প্রাণীর কল্পনাও অসঙ্গত।

অধিকাংশ স্থলে সাহিত্যের সমালোচনার ছলে আমরা অভিজ্ঞতার মাপকাটীতে তার জড়-দেহটারই জরীপ করে থাকি; তারি ফলে, নির্ভুল সমালোচনাও অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে।

অনুভূতি পদার্থটী আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার সাথে কোনো আপেক্ষিক অনুপাত রক্ষা করে চলে না। তা' যদি চল্‌ত', তা' হ'লে সামাজিক উপন্যাস কেবল সমাজপতি মহাশয়দের হাত থেকে বেরুত; অবিনাশ বাবুও হয়ত "বার্ষিক উপন্যাস" লিখ্‌তেন না; আর, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন "রায় আর "রিপোর্ট" লিখেই কেটে যেত—অন্ততঃ রাণাপ্রতাপ, মেবার পতন, দুর্গাদাসের মত নাট্যসাহিত্য তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতো না!

সাহিত্য বৈষয়িক-অভিজ্ঞতা-গত-প্রাণ নয় বলেই এ ক্ষেত্রে বয়সের বিচার নেই। "নবীন-সাহিত্যিক", "প্রবীন-সাহিত্যিক" আদি করে'

কথাগুলো নিতান্তই নিরর্থক। সাহিত্যে দাদা মশাই-এর লম্বাই চৌড়াই ও যেমন নিষিদ্ধ, খোকা বাবুর চাঁদ ধরাবার আব্দারও তেম্নি অচল। "অমৃতং বালভাষিতং" সাহিত্য-বিচারে এ কথা খাটে না। কারণ সাহিত্য ত "ভাষিত" হয় না। আর, "শতংবদ, একং মালিখ" এ যুগ্ম অনুজ্ঞার যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে আশা করি সবাই নিঃসন্দেহ!

সত্য এবং সতেজ অনুভূতির দ্বারা উদ্দীপ্ত না হ'লে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি কখনো স্বাভাবিক বা হৃদয়-গ্রাহী হতে পারে না! পঞ্চাশোর্দ্ধে তৃতীয় পক্ষে ষোড়ষীর পাণিপীড়ণ করে' অলঙ্কারের শিঞ্জিনীতে প্রীতির অভিনন্দনের অভাব দূর করবার প্রয়াস যেমন নিতান্তই পণ্ডশ্রম, অনুভূতির পরশ মনির অভাবে অভিজ্ঞতার ইঁট পাট্‌কেল দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির আশাও ঠিক তেম্নি বিড়ম্বনা। এ বিড়ম্বনার অবতারণা যাঁরা করেন পাঠক-সাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের নয়। এবং উক্ত আনাড়ি সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ "আক্কেল দেবার" অভিপ্রায়েই সাহিত্য সৃষ্টির নামে তাঁরা নিত্য নূতন "সাহিত্য-পাঠ" রচনা করে থাকেন। পরের অজ্ঞতাকে অবশ্য স্বীকার্য্য, আর নিজের বুদ্ধিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে' নিয়েই তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্র-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, তাঁদের অনায়ত দৃষ্টির সম্মুখে সাহিত্যের প্রসার স্বতঃই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।

"শিক্ষা" জিনিসটা অত্যন্ত দরকারী—তাতে আর সন্দেহ কি? দেশ যাতে সুশিক্ষিত হয়; দেশের লোকের মতি-গতি রীতি-নীতি যাতে বিপথগামী না হ'তে পারে; দেশের স্ত্রীপুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই যাতে স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য পালনে উন্মুখ হয়ে ওঠে; এককথায়, দেশের যেখানে যেমনটী হওয়া উচিত সেখানে ঠিক তেমনটী যাতে

গড়ে ওঠে, আর যেখানে যা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার, সেখান থেকে তা উঠে যায় যাতে, এমন-তর শিক্ষার সূত্রপাত এবং অনুষ্ঠান যে, দেশের মনিষিগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত—এ কথা সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু মানুষের অভাব এত বহুবিধ, প্রতিভা এত বহুমুখী আর প্রকৃতি এতই বিচিত্র যে দেশের সমুদয় সাহিত্য প্রচেষ্টাই যে সেই একই সাধারণ সূত্রের অনুবর্ত্তী হবে—এমন আশা করাও সমীচীন হবে না।

সাহিত্য আর সমাজে ত' গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নয়। সাহিত্য রসিকের সাথে সমপ্রাণতা স্থাপনাই হয়েছে সাহিত্যিকের চিরদিনের লক্ষ্য। নিবিড় আলিঙ্গনে পাঠকের প্রাণে প্রাণে অনুভূতির আনন্দ এবং সমবেদনার আবেগ ছড়িয়ে দেওয়াই ত' সাহিত্যিকের কাজ! যে নব চেতনার উৎস সাহিত্যিকের প্রাণে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে, ভাষার সহায়তায় তাকে দিকে দিকে দেশে দেশে প্রেরণই হয়েছে সাহিত্যিকের সাধনা। যে ভাবনায় সাহিত্যিক বিভোর তা অপরের পক্ষে অভাবনীয় নয়, অচিন্ত্যও নয়; এমন কি অনেকের কাছে অননুভূত পূর্ব্বও না হ'তে পারে!—এই ভরসাই ত সাহিত্যিককে মুখর করে তোলে! নিজের অনুভূতিকে পরের কাছে যাচাই করবারও যে একটা আগ্রহ আছে! সেই আগ্রহের ঐকান্তিকতাতেই ত' সাহিত্য-সাধকের মানস-মুর্ত্তি তার লেখার ভিতরে বিকশিত হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে গুরু নয়, উপদেষ্টা নয়—সখা! লেখক আর পাঠক উভয়েই সেখানে সাহিত্য-সেবী। লেখক আর পাঠকের এই যে ঐক্যবিধান এইখানেই সাহিত্যের সার্থকতা! সাহিত্য থেকে যদি কখনো সমাজের কোন "উপকার" হয় তা' হলে তা' এই পথেই আসবে! তার

অগ্রদূত হবে—আর আগমনী গাইবে তারাই যারা চির-নবীন চির-কিশোর। আর যারা এর ঘাঁটি আগ্‌লে রাখ্‌বে—হোক না তারা প্রবীণ হোক না তারা বিজ্ঞ—কিন্তু সাহিত্যক তারা আদৌ নয়।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

পত্র।

—:০:—

শ্রীমান চিরকিশোর—

কল্যাণীয়েষু।

একটা খবরের মত খবর দিয়ে এ চিঠিটে সুরু করতে পারছি নে, কেননা দেশ বিদেশের সংবাদ পত্র ঘেঁটে এমন কোনও সংবাদ খুঁজে পেলুম না, যাতে করে মানুষের পিলে চমকে দেওয়া যায়। তারপর জনরবের কলরবও অনেকটা নীরব হয়ে এসেছে। গেলবার তোমাকে যখন চিঠি লিখি, তখন একটি বিজুলি-বার্ত্তার ধাক্কায়, দেশের সুস্থ শরীর অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল; এবং সে ব্যস্ততার ছোঁয়াচ যে আমার গায়েও লেগেছিল, তার পরিচয় ত ঐ পত্রেই পেয়েছ। সুস্থ শরীরে কে আর টনিকের খোঁজে ফেরে?

কিন্তু শুনে সুখী হবে যে, নব ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী, এই কলিকাতা-মহানগরীতে আমরা সবাই আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি। এ সহরে একটা হুজুগ নিয়ে লোকে বেশী দিন কাটাতে পারে না, আমাদের নিত্য নতুন গুজব চাই। আপাততঃ নতুন গুজবের অভাবে, আমরা সকলে সুবোধছেলের মত নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করেছি। রাজনীতিকেরা মন দিয়েছেন অর্থসংগ্রহে আর আমরা সাহিত্যিকেরা, বাক্য সংগ্রহে। এর কারণ ভারতবর্ষের বায়ুকোণে

যে ঝড়ো-মেঘ দেখা দিয়েছিল, তা এক নিমেষে কেটে গেছে। এ মেঘ যে কেটে যাবে, তা আমাদের বোঝা উচিত ছিল, কেননা "মানুষ আমরা নহিত মেষ"। আমরা যে তা বুঝিনি তার কারণ আমরা কবির কথাকে গানের দরবারে আদর করি—প্রাণের কারবারে আমল দিই নে।

সে যাই হোক্ এখন জানা যাচ্ছে যে, এ দেশের উপর জর্ম্মাণ বাটপাড়ির কথাটা হচ্ছে একেবারে উদ্ভট। কিম্বদন্তির ভিতর যতটুকু ইতিহাস থাকে ওগুজবের ভিতর তার বেশী আর কিছু নেই। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের এই নীল আকাশে ঐ লাল মেঘের ইন্দ্রজাল রচনা করবার কি দরকার ছিল। ঘরপোড়া-গরু সিঁদুরেমেঘ দেখলে যে ভয় পায়—এ প্রবাদ কি ইংরেজিতে নেই? তবে লাভের মধ্যে এই যে, এই ধাক্কায় আমাদের মনটা একটা বড় রকম ঝাঁকুনি খেয়েছে এবং আশা করি সেই সঙ্গে কতকটা সচেতনও হয়েছে।

অতঃপর শুন্ছি এ যুদ্ধের হয় এস্পার নয় ওস্পার ভারতবর্ষের বায়ুকোণে নয়—ফ্রান্সের ঈশানকোণেই হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী খুব সম্ভবতঃ খাটবে। ইউরোপের অনেক বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহের যাহয় একটা হেস্তনেস্ত ইতিপূর্ব্বে বহুবার ঐ কোণেই হয়ে গেছে। এযুদ্ধ এতটা অপূর্ব্ব যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধের নজির, অনেকের মতে এক্ষেত্রে খাটবে না। বিশেষতঃ এই যখন পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। এযুদ্ধের আকার যে বিপুল, তা ত সকলেই জানে এবং অনেকে বলে এর উদ্দেশ্যও অতুল। এ লড়াই মাটির উপরে হলেও মাটির জন্য নয়। স্থুলদৃষ্টিতে এ ব্যাপার দেহের সঙ্গে দেহের সংঘর্ষ বলে বোধ হলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে এ হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার লড়াই।

আত্মার জয় যে দেহের জয়ের উপর নির্ভর করে এ সংস্কার অবশ্য আমাদের নেই। আমাদের ধারণা দেহের পরাজয়েই আত্মার জয়। কিন্তু জর্ম্মাণরা উল্টো বোঝে। এই দেহাত্মবাদীদের মতে বাহুবলই আত্মবল। তাই তোপের মুখ দিয়ে তারা তাদের culture প্রচার করতে চায়। এ দেশের আর্য্য-সমাজের আমিষের দল নিজেদের বলেন, culture party কিন্তু নিরামিষের দল তাঁদের বলেন vulture party। ইউরোপের আর্য্য-সমাজেও জর্ম্মাণরা হচ্ছে নিজেদের মতে culture-এর দল, এবং অপরের মতে vulture-এর দল। জর্ম্মাণ-ইগল যে মহা-শকুন, এ দম্ভ জর্ম্মাণরাও করে থাকেন। অতএব এ যুদ্ধ যে, জর্ম্মাণীর culture ওরফে vulture-এর বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের আত্মরক্ষার যুদ্ধ, এ কথা মেনে নিতে কোনই আপত্তি নেই। তবে এ যুদ্ধ মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই যে মানুষের শেষ যুদ্ধ—এরূপ অনুমান করবার কোনও কারণ নেই। এ যুদ্ধের ফলে যদি বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সত্ত্বসাব্যস্ত হয়ে যায়, তারপর আর একটা যুদ্ধ হবে, বিশ্বমানবের সাম্যের সত্ত্বসাব্যস্তের জন্য—তারপর আর একটা যুদ্ধ হবে বিশ্বমানবের মৈত্রির জন্য। সেইটে হবে শেষ যুদ্ধ, কেননা তারপর পৃথিবীতে যুদ্ধ করবার আর কোনও লোক থাকবে না। এবং সেই সুযোগে বুদ্ধদেবের শেষ অবতার ভগবান মৈত্রেয় ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। থিওজফিষ্টরা যে ঘোষণা করছেন যে, তিনি ইতিমধ্যে দক্ষিণ-মথুরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে এখন গোকুলে বাড়ছেন—সে সুসমাচার মোটেই বিশ্বাস্য নয়।

তুমি ভাবছ যে আমি নেহাৎ বাজে বকছি। অবশ্য তাই করছি। এ যুদ্ধের নাম মুখে আনবা মাত্র, মানুষে যে বেজায় বাজে বকতে আরম্ভ

করে, তার এক লাইব্রেরী প্রমাণ আমি যেখানে বলো, সেই সাহিত্যের আদালতে দাখিল করে দিতে পারি। তার দেদার দলিল আমার ঘরেই মজুত আছে। যদি জিজ্ঞাসা করো, এই সব বাজে বকুনি পয়সা খরচ করে সংগ্রহ করবার প্রয়োজন কি? বল্‌ছি। ইতিহাস মাত্রেই যে উপন্যাস এবং উপন্যাস মাত্রেই যে ইতিহাস এ আমার চিরকেলে বিশ্বাস। এবং এ বিশ্বাসের অন্ততঃ প্রথম পদটা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, আমাদের চোখের সুমুখে, দিনের পর দিন, ইতিহাস যে কি পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে তারি প্রমাণ জড় করছি। এত খেলাপ এজাহার মানুষে বোধ হয় আদালতেও দেয় না। তবে বৈজ্ঞানিক-ইতিহাস যে কাঁঠালের আমসত্ত সে জ্ঞান এক বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর সকলেরই আছে। এতেই বাঁচাও। জর্ম্মাণ দেশে Treitsche যে এত লোকমান্য এবং তাঁর ইতিহাস যে এত লোকপ্রিয়, তার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন জন্মকালা। কারও কথা তাঁর কাণে ঢোকে নি বলে তাঁর কথা জর্ম্মাণির সকলের কাণে ঢুকেছে। শুধু ঢোকে নি, কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে, আকুল করে জর্ম্মাণের প্রাণ। তিনি যদি fact-এর বড় একটা ধার ধার্‌তেন তাহলে কি তিনি অমন ইতিহাস রচনা কর্‌তে পার্‌তেন?

দেখ্‌তে পাচ্ছ এক কথা থেকে আর এক কথায় গিয়ে পড়্‌লুম। চিঠি লেখার দোষই এই যে, তা লিখ্‌তে লিখ্‌তে লেখার খেঁই হারিয়ে যায়। আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলুম সে হচ্ছে এই যে, এযুদ্ধ যে ক্ষেত্রেই পঞ্চত্ব পাক্, অতীতে ইউরোপের অনেক যুদ্ধেরই ঐ ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর সীমান্ত প্রদেশেই গোর হয়েছে। সেকালের যুদ্ধ জমির জন্য করা হত বলে' সেকালের ইতিহাস জিওগ্রাফীর উপরেই গড়ে

উঠেছে। অন্তুতঃ পোনেরো'শ বছর ধরে ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর ঐ মধ্যদেশ নিয়ে কত জাতি যে কত লড়াই করেছে তার আর লেখাজোখা নেই। ঐ প্রদেশ মানুষের এত রক্ত পান করেছে যে ওদেশে যে আঙ্গুর ফলে তার মদের রং আজও লাল; আর সে মদ উদরস্থ কর্‌লেই মানুষের মাথায় খুন চড়ে যায়। ইউরোপের মধ্যযুগে এই মধ্যদেশে জাতিতে জাতিতে যে কি রক্তারক্তি করেছে তার বিপর্য্যয় কাহিনী মধ্যযুগের যে কোন ইতিহাসে দেখ্‌তে পাবে। সে বিবরণ এত কুটিল আর এত জটিল যে তাকে সরল করবার ক্ষমতা আমার নেই। যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে এই কোস্তাকুস্তির কারণ কি? ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর বিচ্ছেদের একটি সরল রেখা বার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ তারা কাগজে কলমে নয় ঢাল তলোয়ারে, যার সমাধান করবার এ যাবৎ বৃথা চেষ্টা করেছে, সে হচ্ছে একটি জ্যামিতির সমস্যা। এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে সংসারের কোন সমস্যার সরল মীমাংসা করবার চেষ্টা থেকেই যত মারাত্মক জটিলতার উদ্ভব হয়। আর মানুষ যে সরল পথ খোঁজে তার জন্য দায়ী তিনি, যিনি মানুষকে সরল রেখার সন্ধান দিয়েছেন, অর্থাৎ ইউক্লিড।

ভাল কথা ইউক্লিডের নাম করতেই মনে পড়ে গেল যে, ইউক্লিডের রচনার রূপ নেই একথা বলায়, আমার জনৈক অতি নিরীহ বন্ধু মহা রাগান্বিত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন যে, যে-রূপের ভিতর কাম-গন্ধের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই, সে রূপের সাক্ষাৎ একমাত্র জ্যামিতির ভিতরেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য আমার বন্ধুটি হচ্ছেন একজন পাকা জ্যামিতিক। "জ্যামিতিক" শব্দটি কলাপের ব্যাকরণে সুসিদ্ধ হয় কি না জানি নে, কিন্তু আলাপের ব্যাকরণে তা প্রসিদ্ধ হয়েছে।

অতএব ওশব্দটি প্রবন্ধে না চল্লেও, পত্রে চলে। অন্ততঃ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, জ্যামিতিক শব্দ বাংলাভাষায় না থাক্‌লেও জ্যামিতিক লোক বাংলাদেশে ঢের আছে, এমন কি শিশুদের মধ্যেও ওদলের অভাব নেই। ত্রিশমাস বয়েসের আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র, এই মিনিট খানেক আগে, আমার সোণার ঘড়িটি নিয়ে মেজের উপরে ঘড়ি পেতে, বৃত্তকে চতুষ্কোন করবার চেষ্টা করছিল; আমি বাধা না দিলে, সে সমস্যার সে যে অতি সহজেই সমাধান কর্‌ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া থেকে তাকে নিরস্ত করায় সে যে কেঁদে পাড়া মাথায় কর্‌ছে তাতেও তার দোষ দেওয়া যায় না। ছোট ছেলেদের স্বভাবই এই যে তাদের কোনও স্বভাব নেই। তারা বড়দের যা কর্‌তে দেখে তাই কর্‌তে শেখে। আমরা যখন ভারতবর্ষের যেখানে যা কিছু গোল আছে তাকে চৌকোষ কর্‌তে উদ্যত হই, আর আমাদের গুরুজনেরা সে কার্য্যে বাধা দেন, তখন আমরা কান্না ছাড়া আর কি করি।

আমার জ্যামিতিক বন্ধুকে আমি এই কারণে মান্য করি যে তিনি, কোন কিছুরই আকার বদলাতে চান না। আকারের উপরে তাঁর ভক্তি এত নৈসর্গিক যে তিনি মনে করেন যে, দ্রব্যের গুণ তার আকারের উপরেই নির্ভর করে। রসগোল্লার সঙ্গে জিবে-গজার স্বাদের পার্থক্যের একমাত্র কারণ যে, প্রথমটির আকার জ্যামিতির এবং দ্বিতীয়টির Conic-section-এর অন্তর্ভূর্ত, তাঁর একথা অবশ্য আমি মানিনে। কিন্তু একথা আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে তিনি এক বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে বিজ্ঞান নয়,—আর্ট, এ জ্ঞান আমি তাঁর প্রসাদে লাভ করেছি। এ

কথা শুনে লোকে চাই কি হাসতেও পারে, অতএব দেখা যাক্ এর স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে।

আমরা সকলেই জানি, আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু যা প্রকৃতির হাতে নেই এবং যা মানুষে নিজের মন ও নিজের হাত, এ দুয়ের সহযোগে গড়ে তোলে। ইউক্লিড যা সব নিয়ে কারবার করেন তার কোন মূর্ত্তিই প্রকৃতির রাজ্যে কুত্রাপি কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে সরল রেখা হচ্ছে তাঁর শাস্ত্রের অর্দ্ধেক সম্বল, সে রেখা—এ বিশ্বে কোথায়ও নেই; আর এ পৃথিবীতে যেখানে ওরেখার সাক্ষাৎ পাবে সেখানেই বুঝতে হবে যে তা মানুষের হাতে গড়া। তারপর ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পৃথিবীতে নানা আকারের থাক্‌লেও সম-ত্রিকোণ সম-চতুষ্কোণ প্রভৃতি প্রকৃতির ভাণ্ডারে আদপে নেই। ওসব আকার মানুষে আগে কল্পনা করে' তারপরে রচনা করেছে। প্রকৃতি যা অসম্পূর্ণ রেখেছেন তাকে সম্পূর্ণ করাই মানুষের আসল কাজ। পৃথিবীতে যা আছে সে সব হচ্ছে আগাগোড়া বিষম। আর ইউক্লিড যেসব ত্রিকোণ চতুষ্কোণের মর্ম্মোদ্ধার করেছেন, সে সব হয় সম, নয় অসম, কিন্তু একটিও বিষম নয়। বিজ্ঞান খোঁজে fact অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ, কিন্তু আর্ট চায় তার সুরূপ। সুতরাং যা কুটিল, আর্ট তাকে সরল করে নেয়, যা বিষম তাকে সুষম করে নেয়—যা বিবাদী তাকে সম্বাদী, অনুবাদী করে নেয়; এক কথায় সকল বিরোধের সমন্বয় করে', তার সামঞ্জস্য ঘটায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে শুধু আমি নই সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে ইউক্লিডের জ্যামিতি, আথেন্সের পার্থিননের মত, ফিডিয়াসের ভিনাসের মত একটি অপূর্ব্ব ও অবিনশ্বর work of art। প্রত্যুদাহরণের দ্বারা এর আর একটি প্রমাণ দিচ্ছি। হালে ইউক্লিড ভেঙ্গে,

এক রকম বৈজ্ঞানিক জ্যামিতি তৈরি করা হয়েছে। সে জ্যামিতি দেখলে যে, ভদ্র-সন্তানের গায়ে জ্বর আসে, তার কারণ তাতে মাল ঢের বেশী থাক্‌তে পারে কিন্তু গড়ন মোটেই নেই। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা গর্দ্দভের কাছে সেতু হতে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে তা পিরামিডেরই মানসী-মূর্ত্তি এবং তা আর্ট হিসেবে পিরামিডের মতই উচ্চ।

আর এক কথা ইউক্লিডের জ্যামিতি যে গ্রীসের সকল আর্টের স্বগোত্র, তার কারণ সে-সকল আর্টের ভিতরেও জ্যামিতি আছে। পার্থিনন্‌ের সকল রেখাই সরল রেখা এবং তা আকারে চতুষ্কোণ এবং তার সকল ভূষণ ত্রিকোণ, অবশ্য সম-ত্রিকোণ আর অসম ত্রিকোণ, বিষম নয়। গ্রীকদের এ জ্ঞান ছিল যে আকাশই বস্তুকে রূপ দেয় তাই গ্রীসের স্থাপত্যে, রেখা ও রেখার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ আছে অর্থাৎ আকাশের স্থান আছে। মানুষের বঙ্কুর দেহটাকে যতটা সরল রেখার কাছাকাছি আনা যায় গ্রীক-ভাস্করেরা তা কর্‌তে ত্রুটি করেন নি। গ্রীসের Statue-এর দেহকে সত্যসত্যই দেহযষ্ঠি বলা যায়। আমাদের দেশের ভাস্কর্য্যে দেহের যে অঙ্গ উন্নত তাকে আরও উন্নত করা হয়েছে আর যে অঙ্গ অবনত তাকে আরও অবনত করা হয়েছে। অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক জাতিভেদ অস্বাভাবিক রকম ফুটিয়ে তোলা ও পিটিয়ে ফেলা হয়েছে। উঁচু-নীচুর জ্ঞান আমাদের তুল্য আর কোন জাতের আছে? গ্রীসের ভাস্কর্য্যের পদ্ধতি ঠিক এর উল্টো। সে দেশের শিল্পীরা দেহের সুষমা ও সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ করবার জন্য যা অসম তাকে সম করে তুলেছে আর যা বিষম তাকে অসম করেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাম্য ও মৈত্রের উপরেই যে দেহের সৌন্দর্য্য

নির্ভর করে এ সন্ধান তারা জানত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আর্ট অবশ্য গ্রীসের পথেও চলেনি, ভারতবর্ষের পথেও নয়। এ যুগের শিল্পীদের Motto হচ্ছে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং। অর্থাৎ তাঁরা আর্টকে বস্তুতন্ত্র কর্‌তে গিয়ে নিজেরা হয়ে পড়েছেন অপদার্থ যন্ত্র।

ইউক্লিডের জ্যামিতিকে যে, লোকে একনজরে আর্ট বলে চিন্‌তে পারে না, তার কারণ অপর সকল আর্টের উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি, আর তাঁর আর্টের উপাদান আকাশ। ইউক্লিডের হাতে যা ধরা পড়েছে সে সব হচ্ছে ত্রিদল চতুর্দল আকাশকুসুম। সুতরাং তাঁর রচনা শুধু আর্ট নয়, চরম আর্ট। তিনি যে, ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বৃত্ত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেছেন—তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসীমকে সসীম করা। ঐ সব ত্রিভুজ চতুর্ভুজের ভিতর অসীম আকাশ এমন নিখুঁত ভাবে সসীম হয়ে রয়েছে যে তার একটি বিন্দু নড়চড় কর্‌লে তার রূপের সর্ব্বনাশ হয়।

জ্যামিতিকে আর্ট বলায় আমি ওবস্তুকে খেলো করছি নে। মানুষে কেন যে আর্টকে, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির নীচে আসন দিতে এত ব্যস্ত তার রহস্য আমি আজও উদ্ধার কর্‌তে পারিনি। এব্যাপার আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য, কেননা মানুষের ব্যবহারে দেখ্‌তে পাই যে, যে বিজ্ঞান দর্শনের ভিতর আর্ট আছে, সেই বিজ্ঞান দর্শনই মানুষকে মুগ্ধ করে। প্লোটার দর্শন যে আগাগোড়া আর্ট তা দর্শনজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তাঁর আর্ট আবার ইউক্লিডের সহোদর। প্লোটার prototypes সব চিদাকাশের মন্দার পারিজাত বই আর কিছুই নয়। একটা স্বদেশী উদাহরণও নেওয়া যাক্। শঙ্করের দর্শন যে দেশে বিদেশে এত মান্য পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, তার আর্ট। যে গুণে কালিদাসের কবিতা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেই একই গুণে শঙ্করের

দর্শন, সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে সে গুণের নাম হচ্ছে প্রসাদ গুণ। বলা বাহুল্য স্বচ্ছতা হচ্ছে আর্টের সৃষ্টি। পৃথিবীর সকল জিনিষই অপরিষ্কার, মানুষ নিজের মন ও নিজের হাত এই দুয়ের সহযোগে যা অপরিষ্কার তা পরিষ্কার করে নেয়—সেই পরিষ্কৃত পদার্থের নামই স্বচ্ছ। কিন্তু চিন্তার ধারা স্বচ্ছ হলেই যে গভীর হতে হবে এমন কোনই কথা নেই। বরং সচরাচর দেখ্‌তে পাই লোকের বিশ্বাস যে, যে-বস্তু যত ঘোলা তা তত গভীর। মানুষে হেগেলের চিন্তাকে যে এত গভীর মনে করে, তার প্রধান কারণ সে চিন্তার ধারা আগাগোড়া কাদাগেলা।

যে মনোভাব থেকে মানুষে রঙকে স্বচ্ছ করে, সেই একই মনোভাব থেকে মানুষে রেখাকে সরল করে। সুতরাং রচনার ভিতর যেখানে স্বচ্ছতা আছে সেখানে ঋজুতার সাক্ষাৎ পাবার আশা করা যায়। শঙ্কর এ বিষয়ে আমাদের নিরাশ করেন না। তাঁর মনও জ্যামিতির ছাঁচে ঢালা। তাঁর চিন্তা একটা সরল রেখা ধরে চলে বলে' তার সঙ্গে সঙ্গে চলা এত সহজ। এ চলার যা আনন্দ সে হচ্ছে পুরোপুরি আর্ট উপভোগ করবার আনন্দ। তাঁর অনুগামী হয়ে আমরা কি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কি অতীন্দ্রিয় কোনরূপ জ্ঞানের পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইনে। প্রথমত তিনি এই বহুরূপী বিশ্বকে মায়া বলে, অর্থাৎ তার রূপ বাদ দিয়ে জিনিসটিকে বেজায় স্বচ্ছ করে নিয়েছেন। তারপর তাঁর যুক্তি একটা সরলরেখা ধরে শেষটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যার স্থিতি আছে অথচ ব্যাপ্তি নেই অর্থাৎ বিন্দুতে। শঙ্করভাষ্যের প্রধান গুণ যে তার আর্ট, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে ভাষ্যের সঙ্গে উপনিষদের তুলনা কর্‌লে। উপনিষদে যা আছে সে হচ্ছে নিছক poetry, অর্থাৎ তার

সীমারেখাও স্পষ্ট নয় তার বর্ণও স্বচ্ছ নয়। অনন্তের ছায়ায় তা আবছায়া। অসীমের দেশে তার সীমারেখা বিলিন। এক কথায়, উপনিষদ্ ইংরেজিতে যাকে বলে রোমাণ্টিক আর তার ভাষ্য ক্লাসিক। আর এ দুয়ের মূল প্রভেদটা এই যে, ক্লাসিক-সাহিত্য রেখাবদ্ধ আর রোমাণ্টিক-সাহিত্য বর্ণবিদ্ধ, অর্থাৎ ক্লাসিক-সাহিত্য জ্যামিতির অন্তর্ভূত, আর রোমাণ্টিক তার অতিরিক্ত। এই কারণে হৃদয়াবেগ চিরকালই রোমাণ্টিক এবং আর্ট চিরকালই ক্লাসিক। এ দুয়ের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ বিপরীত। Poetry-র উদ্দেশ্য সসীমকে অসীম করা, আর আর্টের উদ্দেশ্য অসীমকে সসীম করা। মানুষে অবশ্য চিরকাল এই দুইকে মেলাতে চেষ্টা করে আস্‌ছে, এবং এই দুয়ের মিলনে যা জন্মলাভ করে—তাই হচ্ছে যথার্থ কাব্য। তবে কোনও কবির তুলিতে রেখা ফোটে ভাল আর কোনও কবির তুলিতে রঙ, কাব্যে কাব্যে এই যা প্রভেদ। এর পর এ কথা নিশ্চিন্তমনে বলা যায় যে, দর্শন বিজ্ঞানের স্থান কবিতা ও আর্টের উপরে নয়, কেননা বিজ্ঞান যে কনিষ্ঠ-আর্ট এবং দর্শন যে বৃদ্ধ-কবিতা—এ সত্য যদি প্রমাণ কর্‌তে না পেরে থাকি ত এতক্ষণ মিছে বকলুম কেন ?

কোথা থেকে সুরু করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়্‌লুম ? যুদ্ধ থেকে একেবারে কবিত্বে। এ পত্রে আমার লেখা যে সরলরেখায় চলেছে—তা বল্‌তে পারিনে, তবে এর গোড়ার সঙ্গে আগা যে জোর করেও মেলানো যায় না তা নয়। গোড়ায় বলেছি যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার যুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আত্মা অর্থে জাতীয় আত্মা বুঝতে হবে। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ হচ্ছে বিকৃত জর্ম্মাণ-রোমাণ্টিক আত্মার সঙ্গে প্রকৃত ল্যাটিন-ক্লাসিক আত্মার

লড়াই। ক্লাসিক ফ্রান্স তার সীমান্ত রেখা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে—রোমাণ্টিক জর্ম্মাণি তার নিজের সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে। শুধু দেশের সীমা নয়, জর্ম্মাণী ইতিমধ্যেই নীতির সীমা, লজিকের সীমা, সামাজিকতার সীমা, এক কথায় সভ্যতার সকল সীমা হুঙ্কার ছেড়ে এক লম্ফে অতিক্রম করেছে। জর্ম্মাণীর জাতীয়-আত্মাকে ঠেলেঠুলে এখন যদি তার স্বদেহে অর্থাৎ স্বদেশে পোরা না যায় তাহলে পৃথিবীতে সভ্যতা বলে আর কোনও জিনিস থাকবে না। কেননা সভ্যতা হচ্ছে মানুষের জীবন ধারণের আর্ট—অতএব তা বাইরের ও ভিতরের নানাবিধ সীমারেখায় আবদ্ধ। সভ্যতা জিনিসটেই ক্লাসিক এবং ইউরোপের ল্যাটিন জাতিই তার যথার্থ উত্তরাধিকারী। আশা করি তারা সে অন্বয়াগত সম্পত্তি বর্ব্বরতার হাত থেকে এ যাত্রা রক্ষা করতে পারবে। ও বস্তু রক্ষা করবার অন্তত প্রাণপণ চেষ্টা করা যে সভ্য-সমাজের কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। ছেলেবেলায় সংস্কৃত ক্লাসিকে পড়েছি যে হর্ষবর্দ্ধন—"হুনান্ হন্তুং প্রতিচ্যাং দিশিং জগাম"। হর্ষচরিতের ঐ একটি টুকরোই আমার মনে আছে—কেননা সে বয়েসেও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার ঐ অভিযানের জীবন্ত ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠেছিল এবং আজও তার রঙ জ্বলে যায়নি। বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াটাই সভ্যতার সব চেয়ে সুন্দর দেহভঙ্গি।

জানি, এ সব কথা শুনে লোকে বলবে—"বীরবলের কথা ছেড়ে দাও—ও ত মার্কামারা ফরাসি-ভক্ত।" এ খ্যাতি প্রত্যাখ্যান করতে আমি কিছুমাত্র ব্যগ্র নই। লোকে বলে আমার শরীরে ভক্তির লেশ নেই, অতএব আমার ফরাসি-ভক্তির খ্যাতি, "খোস খবরের ঝুঁটোও

ভাল” হিসেবে গ্রাহ্য। খাঁটি কথা এই যে, ফরাসীদের প্রতি আমার ভক্তি নেই—প্রীতি আছে, তার কারণ ফরাসীরা দেবতা নয় মানুষ। মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়ার চাইতে আর বড় কৃতীত্ব নেই, কেননা তা হওয়া ভারি শক্ত। জর্ম্মাণরা মানুষ না হয়ে অতিমানুষ হতে গিয়েই অমানুষ হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক্, আমার কথা তুমি ভুল বুঝো না। আমি রোমাণ্টিক মনোভাবকে বর্ব্বরতা বলছি নে। ক্লাসিক মন রেখাপাত করে, রোমাণ্টিক মন তার অন্তরে বর্ণ বিন্যাস করে। এর প্রথমটির ভিতর দ্বিতীয়টি অনুপ্রবিষ্ট না হলে, কি সমাজ কি সাহিত্য কিছুই ঐশ্বর্য্য লাভ করে না। তবে এ কথা ভুললে চল্‌বে না যে, শুধু রেখায় ছবি আঁকা যায়, শুধু রঙে যায় না। অতএব সুস্থ মনের প্রথম কাজ হচ্ছে কাঠাম গড়া ও খাড়া রাখা। সুবুদ্ধি কাঠাম তৈরি করে সুহৃদয় তার ভিতর রঙ ভরে দেয়। কিন্তু যে হৃদয়াবেগ আর্টের হাতে গড়া সুঠাম কাঠাম ভেঙ্গে ফেলতে চায়,সেই হৃদয়াবেগই বর্ব্বর, কেননা তা অন্ধ। আজকের দিনে জর্ম্মাণির জাতীয়-আত্মা রূপান্ধতার এত প্রবল প্রমাণ দিচ্ছে যে, সে আত্মাকে আর্টিষ্টিক অর্থাৎ সভ্য বলা অসম্ভব। রোমাণ্টিক আত্মা বিপথে গেলেই তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়—আর ও মনোভাবের উদ্ভ্রান্ত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে। রোমাণ্টিক আত্মার ছোটবার খোলা রাস্তা হচ্ছে, উপরের দিকে—আশে পাশে নয়। তার চোখ আকাশ ছেড়ে মাটির উপর পড়লেই সে স্থলে আগুন জ্বলে। সে যাই হোক্, আমার জ্যামিতিক বন্ধু বলেন যে, ইউক্লিডের জ্ঞান থাকলে জর্ম্মাণরা সমস্ত পৃথিবীকে জর্ম্মাণীর অন্তর্ভূত করবার চেষ্টা করত না, কেননা ও চেষ্টা হচ্ছে একটা বিরাট বৃত্তকে একটা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করবার চেষ্টা।

ঢের বাজে বকেছি, এইখানেই দাঁড়ি টানা যাক, নইলে আমার বাচালতা পত্র ব্যবহারের সকল সীমা লঙ্ঘন করবে। এ লেখায় এত ফাঁক থেকে গেল যে, তোমার বুদ্ধির ছুরি, এর গায়ে যেখানে খুসি অনায়াসে চালাতে পারবে। তবে বুদ্ধির ছুরি না চালিয়ে যদি এ পত্রের গায়ে বুদ্ধির আলো ফেলো—তাহলে হয়ত দেখতে পাবে এর এক আধটা ফাঁক দিয়ে এক আধটা সত্য উঁকিঝুঁকি মারছে।

২৬শে মে ১৯১৮ বীরবল।

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

—:*:—

[সম্প্রতি Lonis Chadourne নামক জনৈক ফরাসি লেখক, ফরাসি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের Gardener-এর একটি অতি সুন্দর সমালোচনা লিখেছেন। সে প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ জুন মাসের Modern Review-য়ে প্রকাশিত হবে। সমালোচক একস্থলে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়েসের কবিতার ভিতর, despair এবং resignation-এর সুর আদপেই নেই। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে "মানসী" পড়ে, আমি রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখি তাতে এই কথা ছিল, যে মানসীর মধ্যে একটা despair এবং resignation-এর সুর আছে। সে পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন—সেখানি আজ প্রকাশ করছি, এই বিশ্বাসে যে এ বিষয়ে কবির নিজের মুখের কথার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দ্বিতীয় পত্রে প্রথম পত্রের জের চলে এসেছে বলে, এই সঙ্গে সেখানিও প্রকাশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

ভাই প্রমথ।

এই খানিকক্ষণ হল তোমার চিঠি পেলুম। সেদিন কলকাতার চিঠিতে তোমার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিতির খবর পেয়ে আমি ঠাওরে-ছিলুম তবে বুঝি তুমি এখনো কলকাতায় আছ এবং আমার পত্রখণ্ড তোমাদের হরিপুরের মাঠে মারা গেল। কিন্তু তোমার চিঠিতে জানা গেল, আমার চিঠি রক্ষে পেয়েছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানকার মাঠে

বাঘ বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো মারা পড়চে। আমি এখানে আমার সাম্‌নের এই সবকটা জান্‌লা খুলে দিয়ে, এখানকার দুপুরের রৌদ্রে বড় বড় গাছওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে পাড়াগাঁয়ের অনতিব্যস্ত লোক চলাচলের প্রতি, অনিমেষ নেত্র নিহিত রেখে এমনি অন্যমনস্ক উড়ো উড়ো ভাবে থাকি যে, একটু মনঃসংযোগ করে একটা ভদ্ররকম প্রমাণসই চিঠি যে লিখ্‌ব তার সামর্থ্য নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন কাগজে দুটো চারটে অসংলগ্ন কথা লিখে কোনমতে সাঙ্গ করে দিতে হয়। এখানকার বাতাসে এবং বাহ্যদৃশ্যে এমন একটা আলস্য, ঔদাস্য, বৈরাগ্য অথচ এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আমার মন, কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে আছে কি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু বুঝ্‌তে পারচি নে। মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাব্‌ছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মনসম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignation-এর মুলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মুলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে। আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে

বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কি ভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো—তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে Objectively দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা—কারণ আমার প্রতি-মুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান, যে, মোটের উপরে আমি যে কি তা দেখ্‌তে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন—কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়, তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পুর্ব্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখ্‌তে পার। Bashkirtseff-এর Journal আমিও পড়ছি—মন্দ লাগ্‌চে না কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। এর থেকে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কথা মনে আসে—কিন্তু যেটুকু স্থান অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে আর সে সকল উত্থাপন করা যেতে পারে না—অতএব আজ বিদায়।

২৯ জানুয়ারি ১৮৯৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাই প্রমথ !

হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে—মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে—এবং পৃষ্ঠদেশ যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি—যাকে চক্ষেও দেখিনে—বহু পরিশ্রমের পর চৌকিতে ঠেসান দেবার সময় ব্যতীত, যার অস্তিত্ব কখনো অনুভব করা যায় না সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনা রাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে। তোমাকে এই যে ক' লাইন চিঠি লিখলুম এর মধ্যে অনেক মুখভঙ্গী এবং আর্ত্তনাদ অব্যক্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ত্তমান এই ব্যাধিটার তুলনায় মানসীর সমস্ত ঔদাস্য এবং নৈরাশ্য অত্যন্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত সৌখীন বলে মনে হচ্চে। পিঠ এবং কাঁধকে হৃদয় এবং আত্মার চেয়ে অনেক বেশী মনে হচ্চে। অতএব আজ মানসীসম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্য-কথা—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না—এক ঘটি জল চায়, কি আধখানা বেল চায়, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে পারে না, আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়্‌বার চেষ্টা কর্‌চি। জানি, সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষজনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানব-মনের মুখের উপর সর্ব্বদা জবাব করে—তাই ধ্যানভরে কল্পনা-সিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্চে—কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল পাওয়া যায় না কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশী আজ্ঞা-বহ। তাই জন্যেই সাধ যায় "সত্য যদি হত কল্পনা"—আমি দুটো

যদি এক করতে পারতুম! অর্থাৎ আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম! মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই—কেউ বা বলুচে, আছে বলে বহির্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্চে—কেউ বা জানে, নেই—তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাস ভাবে কল্পনা পুত্তলী গড়িয়ে তাকে পুজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে, সে artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছিন্ন পত্র।

কর্ম্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দ্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায়না আলো, পায়না বাতাস, পায়না ফাঁকা, পায়না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেচে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্ব্বনাশে
হারিয়ে ছিলেম বিশ্বজগৎ খানি।
নীল আকাশের সোণার বাণী
সকাল সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছতনা মোর বাতায়ন দ্বারে।
ঋতুর পরে আস্‌ত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে
আন্‌ত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।

অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কি যে সে ক্রন্দন
জান্‌ব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সঙ্গোপনে বহন করে' কর্ম্মরথে
সমারোহে চল্‌তেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।

তিন্‌টে চার্‌টে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়্‌তে হ'ত নকল সিংহনাদ;
বীড্‌ন্ কুঞ্জে মীটিং হ'লে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট লিখ্‌তে হত তক্তা তক্তা;
যুদ্ধ হ'ত সেনেট সিণ্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিন রাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বল্‌ত, "কর্‌চ কি এ?
মারা যাবে শেষে"!
আমি বল্‌তেম হেসে,
"কি করি ভাই, খাট্‌তে কি হয় সাধে?
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কি করি তার উপায় বল্‌তে পারো"?
বিশ্বকর্ম্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সে দিন তখন দু' তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্ট খানা লিখেছি খুব জোরে।
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মর্‌তে হবে ভোট্‌ কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্র ভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা সার,
আমার হ'ল তেম্‌নি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিইনে কথা কাণে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া ত থাক্‌ পরে"।

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হ'ল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখী ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্‌ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চল্‌চে উঠে নেবে,
নাইক দাঁড়ি কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।

আর হ'ল না পড়া,
মনে হ'ল কোন বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠি খানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
'সূর্য্য ওঠে পশ্চিমে কি পূবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেচি, চল্‌চি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে
আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার কর্‌লে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজ পত্রে চল্‌ল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়্‌ল হাতে,
সেটা নিয়ে কি কর্‌ব তাই ভাব্‌চি বসে আরাম কেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন পবন ভরে
ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রো এসে পড়্‌ল আমার কোলের পরে।
অন্য মনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়্‌ল চোখে, "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে" ?
মনু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ?
অম্‌নি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভরে',
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।

সেই ত আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনি ঝিনি।
সেই ত আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেচে পথহারা;
সেই ত আমার শিশুকালের শিউলি ফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে;
সেই ত আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অম্‌নি ওদের বাড়ীর পানে ছোটা।

ওরি সঙ্গে সুরু হ'ত দিনের প্রথম খেলা;
মনে পড়ে, পিঠের পরে চুল্‌টি মেলা
সেই আনন্দ মুর্ত্তি খানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।
অসীম ধৈর্য্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মান্‌ত মনু হার।
উঠে গাছের আগ্‌ডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি করে,'
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুল্‌তে পারি কি সে?
মনে পড়ে নীরব ব্যাথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার;

ফেলেচে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজ্‌ত কত ছল।
আরো কিছু বড় হ'লে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বলে'।
নাম্‌তাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠ্‌ত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরাজি বই দেখে'
ভাব্‌ত মনে গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাৎ সোজা।

হেন কালে হঠাৎ সে-বার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধ্‌ল মকর্দ্দমা,
কেউ কাহারে কর্‌লে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জ্জন,
মোর প্রতিমার হল' বিসর্জ্জন।

দেখা শোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুন্‌তে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠ্‌ল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যা-তারার মত;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বল্‌ল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।
কত বছর গেল চলে'
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হ'লে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ী কিনেছে কোন পাটের কুঠিয়াল,
হ'ল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।

সেই মনু আজ এত কালের অজ্ঞাতবাস টুটে,
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সে কি? সে কি অত্যাচার?
কেবল কি তার বাল্য সখার কাছে
হৃদয় ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে?
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে, খুঁজে পাব নাকি?

মনুরে কি গেছ ভুলে ?
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটী ফোঁটা চোখের জলের মত !
কত চিঠির জবাব লিখ্‌ব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বল্‌বে বহ্নিশিখা
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব-বিদ্যালয়।

——:•:——

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু।

(৫)

আজ আমি শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে নব-বিদ্যালয়ের প্রকরণ-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। আগে থাক্‌তেই বলে রাখি—এ পত্রে মূলের চাইতে টীকাভাষ্য ঢের বেশী হবে, কেননা শরীরের কথাটা এদেশে শুধু বিদ্যালয়ের কথা নয়—লোকালয়েরও কথা। ছেলেবেলায় যে ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি, তাঁর ওষুধের প্রতি শিশির গায়ে, একালের অনেক ওষুধের শিশির গায়ে যেমন বড় বড় লাল হরফে poison ছাপানো থাকে, তেমনি বড় আর তেমনি লাল হরফে ছাপানো থাক্‌ত, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। এ বচন শাস্ত্রীয় কি উদ্ভট তা জানিনে, কিন্তু ঐ ক'টি কথা আমার মনের মধ্যে একেবারে লাল কালিতে ছেপে গিয়েছে,—তার কারণ দশ থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত, এই চার বৎসর ধরে ঐ বাক্যটি আমার চোখের সুমুখে প্রতিনিয়ত ছিল।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—এ ধর্ম্মজ্ঞান আজ দেশসুদ্ধ লোকের মনে জন্মেছে। তবে উক্ত ধর্ম্মের সাধন-পদ্ধতি যে কি, সে

বিষয়ে আমাদের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। নিত্যনিয়মিত ওষুধ খাওয়া যে বলাধানের সদুপায় নয়—এ সম্বন্ধে বোধহয় এক ঔষধ-বিক্রেতা ছাড়া আর সকলেই একমত। কিন্তু সদুপায়টা যে কি, তা জানবার জন্য শারীর-বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন। আমি কিঞ্চিৎ বিশেষণটি ইচ্ছে করেই লাগিয়েছি, কেননা এক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের মূল্য বিজ্ঞানের চাইতে নিতান্ত কম নয়।

নব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের মতে, আজকালকার ভাষায় যাকে বলে দেহের অনুশীলন—তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করা।

সৌন্দর্য্য জিনিষটে যে শক্তির উপর নির্ভর করে, এ বিষয়ে সকল প্রাচীন সভ্যতাই একমত। রূপ—তা সে দেহেরই হোক্ আর মনেরই হোক্, ভাবেরই হোক্ আর ভাষারই হোক্,—আকারের উপরেই যে নির্ভর করে, এবং আকারের সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব যে স্বাস্থ্য ও বলের উপরেই নির্ভর করে, এই হচ্ছে ক্লাসিক মত।

দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই যে দেহচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য—এ-কথা এ-কালেও বোধহয় বেশীর ভাগ লোক স্বীকার করেন। অতএব সে উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় কি, এই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সমস্যা। কেননা এ পৃথিবীতে দেহই হচ্ছে প্রাণের ভিত্তি।

নব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের মতে, এর সর্ব্বপ্রধান উপায় হচ্ছে ছেলেদের স্নান আহার নিদ্রার একটা সুব্যবস্থা করা। প্রথমে ঘুমের কথাটাই ধরা যাক্।

নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের নয় থেকে এগারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত একটানা ঘুমতে দেওয়া হয়। তাঁদের মতে এর কম হলে ছেলেদের স্বাস্থ্য

বজায় থাকে না। দিনে যদি ভাল করে জেগে থাকতে হয়—তাহলে রাত্তিরে যে ভাল করে ঘুমনো দরকার, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী দিতে পারি। রাত জেগে পড়ার ফলে ছেলেরা যে দেহমনে ঝিমিয়ে পড়ে, এই প্রত্যক্ষ সত্যকে অগ্রাহ্য না করলে—বাঙ্গালী জাতটা আমার বিশ্বাস এর চাইতে ঢের বেশী সজাগ হতে পারত।

তারপর নব-বিত্তালয়ে ছেলেদের শোবার ঘরের দুয়োর-জানালা কখনও বন্ধ করা হয় না। এ বিষয়ে শীতগ্রীষ্মের কোনও তফাৎ নেই। আমাদের এই গরম দেশে আমরা শুধু দরজা-জানালা নয়—শার্শি পর্য্যন্ত এঁটে শুই; ঠাণ্ডা লাগবার আমাদের এতই ভয়। কিন্তু রুদ্ধ-ঘরের বদ্ধ-বায়ুর ভিতর মানুষ হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েদের বাল্যে সর্দ্দিকাশি কামাইও যায় না, কমও হয় না; তারপরে যৌবনে হয় তাদের ক্ষয়কাশ। বাংলাদেশের এই রাজধানীতে রাজযক্ষ্মার প্রতাপ—বিশেষতঃ মেয়েমহলে—যে দিনের পর দিন কিরকম বেড়ে চলেছে, তার সন্ধান যে-কোনও ডাক্তারকবিরাজের কাছে পাবেন। অবরোধ-প্রথায় যে মানুষের শ্বাসরোধ করে, তার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। আলোহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে শুধু মানুষ মারবার জন্য,—এরূপ বিশ্বাস করায় ভগবানের উপরেও সুবিচার করা হয় না, নিজের বুদ্ধিরও পরিচয় দেওয়া হয় না। দুয়োর বন্ধ করলেই যে মানুষে তার ভিতর বন্দী হয়—এ জ্ঞান থাকলে, আমরা আমাদের বাসাগারকে কারাগার করে তুলতুম না। বাহিরকে বাহির করে রাখলেই ঘর হয়ে পড়ে কবর। দিবারাত্র খোলা হাওয়ার ভিতর বড় হলে, শরীর যে কত সুস্থ ও কত বলিষ্ঠ হয়, তার পরিচয় ঐ নব-বিত্তালয়েই পাওয়া গেছে। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, তাঁর স্কুলের

ছেলেরা এক বৎসর দ্বার-মুক্ত ঘরে ঘুমতে অভ্যস্ত হবার ফলে, তাদের শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তি এতটা বেড়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে অনেকে, দেশ যখন বরফে জমে যায়, সে সময়ও রাত্তিরে সখ করে মাঠের ভিতর তাঁবু খাটিয়ে তার নীচে শোয়, এবং তাতে তাদের— নিউমোনিয়া ত বড় কথা—শ্লেষ্মাও প্রকুপিত হয় না। এ একটা কম বড় শিক্ষা নয়; কেননা সকলেই জানেন যে, অকাতরে শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তির নামই তিতীক্ষা। আর যাতে করে তিতীক্ষা আমাদের অঙ্গের ভুষণ হয়, তার জন্য ত সকলেই চীৎকার করছেন।

আর একটি কথা। নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের গ্রীষ্মকালে দিনে ঘুমতে দেওয়া হয়। সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের "মা দিবাং স্বপ্সি" এ নিষেধ মেনে চল্‌তে হয় না। তার কর্ত্তৃপক্ষদের মতে ছেলেদের পক্ষে শুধু গ্রীষ্মকালে নয়, সকল কালেই, দিনে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নিতান্ত দরকার, নচেৎ বড় হলে তারা পুরোপুরি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অস্থিতত্ত্ব-বিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে, বারো চৌদ্দ বয়েসের আগে ছেলেদের পিঠের দাঁড়া মজবুত হয় না, সুতরাং সে বয়েসে দিনভর দেহের বোঝা বইতে হলে তাদের মেরুদণ্ডটা বেঁকে যায়, নুয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকের পৃষ্ঠদণ্ড যে ঋজু নয়, তা সভ্যসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই নজরে পড়ে। দেহের এরূপ বঙ্কিম ভঙ্গীটা সুদৃশ্য ত নয়ই, স্বাস্থ্যকরও নয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পৃষ্ঠদণ্ডকে ঋজু করা এতই আবশ্যক মনে করতেন যে, তার জন্য তাঁদের হঠযোগের সব ভীষণ প্রক্রিয়া অভ্যাস করতে হ'ত। সময় থাকতে দিনদুপুরে একটু শুয়ে নিলে যদি সেই সুফল লাভ করা যায়, তাহলে তা যে করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে আশা করি দ্বিমত নেই।

(৬)

নিদ্রার পরই ওঠে আহারের কথা। কথায় বলে—"আহারনিদ্রা" যত বাড়াও তত বাড়ে। এ কথার অর্থ—ও দুই কমানো সমান কর্ত্তব্য। নব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এর প্রথম অংশ গ্রাহ্য করেন, শেষ অংশ করেন না। তাঁদের মতে ছেলেরা যত ঘুমোয় ঘুমক, কিন্তু তাদের ভোজনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া কর্ত্তব্য। সভ্যসমাজের বেশীর ভাগ লোক যে মরে অতিভোজনের ফলে,—উপবাসে নয়,—এ জ্ঞান যদি সাধারণ লোকের থাক্‌ত, তাহলে পৃথিবীর রোগ শোক অনেকটা কমে আস্‌ত। আমাদের দেশে এ জ্ঞানের বিশেষ দরকার আছে, কেননা আমরা আর যাই হই, জাত হিসেবে মিতাহারী নই। ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের পেটের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর্য্য মুসলমান ও ইংরাজের, আর কিছু না হোক, আহার আমরা যুগপরম্পরায় উদরস্থ করেছি। কাঁচকলা সিদ্ধ আদি করে কোপ্তা কাবাব চপ কটলেট সবই আমাদের সমান ভক্ষ্য। পেটে খেলে পিঠে সয়, এ প্রবাদের জন্ম বাঙলাদেশে। অনেকে বলেন যে এতে বাঙালী জাতি তার assimilation-এর শক্তির পরিচয় দেয়; শুধু তাই নয়, যারা স্বদেশী ডাল রুটির সাহায্যে জীবন ধারণ করে, তাদের আমরা ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করি। আমাদের রসনা বিদেশী ভাষা যেরূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে, আমাদের উদর বিদেশী আহারও তদ্রূপ অনায়াসে আত্মসাৎ করে।

নানা প্রকারের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের রসাস্বাদন করায় সম্ভবত ক্ষতি নেই, কিন্তু তার পরিমাণ একটা সীমার ভিতর আবদ্ধ রাখা স্বাস্থ্যনীতির হিসেবে নিতান্ত প্রয়োজন। Assimilation-এর শক্তি তার প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় না। জীর্ণ করবার শক্তির

চাইতে আমাদের ভোজন করবার প্রবৃত্তি ঢের বেশী হওয়ায়, বাঙালার যুবকদের হয় মন্দাগ্নি, আর প্রৌঢ়দের বহুমূত্র। বহু লোকের দেখ্‌তে পাই একটা ধারণা আছে যে, ও দুই রোগের দ্বারা বাঙালী তার চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে ধারণা নিতান্তই ভুল। উদর ও মস্তিষ্ক এক অঙ্গ নয়, এবং এক প্রকৃতির অঙ্গ নয়। এর একটি নিরেট, আর একটি ফাঁপা; অতএব এ দুয়ের ক্ষুধাও এক নয়, খোরাকও এক নয়। এর অধমটির খোরাক কম জোগালে উত্তমটির শক্তি বাড়ে। আমার বিশ্বাস এই ঔদরিকতাই আমাদের সকল দুর্ব্বলতার মূল কারণ। আমরা জাতকে জাত যে এতটা স্ত্রী-শাসিত—সেও ঐ পেটের দায়ে। শুন্‌তে পাই অপর দেশের স্ত্রীলোকে পুরুষদের হৃদয় তুষ্ট করে তাদের পোষ মানায়—কিন্তু দেখ্‌তে পাই এদেশের স্ত্রীজাতি পুরুষদের উদর পুষ্ট করে তাদের বাগ মানায়। রন্ধনই এ দেশে দাম্পত্যের প্রধান বন্ধন। এই সব কারণে, আমার মতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আহার-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা দরকার; এবং এ শিক্ষা স্কুল থেকে সুরু হওয়াই কর্ত্তব্য। বাল্যকালে অপরিমিত আহার করলে, যৌবনে দুষ্ট ক্ষুধাকে আর শিষ্ট করা যায় না।

দেশভেদে জাতির খাদ্যাখাদ্যের ভেদ হয়। সুতরাং বেলজিয়ামের স্কুলের আহারের ব্যবস্থা আমাদের স্কুলে নাও চল্‌তে পারে; তবে আমরা যখন সর্ব্বভূক, তখন এই কথাটা আমাদের জানা দরকার যে, নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মাংসভক্ষণ নিষেধ। এ স্কুলে দুধ ঘি আটা, ফল মূল ও শাক্‌ সবজিই ছেলেদের প্রধান আহার।

(৭)

নব-বিদ্যালয়ে স্নান প্রাতঃকৃত্য এবং সায়ংকৃত্য। সেখানে ছেলেদের দিনে দুবার নাইতে হয়, সকালে ঘরে ও বিকালে পুকুরে। বারোমাস সকলের পক্ষে ঠাণ্ডা জলেরই ব্যবস্থা। গরম জল ওষুধের মত ডাক্তারের প্রিস্‌ক্রিপ্‌সান ব্যতীত কাউকে ব্যবহার কর্‌তে দেওয়া হয় না। সাঁতার-কাটার সুফলে এঁদের বিশ্বাস এত অগাধ যে, সকল ছেলেকেই সাঁতার শিখ্‌তে হয়, এবং নিত্য অভ্যাস কর্‌তে হয়। এক সহুরে ছাড়া এদেশের আর সকল ছেলেদের অবগাহন-স্নান একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, সুতরাং এ বিষয়ে এঁদের কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই—একটা জিনিস ছাড়া; নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের নেয়ে উঠে গা মুছতে দেওয়া হয় না। রোদে হাওয়ায় তাদের গায়ের জল গায়েই শুকোয়। অর্থাৎ তাদের দেহ থেকে এক ভূতকে আর দুই ভূত দিয়ে তাড়ান হয়,—এতে নাকি সে দেহের পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসে। ছেলেরা যাতে করে পুরোদস্তুর sun-dried হয়, তার জন্য স্নানান্তে তাদের দিগম্বর অবস্থায় থাক্‌তে হয়, কেননা এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশ্বাস যে, শরীরের কোন অঙ্গকেই অষ্টপ্রহর অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখা সঙ্গত নয়। এ কথাটার বিশেষ করে উল্লেখ করবার কারণ, সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গকে অসূর্য্যম্পশ্য করে রাখায় সে দেহ যে সুস্থ থাকে, এ বিশ্বাস কোন কোনও জাতের আছে। সেই সর্ব্বনেশে ধারণাকে দূর কর্‌তে হলে, আলোহাওয়ার গুণকীর্ত্তন ফাঁক পেলেই করা উচিত। ডোরকৌপীন ধারণ কর্‌লে রক্তমাংসের শরীর যে ইস্পাত হয়ে ওঠে, তার কারণ সে শরীরকে রোদে পুড়িয়ে জলে ডোবানো হয়।

(৮)

স্নান, আহার, নিদ্রা—এ সকলের কাজ হচ্ছে শরীর রক্ষা করা। শরীরকে বলিষ্ঠ ও সক্রিয় করবার জন্য আরও পাঁচরকম উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয়। সে সকল উপায় মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) খেলা।

(২) দৌড় ঝাঁপ (Sports)।

(৩) ব্যায়াম (Gymnastics)।

(৪) কাজ।

খেলা সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যে-শিশু যত খেলতে ভালবাসে, সে শিশু তত সুস্থ। সুতরাং তার খেলায় বাধা দেওয়ার অর্থ তার দেহমনের শক্তির স্ফূর্ত্তিতে বাধা দেওয়া। শিশুরা দেহের শক্তি ব্যয় করেই যে তা সুদসুদ্ধ আদায় করে, এ কথা দেহজ্ঞানী মাত্রেই জানেন। কিন্তু খেলে বেড়ালে মনেরও যে উপকার হয়, সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। অথচ ওদিকে একটু মনোযোগ করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, খেলার ভিতর বুদ্ধি খেলাবার ঢের অবসর আছে। এমন একটা খেলার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—যা পৃথিবীর সকল দেশের সকল ছেলেরাই যুগ যুগ ধরে খেলে আস্‌ছে। লুকোচুরি খেলা হচ্ছে বিশ্ব-শিশুর নিত্য লীলা। বলা বাহুল্য এ খেলার প্রসাদে অনুসন্ধিৎসা গবেষণা, সমীক্ষা পরীক্ষা, দিক্‌দর্শন পরিদর্শন প্রভৃতি মহামুল্য চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারের জন্য এ ক'টি ছাড়া আর কোন্ চিৎশক্তির প্রয়োজন হয়?—সত্যকথা বল্‌তে, পৃথিবীর মহা মহা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা

সত্যের সঙ্গে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলছেন? ছেলেবেলায় ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেল্‌লে, আমরা বড় হলে বিশ্বের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লুকোচুরি খেলতে পারব। যাঁরা দর্শনবিজ্ঞানের ধার ধারেন না, তাঁদের পক্ষেও এ খেলায় অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে মানুষে লুকোচুরি ছাড়া আর কি খেলে? রাজায় প্রজায়, প্রভু ভৃত্যে, স্ত্রী পুরুষে চিরদিন ত ঐ খেলাই খেলে আস্‌ছে;—অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশুদের খেলায় বাধা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অকর্ত্তব্য। তারপর তাদের কোনরূপ খেলা শেখানোও শিক্ষকের কর্ত্তব্য নয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, শিশুদের খেলা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায় যে, তারা নিত্য নতুন খেলা খেলে। তারা কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী বলে, এ বিষয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি অসীম। তাদের কল্পনাকে তারা এবেলা ওবেলা খেলার রাজ্যে বাস্তব ক'রে তোলে। এতেই তাদের আর্টিষ্টিক শক্তির চরিতার্থতা। সুতরাং খেলার ক্ষেত্রে তাদের একেবারে ছেড়ে না দিলে আমরা যে তাদের শরীরকে জখম করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে ভোঁতা করি—আর্টিষ্টিক শক্তিকে চেপে দিই। এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ঃ—

উঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ"

এই শ্লোকটি হতে "পাঠেতে" শব্দটি বহিষ্কৃত করে দিয়ে তার স্থলে "খেলায়" বসিয়ে দেওয়া সঙ্গত। ভোরের বেলায় শিশুরাও যদি সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড়ের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহলে কার জন্যই বা "পাখী সব করে রব" আর কিসের জন্যই বা

"কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল" ? রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে বলে কি শিক্ষকদেরও শিশুর পাল লয়ে যেতে হবে স্কুলে ? Analogy-র বলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যে উল্টো উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ—স্কুলেও পাঁচন চলে। নব-বিদ্যালয়ে সব রকমের গাছপালা আছে,—শুধু বেত নেই। সে যাই হোক্, ভগবানের সৃষ্টির সকল জিনিসের ভিতর যে একটা যোগাযোগ আছে—সে জ্ঞান আমরা হারালেও, শিশুরা হারায় না ; তাই তারা আলো বাতাস পাখী ফুল সকলের সঙ্গে যোগ রেখেই আনন্দ পায়, আর সেই আনন্দই তাদের জীবনীশক্তিকে বিকশিত করে।

(৯)

এ ত গেল খেলার প্রথম অধ্যায়। শিশুর চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং তার খেলাও সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ।

বালকের খেলার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিশুর খেলা ব্যক্তি-গত, বালকের খেলা সামাজিক। শৈশব অতিক্রম করবার পর ছেলেদের মনে যখন সমাজের জ্ঞান জন্মায়—তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে খেলে। এ সব খেলার আগাগোড়া ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি হচ্ছে সব সামাজিক খেলা—অর্থাৎ দশে মিলে নিয়ম মেনে এ সব খেলা খেলতে হয়। এ সব খেলার প্রধান গুণ যে এতে ছেলেদের চরিত্রগঠনের সহায়তা করে। ব্যায়ামে শুধু শরীর গড়ে, কিন্তু এ শ্রেণীর খেলায় ছেলেদের মনে নীতির বীজ বুনে দেয়। এই শ্রেণীর খেলা হচ্ছে, নব-বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষার একটি

প্রধান অঙ্গ। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়ায় মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে একথা তাঁরা জোর করে বল্‌তে পারেন যে, নীতির উপদেশ দেওয়াটা যে শুধু ব্যর্থ তাই নয়, ছেলেদের পক্ষে তা বিশেষ ক্ষতিকর। ওতে শুধু একটা নতুন দুর্নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তার নাম হচ্ছে "নৈতিক জ্যাঠামি।" এঁদের মতে নৈতিক জীবনের মূলে আছে Collective sense,—অর্থাৎ সেই জ্ঞান, যার ফলে প্রতি লোক নিজেকে সমাজদেহের একটি অঙ্গ বলে মনে করে। এবং যে উপায়ে এই জ্ঞান, এই অনুভূতি বাড়ানো যেতে পারে, সেই উপায়ই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার যথার্থ উপায়;—বক্তৃতা নয়, নীতিপাঠ নয়, মারপিট নয়। এই সব খেলার ভিতর দিয়ে ছেলেরা নিয়মের মাহাত্ম্য বুঝতে শেখে, দশজনের সঙ্গে একাত্ম হতে শেখে, কার্য্য উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে শেখে। অতএব ফুটবল প্রভৃতি খেলা সকল ছেলেরই শুধু দেহের নয়, আত্মার উন্নতি লাভের জন্য খেলা কর্ত্তব্য। আইন মুখস্থ করতে নয়, স্বেচ্ছায় মানতে শেখবার সূত্রপাত ঐ খেলার মাঠেই হয়।

(১০)

খেলার পর আসে দৌড়ঝাঁপ—ইংরাজিতে যাকে বলে sports। খেলার সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, শরীরের এক একটি বিশেষ ক্রিয়ার এই উপায়ে অনুশীলন করা হয়। দৌড়নো লাফানো সকল খেলারই অঙ্গ, কিন্তু কি দৌড় কি লাফ কোনও খেলারই একমাত্র অথবা মুখ্য

কর্ম্ম নয়। খেলাতে দেহের সকল শক্তির একত্রে প্রয়োগ দরকার। কিন্তু sports-এর উদ্দেশ্য, দৌড়বার শক্তি লাফাবার শক্তি প্রভৃতিকে আলাদা করে নিয়ে, সেই শক্তিকে বিশেষ করে বাড়িয়ে তোলা। এতে শরীরের যে শুধু এক একটা বিশেষ ক্ষমতা বেড়ে ওঠে তাই নয়, এতে ছেলেদের সাহসও বাড়ে। এর শিক্ষা হচ্ছে দেহের শক্তির সীমা উত্তরোত্তর অতিক্রম করবার শিক্ষা। সুতরাং এ শিক্ষার ভিতর পদে পদে বিপদ আছে। এই বিপদকে উপেক্ষা করতে শেখবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সাহস আপনাহতেই বেড়ে যায়। সুতরাং sports ছেলেদের শরীর মন দুই একসঙ্গে গড়ে তোলে। নব-বিদ্যালয়ে চৌদ্দ বছরের নীচে ছেলেদের sports শিখতে দেওয়া হয় না। এ কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত, কেননা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের আর তর সয় না—সে শিক্ষা শরীরেরই হোক্ আর মনেরই হোক্।

(১১)

সব শেষে আসে ব্যায়াম শিক্ষা। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে বলিষ্ঠ করা, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেহটাকে শক্তিশালী করা। একালের ব্যায়াম হচ্ছে পূরোমাত্রায় বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ তা দেহের বিশেষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকালের ব্যায়াম অনেক স্থলে মারাত্মক হত—কেননা কোনও একটা বিশেষ অঙ্গের মাংস বাড়াতে এবং পেশি ফোলাতে গিয়ে, অনেক স্থলে সমস্ত দেহটাকে একেবারে অথম করে ফেলা হত। অবৈজ্ঞানিক

ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে, অনেকে লাভের মধ্যে হৃদ্‌রোগ শ্বাসরোগ প্রভৃতি অর্জ্জন কর্‌তেন। সমুদয়ের সঙ্গে অবয়বের যোগ যে কতটা ঘনিষ্ঠ, এবং সে যোগসূত্র যে প্রাণ—এই জ্ঞানের অভাববশতঃই পালোয়ানেরা হয় স্বল্পায়ু, আর বাজিকরেরা পঙ্গু। Horizontal Bar-য়ে পাক খেয়ে খেয়ে শরীর যে দড়ি পাকিয়ে যায়, আর Parallel Bar-য়ে পালায় পালায় "ফড়িং" ও "ময়ুর"-বৃত্তির সাধনা করে, তীরের মত শরীর যে ধনুকের মত হয়ে যায়, এ আমার চোখে দেখা। বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামের চর্চ্চায় অষ্টাবক্র হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ ব্যায়ামের প্রকরণপদ্ধতি সব Ling, Muller এবং Hebert-এর বইয়ে দেখতে পাবেন। সংক্ষেপে, যে ব্যায়ামকে Swedish Drill বলা হয়—সে হচ্ছে Ling-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। Muller এবং Hebert তারই সংশোধিত সংস্করণ বার করেছেন। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—সুতরাং এ ক্ষেত্রে বেশী বাক্যব্যয় করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অনধিকারচর্চ্চা। তবে এই ব্যায়াম শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। নব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে, এর শিক্ষক হওয়া উচিত ডাক্তার। প্রথমতঃ, এতে প্রাণায়াম আছে; আর গুরুর অসাক্ষাতে প্রাণায়াম কর্‌লে যে মুখে রক্ত ওঠে, তার প্রমাণ আমার জানত অনেক ভদ্রসন্তান যোগ অভ্যাস কর্‌তে গিয়ে পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এর ক্রিয়াগুলি নিতান্ত নীরস, কেননা এ খেলা নয়—পুরোদস্তুর শিক্ষা। নীরস বলে এ ব্যায়াম বিরক্তিকর হবার সম্ভাবনা, সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে এর প্রতি ক্রিয়ার সার্থকতা আগে থাক্‌তে ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। হাত-পা পাগলের মত উল্টোপাল্টাভাবে কেন নাড়ছি, তার অর্থ বুঝলে

সে হাত পা মানুষে মনের খুসিতে নাড়ে। ব্যায়ামটা পুরোপুরি শরীরের শিক্ষা হলেও—ঐ সঙ্গে শরীর-বিজ্ঞানেরও মোটামুটি কথা নব-বিদ্যালয়ের ছেলেরা শেখে। অধ্যাপক ফারিয়ার মতে খেলাধূলো, দৌড়ঝাঁপ, ব্যায়াম, প্রাণায়াম সবই খালি গায়ে করা কর্ত্তব্য। এর সার্থকতা যে কি, তা আমি বল্‌তে পারিনে, ডাক্তারে বল্‌তে পারেন। তবে এ গরম দেশে দেহমুক্ত কর্‌লে আমরা যে মুক্তিলাভ করি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

(১২)

ছেলেদের হাতের কাজ শেখানো যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ, এই হচ্ছে একালের শিক্ষা-বৈজ্ঞানিকদের একটা পাকা মত। নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের মূর্ত্তি গড়্‌তে, নক্সা আঁক্‌তে, বই বাঁধতে, বেত বুন্‌তে, কামার কুমোর ও ছুতোরের কাজ কর্‌তে শেখানো হয়। অধ্যাপক ফারিয়া বলেন, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের কামার কুমোর ছুতোর প্রভৃতি বানানো নয়। তাঁর মতে এ সব শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সক্ষম ও সক্রিয় করা। কর্ম্মের প্রবৃত্তি ছোট ছেলের দেহ ও মনে অতিমাত্রায় থাকে। তারা একটা কিছু না করে, দু'দণ্ড স্থির থাক্‌তে পারে না। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সুপথে চালানো শিক্ষকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এ সব কাজে হাত দিয়ে ছেলেরা যে শুধু আনন্দ পায় তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা যে হস্তকৌশল লাভ করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার যথেষ্ট প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব কাজের চর্চ্চায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ চর্চ্চা হয়।

এর ফলে তাদের নিরীক্ষণ করবার শক্তি, তুলনা করবার শক্তি, কল্পনা শক্তি, গড়বার শক্তি, রূপজ্ঞান, আকারের জ্ঞান, পরিমাণের জ্ঞান, মাত্রার জ্ঞান, সংখ্যার জ্ঞান, পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক ফারিয়া বলেন যে, শিশুদের অবশ্য ও সব কাজ শেখানো যায় না, সুতরাং তাদের কাদা দিয়ে আল বাঁধতে, ঘর তৈরি করতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। সে ঘর তারা ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গবে ও গড়্‌বে—কেননা শিশুমাত্রেই অব্যবস্থিতচিত্ত। এ চিত্তকে ব্যবস্থিত করবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ, তেমনি ক্ষতিকর, কেননা এই সব বিরোধী মনোভাবের সংঘর্ষেই তাদের আত্মার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। যাঁরা ছোট-ছেলেদের এই ধুলোমাটির সংস্রব হতে আলগোছ করে, ভদ্রলোক করতে চান, অধ্যাপক ফারিয়া তাঁদের একটা সত্য স্মরণ রাখ্‌তে বলেন। সে হচ্ছে এই যে, এ পৃথিবীতে মাটি আর জল হচ্ছে ছোট ছেলের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। সুতরাং তাদের জল না ছুঁতে দিলে, ধুলো না নাড়্‌তে দিলে, ও দুয়ে মিলিয়ে কাদা না করতে দিলে, প্রিয়বস্তুর বিরহে তারা শরীর-মনে শুকিয়ে যায়। এ স্থলে বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এ পৃথিবীতে মাটি ও জলের চাইতে মহামূল্য বস্তু আর কি আছে? মানুষের সকল কর্ম্মের মূল উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি আর অপ্‌, সুতরাং শিশুরা এ পৃথিবীতে এসে প্রথমে তারই পরিচয় লাভ করতে ব্রতী হয়। ঐখান থেকেই তাদের জীবনব্রত-উদযাপনের সুরু হয়।

(১৩)

নব-বিস্তালয়ের ছেলেদের কৃষিকর্ম্মও শেখানো হয়। মানুষের আদিম কর্ম্মক্ষেত্র, কৃষকের ক্ষেত্র,—শিল্প-জীবির কারখানা নয়। সুতরাং

ছেলেদের কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে, তাদের অল্প-বিস্তর কৃষিকর্ম্ম শেখানোও দরকার। লাঙ্গল চষলে, কোদাল পাড়লে শরীর যে বলিষ্ঠ হয়, সে কথা বলা বাহুল্য; সুতরাং এ অধ্যবসায়ে মন ও চরিত্রের কি উপকার হয়, সংক্ষেপে তারই উল্লেখ করছি।

কারখানায় আমরা জড়-পদার্থ নিয়ে কারবার করি, কিন্তু মাঠে আমাদের সজীব পদার্থের সঙ্গে কারবার করতে হয়। বীজ বোনা থেকে ধান পাকা পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটা জীবনের অভিনয় চলে। জীব-তত্ত্বের প্রথম অধ্যায় মানুষে ঐ শস্য-ক্ষেত্রেই পাঠ করতে পারে। এই সূত্রে আমরা যে জীবনের ক্রমবিকাশের জ্ঞানলাভ করি, শুধু তাই নয়,—সেই সঙ্গে সে জীবন যে আমরা রক্ষা করতে পারি, সংশোধিত করতে পারি, পরিবর্দ্ধিত করতে পারি, সে জ্ঞানও লাভ করি; এক কথায় এই সূত্রে আমরা আত্মজ্ঞানও লাভ করি।

তার পর মাঠে কাজ করবার দরুণ, ছেলেরা নানা গাছপালা ফুল ফল কীট পতঙ্গ জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে। শুধু তাদের আকৃতি নয়, তাদের প্রকৃতিরও পরিচয় পায়। এই উপায়ে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিনের পর দিন পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই তাদের কেতাবি বিজ্ঞানের শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গাছপালা জীবজন্তুর সঙ্গে যে ছেলের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে—বটানি, জুওলজির কথা তার কাছে আর শুধু বইয়ের কথা নয়—জীবনের কথা।

কৃষি-কর্ম্মের আর একটি মহৎ ফল এই যে, ছেলেরা হাতেকলমে ও-কাজ করলে বড় বয়েসে কৃষি-জীবিদের প্রতি আর অবজ্ঞা করে না। অলস ভদ্রসন্তানেরা নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের যে অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার প্রধান কারণ যে, কৃষিকার্য্যের ভিতর যে কি মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব

আছে, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে ছেলে ও-কাজ নিজে হাতে করতে চেষ্টা করেছে, সে ছেলে চিরজীবন কৃষি-জীবিদের মনে মনে শ্রদ্ধা করবে। সামাজিক হিসেবে এও একটা কম লাভ নয়। আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে শরীর ছেড়ে মনের শিক্ষার নবপদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যাবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দু-দু-বার।

ছেলেবেলায় খিড়কী পুকুরের ঘাটের পাশে পাঁশগাদায় যে সব কচুগাছ জন্মাত তারি কচিপাতা ছিঁড়ে পুকুরের জলে চুবিয়ে নিয়ে যখন দেখতুম তার উপরে জলের দাগ একটুও ধরেনি তখন ভারী আনন্দ হোতো; কিন্তু বিবাহিত-জীবনের পানাপুকুরের মধ্যে মনটাকে দু-দুবার চুবিয়ে ধরেও আজ এই ৬০ বৎসর বয়সে তাকে ডেঙ্গায় তুলে নিয়ে যখন দেখি তার উপরে উক্ত জীবনের একটুও দাগ লেগে নেই, তখন ঠিক ছেলেবেলাকার মত আনন্দ হয় কিনা বলতে পারি না।

আমার বয়স আজ ৬০ কি তার চেয়েও দু এক বছর বেশী হবে কিন্তু এখনও আমি নিজেকে যুবা বলে মনে করি। এই কথা আমি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বলেছিলুম, তিনি ত হেসেই খুন, তারপর হাসির বেগটা একটু থামলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কেমন করে হতে পারে?" এই কি করে হতে পারার জবাব দেওয়াটাই শক্ত। আজও পাঠককে যে এর জবাব দিতে পারবো বলে ত মনে হয় না তবে গল্পটী শেষ অবধি পড়ে তাঁরা যদি আপনা হতে এর জবাব পেয়ে যান ত ভালই—নচেৎ নাচার।

আমার প্রথমবার বিবাহ হয় গ্রামের মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হরকালিবাবুর প্রথমা কন্যা নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে। ছেলে-বেলা থেকেই বিবাহ না করাটার উপর আমার কেমন একটা ঝোঁক

ছিল আর এই ঝোঁকটার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে পারা যায় ত সে আমাদের গ্রাম্য-ইংরেজী স্কুলের নব্য-হেডমাষ্টার মশাই রমেশ বাবুকে। তিনি উক্ত জিনিসটার উপর কেন যে এত খড়্গহস্ত ছিলেন তা তিনিই জানতেন, তবে এর অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলতেন তা থেকে এইটুকু বোঝা যেতো যে তাঁর মতে ও-জিনিসটা মানুষের স্বাধীনতার মূলে খুব জবর গোচের একটা ঘা দেয় আর সেই ঘা মানুষের পা দুটোকে একবারে জন্মের মত খোঁড়া করে দেয়—তার চলবার শক্তি একবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কথাটা আর কারুর মনের উপর ছাপ কাটতে পেরিছিল কিনা জানি না তবে আমার মনের উপর যে একবারে কোঁদাই কেটে দিয়েছিল সে কথা জোর করেই বলতে পারি। যখন নিজের স্বাধীনতাকে বাঁচাবার জন্যে তার চারিদিকে নানারূপ সংকল্পের পরিখা ও প্রাকার তৈরি করছি সেই সময় দিগ্বিজয়ী বীরের মত মা তাঁর সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে একবারে সিংহদ্বারের সুমুখে এসে হাজির।

এই কথা নিয়ে মার সঙ্গে প্রায়ই আমার গোল বাধতো কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই ডিক্রী পায় নি। সেদিনও মার সঙ্গে আমার ঐ একই কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছিল মাঝখানে হঠাৎ আমি বলে উঠলুম, "দেখ মা, আমি যখন বলেছি বিয়ে করব না তখন কখনই করব না তা তুমি কাঁদ কাট আর যাই করনা কেন।"

এই ব্যাপারের কিছুদিন পর একদিন বৈকালে বাইরে বেরুবার জন্যে কাপড় ছাড়ছি এমন সময় বাবা এসে হাজির—"দেখ নিরু আজ আর বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই হরকালি বাবুরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

বাবা ছিলেন সেই দলের লোক যারা যুক্তির চাইতে জিদ্‌কেই বড় আসন দেয়। জিদ্‌ জিনিষটা তবেই নাকি দাঁড়াতে পারে যদি তার বিপক্ষতাচরণ করবার মত জিনিস সে পায়—নইলে তার অস্তিত্বই যে থাকে না। কিন্তু এটা ত আর কেউ আশা করতে পারে না যে পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসটাই তাঁদের মতের সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে ঘুসোঘুসি করবে, কাজেই জিদ্‌কে তার কাজ করবার অবসর দেবার জন্যে এই সব লোককে অনেক সময় করতে হয় কিনা, যেখানে নিজের মতের সঙ্গে পরের মতের মিল রয়েছে সেখানে পরের মতকে না উল্টোতে পেরে নিজের মতকেই ধাঁ করে উল্টে নিয়ে জিদ্‌কে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

আমার বিবাহের জন্যে বাবার কোন দিন একটুও গা দেখিনি বরং বরাবর এলাকাড়াই লক্ষ্য করে এসেছি, আজ হঠাৎ আমার বিয়ের জন্যে তাঁর মাথাব্যথা দেখে আমি প্রথমটা কিছু অবাক হয়ে গেছলুম কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলুম মারই জয় হোলো; আমার অত সতর্কতা সত্বেও দুর্গের কোন্‌ এক গুপ্তদ্বার আবিষ্কার করে ফেলে বিজয়ী বীর যেদিন সত্য সত্যই আমার দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করলে, সেদিন তার হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমি দ্বিতীয় উপায় দেখলুম না।

আমরা যেটাকে চাই না সেটার সম্বন্ধে বেশী চিন্তাও করি না আর আমরা যেটাকে নিয়ে বেশী চিন্তা করি না—সেটার আবির্ভাব যত নূতনত্ব, যত মোহ এনে দেয়; আমরা আগে থেকেই যেটাকে মনে মনে এঁচে রেখে দিই তার আবির্ভাব ততটা মোহ বা ততটা নূতনত্ব এনে দিতে পারে না। আমি বিবাহ করব

না বলেই হোক বা যে কারণেই হোক স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কোনদিন বিশেষ কোন ধারণা আনবার চেষ্টা করিনি, যা নাকি শতকরা নিরেনব্বই জন করে থাকে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে। তাই একটি ১১ বৎসরের সুগোল, সুন্দর ছোট মেয়ে তার পা-ভরা আলতা আর সিঁতে-ভরা সিঁদুর নিয়ে আমার একলা শোয়া খাটের একটি ধারে সমস্ত দেহটা কাপড়ে আর লজ্জায় ঢেকে নিয়ে যেদিন প্রথম শয়ন করতে এল, সেদিন সমস্ত দেহটা কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল একটা অভুতপূর্ব্ব অব্যক্ত পুলকভরে।

আমার বিবাহের মধ্যে একটুখানি নূতনত্ব ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, বাবা কন্যাপক্ষের কাছ থেকে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নি। লোকে এ সম্বন্ধে কিছু বল্লেই তিনি বলতেন "দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ টাকার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।" পাড়ার লোকে কিন্তু বাবার উপর অত্যন্ত চটে উঠেছিল—তাঁদের মতে এ কাজটা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল কেননা এতে করে পাত্রের বাজার নেবে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট।

সবের মধ্যে থেকেই মানুষ নিজের জন্যে খানিকটা সান্ত্বনা খুঁজে নেয়—তা না হলে সে বাঁচতে পারে না। যেখানে সত্যি সান্ত্বনা নেই সেখানেও তারা কোন না কোন উপায়ে একটা সান্ত্বনার খুঁটি খাড়া করে তোলে, তাকে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে, তা না হলে সে যে মুখ থুবড়ে পড়বে। আমিও তাই করলুম। এই এত বড় একটা সঙ্কল্পের বাঁধ যেদিন বাবারূপ ভাগ্য-দেবতার একটি তর্জ্জনী হেলনে নদীর বালুচরের মত ধস্ ভেঙ্গে পড়ল, সেদিন নৈরাশ্যের সেই কূলহারা অনন্ত জলরাশির মধ্যে সান্ত্বনার একটা তক্তা যদি খুঁজে

পাই তারি জন্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম; পেতে বেশী দেরী হোলো না; বিনাপণে বিবাহ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের দায়োদ্ধার—এই ত ভেসে যাবার মত তক্তা রয়েছে! আমি ডুবলুম না।

দরিদ্রের দায়োদ্ধার, এটা কম সান্ত্বনা নয়! এই চিন্তাটাকে জপমালা করে চোক কান বুজে বিয়ে করে ফেললুম। এতে ফল হোলো এই যে, স্ত্রী সম্বন্ধে মনে মনে কোন ছবি আঁকতে গেলেই আমি সেই সব রং আর সেই সব রেখাগুলোই কেবল তার মুখে বিশেষ করে ফলিয়ে তুলতুম, যেগুলো তার মনের কৃতজ্ঞতাকেই কেবল মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারে—আর কোন ভাবকে নয়। সে যে চিরকাল আমার কাছে কেনা হয়ে থাকবে, আর তার বাপের প্রতি আমাদের দয়ার কথা ভেবে আমাকে দেবতার মত করে পূজা করবে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে, স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে গেলেই এই কথাটাই প্রথমে মনের মধ্যে বেজে উঠতো। এমনি ধারণা নিয়ে নীরদাকে ঘরে এনে তুললুম, আর অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে তার সঙ্গে এমন ভাবে মিশতে লাগলুম, যাতে তার এই ধ্যান-মাধুরী কোন দিন না ভেঙ্গে যেতে পারে। আমার প্রত্যেক ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা ভাব থাকতো যা নাকি কেবল তার মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার যে অংশটা আছে তাকেই নাড়া দিতে পারে—আর কিছুকেই নয়।

নীরদা মেয়েটি যে কেমন তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় তার মধ্যে নিজস্ব বলে কিছু ছিল না বা তাকে নিজস্ব কিছু সঞ্চয় করতে দেওয়া হয় নি, তার বাপের বাড়ীর তরফ থেকে। বাপের বাড়ীর পক্ষে এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই। মেয়েদের যদি কোন একটা দিক থেকে

গোড়ে তোলা হয় তাহলে ত আর ভাঙ্গবার জো থাকে না, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তাদের নিজেকে ভেঙ্গে একবারে চুরমার করে ফেলবার দরকার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তাদের যদি কেবল তাগাড় আর ইট্ সুরকীর মত বেতৈরী অবস্থাতে ফেলে রাখা হয় তাহলে সে-গুলোকে এক করে নিয়ে তাদের দিয়ে নূতন ইমারত বেশ সহজে তৈরী করে তুলতে পারা যায়, শ্বশুরবাড়ীর ইঞ্জিনিয়ারের নির্দ্দেশ মত। মোট কথা আম তাকে গড়ে তোলবার মত বেতৈরী অবস্থাতেই পেয়েছিলাম আর তৈরী করতেও কসুর করি নি।

আমার দেবতা হবার সাধ, সে খুব মিটিয়েছিল তার কৃতজ্ঞতার অঞ্জলী ক্রমাগতক তার উপকারকের চরণে উৎসর্গ করে।

পুতুল নাচের পুতুলগুলো যেমন তাদের হাত পা ততক্ষণই নাড়তে পারে যতক্ষণ পিছন থেকে একজন সে গুলোকে নড়িয়ে দেয়, নীরদার জীবনটা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। তার নিজের ইচ্ছা বলে কোন বালাই ছিল না—আমার সম্বন্ধেও নয়।

আমার বোধ হয়, যৌবন তার নিজের গুরুভারে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে খোঁজে এমন একজনকে যার উপর নিজের দায়িত্বের বোঝা খানিকটা চাপিয়ে দিয়ে সে নিজে কতক হাল্কা হতে পারে—তা না হলে সে নিজের চাপে নিজেই মাটির সঙ্গে বসে যাবে যে।

দেবতা হবার সাধ যেদিন মিটলো তার নূতনত্বের চটক্ যে-দিন গিল্টিকরা মরা সোণার মত দিন দিন ম্লান হয়ে আস্‌তে লাগলো সে-দিন বুঝলুম সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে আমার পাণ-দোষটা ধরেছিল। আমার বোধ হয় মানুষের প্রবৃত্তিগুলো এমন ভাবে সাজান থাকে যে

একটা অন্যগুলোর পথ আটকে রেখে দেয়, কাজেই একটা যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে ত অন্য যে-গুলো তাকে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলোও টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। যেদিন প্রথম সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল সেদিন থেকে এইটেই আমি বরাবর লক্ষ করে আসছি যে একে একে অনেকগুলো সংযমই তার সঙ্গে আলগা হয়ে আসছে।

আমি যে মদ খেতে সুরু করেছি এ কথাটা বাবা এবং মা'র কাছে যথাসম্ভব লুকোবার চেষ্টা করতুম কিন্তু নীরদার কাছে কোন দিন সাবধান হই নি বা সাবধান হবার কোন দরকার বোধ করি নি। এতে যে তার কিছু মনে করবার আছে একথা কোন দিন মনেই আসে নি। হাজার হোক্ আমি স্বামী আর সে স্ত্রী।

লোকে কথায় বলে অন্যায় কখন চাপা থাকে না—আমার অন্যায়ও বেশী দিন চাপা রইল না—পাড়াময় কানাঘুসো হয়ে গেল!

সে-দিন সন্ধ্যার সময় কি একটা কাজে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলুম, বারান্দা থেকে শুন্‌তে পেলুম ঘরের ভিতর ওবাড়ীর টেপী নীরদাকে বল্‌ছে—

"তা তুই যদি এতদিন টের পেয়েছিস ত বারণ করিস নি কেন? ধন্যি মেয়ে যা হোক তুই।"

"তা নাকি আবার বারণ করা যায়।"

"কেন যায় না, আমরা হলে ত বকে ঝোকে অন্নাথ্য করতুম আর তুই বারণ করতে পারবি নি।"

"না তা পারবো না।"

"সে কি রে, তা না হলে দিন দিন যে বেড়ে উঠবে।"

"তা কি করবো ? আমার কোন কথা বলা কি উচিত ? আমি মেয়ে মানুষ ভালমন্দ কি বুঝি বল।"

"মদ খাওয়াটা ভাল কি মন্দ তা তুই বুঝিস নে ; এ নূতন কথা বটে।"

কি জানি কেন নীরদার কথাগুলো সে-দিন তত ভাল লাগলো না। যেটাকে এতদিন খাঁটী ভক্তির সুর বলে মনে হোতো, আজ কি জানি কেন তার মধ্যে নিরপেক্ষতার সুর মিশ্র হয়ে রয়েছে বলে কানে বাজতে লাগলো।

এই ঘটনার কিছু দিন পর এক দিন কোন দরকারে সুরেশবাবুদের বাড়ীতে তাঁকে ডাকতে গেছি—ইনি আমাদের ওখানের একজন পুরাণো উকিল। ইনিই আমাকে সুরাদেবীর মন্দিরের স্বর্ণদ্বার দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন। সুরেশবাবুদের বাড়ীতে প্রবেশ করেই উঠান থেকে শুনতে পেলুম সুরেশবাবুর স্ত্রী তীব্র-স্বরে বলছেন—"দেখ অমন করে যদি ঢলাঢলি কর ত আমি সংসার করতে পারবো না ; ভেবে দেখ দেখি কি ছিলে আর কি হয়েছ ; লোকে তোমাকে কত ভাল বলত, কত সুখ্যাতি করত আর এখন কি হয়েছ। তারপর মেয়েটা দিন দিন কলা গাছের মত বেড়ে উঠছে সেটা কি চোখ মেলে একবার দেখেছ। সংসারের খরচ দিন দিন কত বেড়ে উঠছে সে খবরটা কি রাখ ? অমন করে নবাবি করলে শেষকালে ছেলেগুলোর হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যে।"

এক একটা লোক থাকে তাদের গলা বেশ মিঠে কিন্তু আগাগোড়া বে-সুরা। এই সব লোকের গান ততক্ষণই ভাল লাগে যতক্ষণ না কোন যন্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেওয়া হয়। নীরদার ব্যবহারের

মধ্যে মিষ্টতা ছিল বটে কিন্তু তার মধ্যে সুর ছিল না আদবেই, তাই আজ যখন সুরেশবাবুর স্ত্রীর এই সুরে-বসান যন্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিলুম তখন তা খাপছাড়া বলে মনে হতে লাগলো। কথাগুলো তীব্র বটে কিন্তু কেমন সুর রয়েছে, কেমন রেশওয়ালা আর নীরদার সেদিনকার কথাগুলো নরম বটে কিন্তু কত বেসুরা কত ফাঁফা। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অভাবের বেদনা বেজে উঠলো। এইটেকেই যে আমি খুঁজে আসছি। এইটেকেই যৌবন যে তার সুদৃঢ় বাহু দুটোকে বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়িয়েছে এতদিন ধরে, আর এইটেকে পায় নি বলেই যে তার যত অবসাদ যত বৈরাগ্য।

বাড়ী ফিরলুম—রাত্রে নীরদা এসে যখন তার নির্দ্দিস্ট জায়গাটি দখল করে শুলো তখন মধ্যের ব্যাবধানটা চোখের সুমুখে সহসা যেন যোজন-ব্যাপী হয়ে দাঁড়ালো। এ যে অনেক দূরের জিনিস, এ যে দু'কুল হারা নদীর পরপারের ঝাপসা গাছপালা; ঘাটে তরীও ত নেই যে সেগুলোকে নিকটের জিনিস করে নিই।—আবেগ ভরে ডাকলুম—"নীরদা"।

সেই দূর থেকে—অনেক দূর থেকে এলোমেলো বাতাসে ভাসা আবছা উত্তর "কেন" ?

"কেন নয় নীরদা আরো বড় করে উত্তর দাও।"

নীরদা নীরব।

"আমি মদ খেয়েছি, তুমি বকবে না নীরদা !"

"কেন বোকবো ?"

"কেন বোকবে ?" তোমার স্বামী উচ্ছন্ন যাবে আর তুমি তাকে

বোকবে না, তাকে বারণ করবে না, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে না ? কথা কও না যে !"

"আমি কি বলবো ?".

আমার কান্না পেতে লাগলো কোন কথা বল্‌লুম না—বুঝলুম আর ফেরাবার উপায় নেই। নিজেই আমি তাকে দূর করে দিয়েছি নিজেই আমি তার এবং আমার মাঝখানে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে তুলেছি যা ডিঙিয়ে আসার মত ক্ষমতা তার আদবেই নেই।

এমনি করে এই দূরের জিনিষটিকে কাছে আনবার ব্যর্থ চেষ্টার বিড়ম্বনার ফাঁক দিয়ে আরও দশ বার বৎসর গলে চলে গেল। তারপর কি জানি কার ইসারায় এই দূরের জিনিসটি সহসা একদিন এত দূরে চলে গেল যে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর খুজে পাওয়া গেল না।

নীরদা চলে যেতে সমস্ত শরীরটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলুম কোন খানটায় সে তার অভাব রেখে গেছে। বুকে হাত দিলুম ; না সেখানে ত কোন নূতন অভাব নেই ; মাথায় হাত দিলুম—সেখানেও তাই, কিন্তু পায়ে হাত দিতে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল ; এই খানেই যে সে তার সমস্ত অভাব রেখে গেছে। পা-টেপবার লোকের অভাবই ত সে তার চলে যাবার পথের মধ্যে রেখে গেছে। বুকে হাত বুলোবার অভাব পূরণ করবার জন্যে সে আসে নি, তাই সেখানটার আভাব আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনিই রয়ে গেছে একটুও এদিক ওদিক হয়নি।

আমার জীবনে এই প্রথম যৌবনারম্ভ। এই প্রথম যৌবন তার রত্নসিংহাসন বুকের মাঝখানে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে কোথা হতে ধূপ ধূনা জ্বলে উঠলো এক জনকে বরণ করে নেবার জন্যে সেই মসনদের কিংখাপের উপর।

বলতে ভুলে গেছি—ইতিমধ্যে বাবা স্বর্গারোহণ করেছেন।

মা আবার নূতন করে কনের সন্ধান আরম্ভ করে দিলেন তাঁর ৫০ বৎসরের তরুণ ছেলেটির জন্য, আর তাঁর ৫০ বৎসরের তরুণ ছেলেটি চুপ করে থেকে তার সম্মতি জানিয়ে দিলে তরুণ ছেলেটিরই মত করে।

ফুলশয্যার রাত্রেই ষোড়শী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি আমাকে ভালবাস।" কথাটা বড়ই অসংলগ্ন হয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু আমি নাচার। কমলা উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"!

দিন কাটতে লাগলো; এবার মনে মনে স্থির করেছিলুম পা-টাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখবো, যাতে এবার আর সে পা দেখতে না পায় কিন্তু এটা তখন বুদ্ধিতে আসে নি যে, পা বাদ দিলেও বুক ছাড়া অন্য আরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যার উপর মানুষ খুব স্বচ্ছন্দে চড়ে বসতে পারে। কমলা পা দেখতে পায় নি সন্দেহ নেই কিন্তু সে বুক'ও দেখতে পায় নি, সে দেখে ফেলেছিল কেবল পাকাচুলে ভরা গোল মাথাটা আর সেইখানেই সে তার চিরদিনের আসন খানি টেনে নিয়ে গিয়ে খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়ে দিয়েছিল। এক কথায় দোজ-পক্ষের পরিবার যেমন হয়ে থাকে কমলা তার চেয়ে একটু কমও হয় নি একটু বেশীও হয় নি।

নেশা করার দরুণ পায়ের তরফ থেকে নীরদা কোন কথা বলতে সাহসই করে নি আর মাথার তরফ থেকে কমলা যা বলেছিল তার বিষ তার নিজের রাজত্ব থেকে আরম্ভ করে নীরদার রাজত্ব পর্য্যন্ত চারিয়ে গেছ্‌লো। কিছু-না-বলার ভিতর দিয়ে নীরদা নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—আর কমলা যা বলেছিল তার তীব্রতা আমাকেই দূর করে দিয়েছিল তার কাছ থেকে, বড়লোকের দরোয়ানের মত করে।

এমনি করে এই চড়া মনিবের হাতে আমাকে ১০টি বৎসর পূরা-দমে থাকতে হয়েছিল নীরবে সমস্ত সহ্য করে। তারপর সেও একদিন চলে গেল অভাব রেখে দিয়ে মাথার উপরটাতে। সেখানটা সত্য সত্যই তার অভাবে বড় খালি খালি ঠেকতে লাগলো। অনেক দিন কয়েদের মধ্যে থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে কয়েদীর যে অবস্থা হয় এও অনেকটা সেই রকম।

আজও যৌবনের রত্নসিংহাসন তেমনি করেই খালি হয়ে পড়ে রয়েছে দেবীর অভাবে। ধূপ ধূনা দিনের পর দিন কেবল ছাই হয়েই মরছে সিংহাসনের চারিদিকে তার কুণ্ডলিকৃত সুগন্ধী ধুমরাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। ঘণ্টা বাজছে, আরতী-প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। পুষ্প-সম্ভার পুষ্পপাত্রে উন্মুখ হয়ে রয়েছে কার চরণ স্পর্শের মানসে।

পায়ের সেবা আমার হয়ে গেছে—মাথার সেবাও মন্দ হয় নি কিন্তু বুকের সেবা আজও বাকী রয়েছে। হুকুম করবার সাধ আমার মিটেছে; হুকুম তামিল করবার সখও পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু আব্দার শোনবার সাধ আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

কালো-মেয়ে।

——ঃ০ঃ——

মর্‌চে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুক্‌নো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে' ক্রমে
বয়স উঠ্‌চে জমে'।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবস রাত্রি কালো মেয়েটিরে।

সাম্‌নে বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি "মেস্"-এ ;
বহুকষ্টে শেষে
কালেজেতে পার হয়েচি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন করে' এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে ?
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েচি আধ্-পেটা।

ভিক্ষা করা সেটা
সইত না এক্-বারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাৎ পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্ত্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবী,
মনে ছিল ধন মানের রুদ্ধ ঘরের সোণার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।
আজ্‌কে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।

মনে হচ্চে ময়না পাখীর খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায়;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা ?
কোথায় মুক্ত অরণ্যানি, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরী ?
এ কি বাঁধন রাখ্‌ল আমায় ঘেরি ?

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোসে শুয়ে পড়ি ধপাস্ করে'।

হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ্ পড়ে যায় উপরেতে,—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো-মেয়ে নন্দরাণী।
মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা থম্‌কে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরাণ জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।

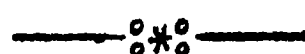
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন জুঁই ফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরণখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখী,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।
রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ।

সকাল সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা' ছিল মনে।

ঐ যে ওদের কালো-মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর ওর ঐ ভাঙা জান্‌লাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা ;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে ;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী ;
তেম্‌নি আমার বাঁশের বাঁশি আপনা-ভোলা,
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জান্‌লা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠ্‌ল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র্যাক্‌টিকাল।



ইংরেজি লেখকের বইতেই পড়েছি যে ইংরেজ ideaকে অবিশ্বাস করে থাকে—"The philosopher proceeds from the abstract to the concrete. The Englishman starts with the concrete and may or, more probably, may not arrive at the abstract.........he mistrusts education. For education teaches how to think in general and that isn't what he wants or believes in.........Hence his contempt and even indignation for individuals or nations who are moved by ideas. He cannot endure the profession that a man is moved by high motives ....The words "hypocrite" "humbug" "sentimentalist" spring readily to his lips.........for intellect he has little use, except so for as it issues in practical results. He will forgive a man for being intelligent if he makes a fortune but hardly otherwise"—অর্থাৎ ইংরেজরা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে, প্র্যাক্‌টিকাল জাত। দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত সহবাসের ফলে practical এবং efficient হবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জেগে উঠেছে। যদি ভীষণ কাজের

লোক হওয়াটা আমাদের একেবারে আদর্শ না হয়ে উঠ্‌ত তা হলে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না—কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে কাজ সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহটা তার স্বাভাবিক মাত্রা একেবারে পেরিয়ে গেছে। ইংরেজের কাছ থেকে কাজের অনেক গুণগান শুনে শুনে এবং অকেজো বলে অনেক খোঁটা খেয়ে খেয়ে ঐ কাজের লোক হওয়াটাই আমরা আমাদের চরম আদর্শ বলে ধরে নিয়েছি।

কিছু দিন পূর্ব্বে শিক্ষা-কমিশন যখন এদেশের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের মতামত চেয়েছিলেন তখন শিক্ষার আদর্শ অর্থাৎ জাতীয় আদর্শ যে কি হওয়া উচিত, সে বিষয় আমাদের চিন্তা করতে হয়েছিল। এ কথা গোপন করা অসম্ভব যে তাতে আমরা বেশ একটু বিপন্ন বোধ করেছিলুম, কারণ বহুকাল ধরে অন্ন ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না করাতে, চিন্তা করাটা আমাদের অনভ্যাস হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বই নির্ব্বাচন করেন, আমরা সে গুলো দাগ দিয়ে, নোট লিখিয়ে মুখস্থের জন্য তৈরী করে দি। Shakespeare সম্বন্ধে Dowden কি চিন্তা করেন, Raleigh কি বলেন, Hazlitt কি বলেন, আবার আমাদের "An Experienced Professor"ই বা কি লেখেন, এই সব দেখে শুনে যা হোক একটা নোট লেখাই। Cowper পড়াই—Sofa কবিতার বিশেষত্ব কি তা বোঝাই, John Gilpin-এর রসিকতা সম্বন্ধে এমন একটা নোট দি যা মুখস্থ করতে গিয়ে ছেলেদের মন করুণরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তারপরে মাসকাবারে মাইনে নিয়ে মেয়ের বিয়ের দেনার সুদটা শোধ করবার চেষ্টা করি। এমনি করে দেশের শিক্ষাকে বহন করে আমরা চলি—এর মধ্যে হঠাৎ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে Shakespeare

পড়াও কেন, Cowper পড়ে লাভ কি তখন ভেবে কুল পাই নে। তবু মনে একটা ক্ষীণ আশা থাকে যে পুরোনো নোট দেখলে Cowper's place in the English literature সম্বন্ধে একটা কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কৌতুহলী ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে শিক্ষার প্রয়োজন কি শিক্ষার আদর্শই বা কি, তখন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরোয় "প্রকৃত শিক্ষা যে কি মূল্যবান বস্তু তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, শিক্ষাই মানুষকে নিম্ন-প্রাণীদের সহিত পৃথক করাইয়া দেয় ইহা চোরে চুরি করিতে পারে না" ইত্যাদি। ছাত্রদের প্রবন্ধ সংশোধন করতে গিয়ে এ কথাটা এতবার বলেছি যে ও-কথাটা না বলে থাকা একটু কষ্টকর। কিন্তু শিক্ষা-কমিশনের মর্জ্জির কথা বলা যায় না তাঁরা হয়ত ঠিক এ রকম উত্তর চান নি এই সন্দেহে আমরা অন্য উত্তর দেওয়াই স্থির করলুম।

নিজেদের শিক্ষার কথা স্মরণ করে শিক্ষার উপর আমাদের কোনই শ্রদ্ধা ছিল না, তা ছাড়া দেখেছি যে শিক্ষার ফলে আর যাই হোক সকলের ভাগ্যে গাড়িঘোড়া চড়া চলে না। অতএব বল্লুম—আর কিচ্ছু নয়, আমাদের দেশে এই কাব্য সাহিত্যে দর্শন, abstract science, প্রভৃতি যা পড়ান হচ্ছিল তা বন্ধ করে দাও, ওতে কোন লাভই হয় না। এই সমস্ত স্কুল কলেজ উঠিয়ে দিয়ে কেবল technical college কর এবং সবাইকে জোর করে techenical science শেখাও দেশ খেয়ে বাঁচবে; কলকাতার বাড়ীওয়ালার তাগাদা সহ্য করতে হবে না এবং মেয়ে বিয়ে দিতে কষ্ট পাবে না। যাঁরা এই রকম উত্তর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বৈদান্তিক, দার্শনিক, সাহিত্যের অধ্যাপক, নীতিশিক্ষার উৎসাহী এবং মোটামুটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আছেন।

অধ্যাপকেরা শিক্ষার বিষয় যে দেশের ঠিক মনোভাবই প্রকাশ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

যেদিন ইয়োরোপ বাষ্প-দৈত্যটাকে বশ করবার মন্ত্র লাভ কর্‌লে, সেদিন এসিয়া পড়্‌ল একদম পিছিয়ে। আর ইয়োরোপের বাণিজ্য-তরীতে নীলসাগর ভরে গেল, দেশ দেশান্তর থেকে মণি মুক্তা সঞ্চয় করে ইয়োরোপের অধিবাসীরা তাদের মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করলে। তার শতঘ্নী কামান, তার দ্রব্য সম্ভার, তার রণতরী, তার আত্মশ্লাঘা, তার অসীম প্রতাপ আমাদের চমক লাগিয়ে দিল। আমরা ভাবলুম ইয়োরোপ যখন বাণিজ্য-লব্ধ অর্থ দ্বারা বড় হয়েছে অতএব আমরা যদি বড় হতে চাই তবে আমাদেরও ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে—ও ভিন্ন উপায় নাই। অতএব দূর করে দাও তোমার সাহিত্য, তোমার কাব্য, তোমার দর্শন। যাতে করে আমরা জাতকে জাত কামার কি তাঁতি হয়ে উঠতে পারি তাই কর।

এমনি করেই ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের মনকে বিগড়ে দিচ্ছে। খবরের কাগজে বক্তৃতায় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমাদের গর্ব্বের ত অন্ত নেই অথচ দেখি ভবিষ্যৎ আদর্শ স্থির করবার বেলায় সবাই বলেন রেখে দাও তোমার আধ্যাত্মিকতা, ওই করেই ত এই হয়েছে, এখন কি করে একদিন সমস্ত পৃথিবীর সকল বাজার আমরা একচেটে করব সেই কথা ভাব। সবাই বলছি দেশের লোককে কাজের লোক করে তুলতে হবে। এই ত দেখতে পাচ্ছি ব্যবসা শেখাবার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় নূতন আয়োজন করা স্থির করেছে। এই অর্থের প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্ত ব্যবসার প্রয়োজনকে আমি অবহেলা করছি না কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি পাট কেনাবেচার কৌশল শেখা উচ্চ শিক্ষার

একটা অঙ্গ না কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে তিসির ও ভুসির কিরূপ চাহিদা (demand) তাই জানা কি মনুষ্যত্ব লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন? আধ্যাত্মিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবেন খেতেই যদি না পেলে তবে বাঁচবে কি করে—আমি বলব খাওয়াটা আমি ভুলছি না এবং মানুষের পক্ষে ওটা ভোলাও সহজ নয়, কিন্তু যেটা ভোলা সহজ সেটা হচ্ছে এই যে আহার্য্য সঞ্চয়টাই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়।

বহুদিন হতে ইংরেজী শিখে আসছি এবং Shakespeare, Burke পড়ছি, হঠাৎ উপদেশ শুনলুম যে ওসব পড়া, সময়ের অপব্যয় মাত্র, ওতে কাজের কোন সুবিধাই হয় না। তার চেয়ে ইংরেজী বিশুদ্ধ ভাবে বলতে শিখলে চাকরী প্রভৃতির সুবিধা হত। অমনি দেখলুম সিনেটে প্রস্তাব হয়েছে যে, ইংরেজী বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য একটা ডিপ্লোমা দেওয়া হোক। সিণ্ডিকেট এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন এমন করে অনুভব করলেন এবং সাধারণ লোক-দের এ বিষয়ে এত অযোগ্য মনে করলেন যে, তাঁরা নিয়ম করলেন, গ্র্যাজুয়েট ভিন্ন অপর কেউ এ পরীক্ষা দিতে পারবে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বোধ করি এই বিশ্বাস যে, Photo বলতেই কোথায় accent দিতে হয় আর Photography বলতেই বা কোথায় দিতে হয়, এটা যে একটা বিশেষ বিদ্যা কেবল তা নয়—এ বিদ্যা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে কথা এই যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্ত্তাব্যক্তি এ পরীক্ষা দিয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত না করেন তবে খুব সম্ভবত দেশের লোক ও ডিপ্লোমায় মোহিত হবে না, কারণ ইংরাজি ভাষায় জবান-দুরস্ত করবার দিকে মানুষের মন আর নেই।

কিছুদিন হ'ল আমরা যখন প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভাবতে সুরু করেছিলাম তখন মনে করেছিলাম যে, দেশের লোককে খানিকটে chemistry botany, শিখিয়ে দিলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল culture নয় agriculture। কিন্তু মানুষ কি কেবল ফসল-উৎপাদনের ও কাপড়-তৈরীর কল? মানুষের মনুষ্যত্ব কি এতই সুলভ যে, তা লাভের জন্য কোন চেষ্টারই প্রয়োজন নেই। আজ অনেক দিন ধরে ইয়োরোপে প্রাথমিক শিক্ষা চলে এসেছে কিন্তু দেখা গেল তাতে বিশেষ কোন ফল হল না। এবং এ বিষয়ে সে দেশের দু একজন লেখকের লেখায় অসন্তোষও প্রকাশ পেয়েছে।

বিলাতের ও আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা অনেকেই জানেন—ইংলণ্ডের জনসাধারণের একটা প্রিয় গান হচ্ছে—" Let's all go down the Strand and have a bannana"; কলা পৃথিবীর অবশ্য সকল দেশের লোকেই খায় এবং আমরা সম্ভবত বেশীই খাই, কিন্তু তাই বলে এদেশের নিরক্ষরেরাও ওব্যাপারটাকে সঙ্গীতের বিষয় করে তোলে নি। এই যে আমাদের নিরক্ষরদের মনের একটু স্বাভাবিক উচ্চতা, ও আভিজাত্য আছে তার কারণ কি? অথচ দেখতে পাই যে, বিলিতি কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সব আলু কফি উৎপাদন করে তা উৎপাদন করা আমাদের দেশের কৃষকের অসাধ্য। তার কারণ এই যে, যদিও ভারতবর্ষের কৃষক জানেনা যে, কোন জমিতে কোন সার দিতে হয়, তারা জানে যে অযোধ্যা নগরে রামচন্দ্র একদিন পিতৃসত্য পালন করবার জন্যে রাজমুকুট ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন—রাবণের

অশোক বনে বন্দিনী সীতার কাহিনীও তারা শুনেছে—রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের শৌর্য্য তাদের কাছে কাহিনী মাত্র নয়—তাঁদের স্মৃতি অলক্ষ্যে তাদের মনকে যুগপৎ কোমল ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই এত যে পঙ্কিলতা তবু হরিসংকীর্ত্তনে লোক জোটে; যাত্রাগানে, ধ্রুব-উপাখ্যান ভালই লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই হোক আর প্রাথমিক শিক্ষাই হোক ব্যবসার সঙ্কীর্ণ আদর্শে শিক্ষাকে ছোট করে দিলে, দেশের মঙ্গল হবে না, কারণ তাতে দেশের মন ক্রমশ ইতর হয়ে পড়বে।

কাজের একটা ভীষণ আদর্শ চোখের সামনে রাখাতে যে কেবল শিক্ষার আদর্শকে ছোট করে দিয়েছি তা নয়—বাংলাদেশের মনে সকল ব্যাপারেই একটা আক্ষেপ উঠেছে যে, এখানে লেখক পাওয়া যায়, কবি ত খুবই সুলভ, বক্তা সবাই, কিন্তু যাকে বলে practical, business-man তা পাওয়া সহজ নয়। আক্ষেপ করে এই কথা বলি যে, এই যে এত বড় স্বদেশীর ঢেউটা এল,—কি হল তাতে? আর দেখ দেখি বোম্বাই, মিল বসিয়ে কেমন লাভ করছে, বাঙ্গালী বক্তৃতা দিলে গান গাইলে, বাস্ হয়ে গেল সব। এই সব লোক হয়ত একদিন এই বলে আক্ষেপ করবেন যে, সূর্য্যের আলো ধরে তাঁরা তাঁদের গার্হস্থ্যের চুলোটি জ্বালাতে পারছেন না।

এই practical efficiency প্রভৃতির মোহ যতদিন ধরেছে, ততদিন থেকে যেমন কাজের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে অমনি আফিসের উপর শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। আফিস আমাদের মন হরণ করেছে কারণ আমরা ভাবি যে, ঐ আফিস করার গুণেই ইংরেজ এত বড়। অথচ এই efficiency-টাই বা কি? দশটা থেকে পাঁচটা

শাদা খাতা থেকে কালো খাতায় কখনও বা কাল কালীতে কখনও বা লাল কালীতে নকল করা এবং এইটেই খুব শৃঙ্খলার সহিত করার নামই ত efficiency, আর practical মানে যে কাজ করা কঠিন তাতে হাত না দেওয়া। কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যে বড় একথা স্বীকার করা কঠিন, তবুও দেখছি শিক্ষাগুণে efficiency-র আদর্শে আমরা ভারি মোহিত হয়েছি। Idealism নয়, Vision নয় efficiency এবং practical হওয়া আমাদের জাতীয় আদর্শ হয়ে উঠেছে। Idealism-কে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি—নেতাদের বলছি Idea দিয়ে কি হবে—Practical কিছু বলতে পার ত বল, লেখককে বলছি ম্যালেরিয়া কিসে দূর হয় সেই কথা লেখ, না হলে ছেড়ে দেও তোমার লেখনী। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ হতে, আফিস বড়। অধ্যাপক এবং কেরাণীর সংখ্যা প্রায় সমান। কলেজে দেখতে পাই আফিস সুচারুরূপে চালানই হচ্ছে অধ্যক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য। আফিসের বড়বাবু হওয়ার যোগ্যতাই সব চেয়ে বড় যোগ্যতা। রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখছি যে, যাঁরা বিশ ত্রিশ বৎসর নিপুণ ভাবে চেয়ার সাজিয়ে এসেছেন, চাঁদা আদায় করেছেন অথবা চাঁদোয়া খাটিয়েছেন, তাঁরা বলছেন তাঁরাই নেতা কারণ তাঁরা practical! কলেজেও প্রধান কেরাণীর প্রতাপ অধ্যক্ষের চেয়ে কম নয়।

স্কুলে Plain living and high thinking সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি—চাণক্য-শ্লোকে অর্থের অনর্থতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পেয়েছি এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা শুনেছি, অথচ আমাদের মনে ভাবী-ভারতবর্ষের যে আদর্শ গড়ে

উঠেছে, সে হচ্ছে এমন একটা ভারতবর্ষ, যাতে শুধু কাপড় বোনা হচ্ছে, জুতো তৈরী হচ্ছে—চার পাঁচ তালা বাড়িতে, কলের চিমনীতে আকাশ ঢাকা যার সমস্ত দেহটা চা, পাটের বিজ্ঞাপনে একেবারে আবৃত—সাহিত্য দর্শন যেখানে নির্ব্বাসিত, অকেজো বিজ্ঞান যেখানে অপমানিত। আর দেশের লোক Stock Exchange ভিড় করে দিব্বি সুখে জীবনযাপন করছে, আর আমাদের ছেলেরা স্কুলে কলেজে শিখছে শুধু Type-writing আর Book-keeping!

কিন্তু উপবাসের দিনে যাই মনে করি না কেন, এ আদর্শ আমাদের দেশে চলবে না। যে আত্মা অজর অমর, যে আত্মা অমৃতের অধিকারী, তাকে বিনষ্ট করে মানুষকে একটা সস্তা জিনিষ উৎপাদনের কলে পরিণত করতে ভারতবর্ষ সজ্ঞানে কখনও রাজী হবে না। পৃথিবীর সমস্ত বাজার একচেটে করবার প্রলোভনও যদি দেখাও তবু একথা ভারতবর্ষের জাতীয় আত্মা কখনই স্বীকার করবে না যে, দেবতাদের মধ্যে কুবেরই বড়, আর জাতির মধ্যে বৈশ্যই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

সমুদ্রের ডাক।

—:*:—

সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটী প্রসব কর্‌লে তখন তাদের সেই এতদিনকার বিষাদঘেরা কুটীর খানি আনন্দের আলোতে হেসে উঠ্‌ল। সাগরের কিনারে তাদের কুটীর। আবহমান-কাল থেকেই ত নীলাম্বুরাশি উচ্ছ্বসিত—সৃষ্টি হতেই ত তার তরঙ্গমালা কল কল ছল ছল মুখর—আজও তাই। তবে সে তরঙ্গমালার কল কল ধ্বনিতে আজ এত আনন্দ-মদিরা ঢেলে দিলে কে? নীলাম্বুরাশির সে উচ্ছ্বাস আজ এত হাস্য-মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? কুটীরের আশে পাশে তালবৃক্ষের সারি। বাতাসে তালবৃন্ত থির্ থির্ করে কাঁপছে—কিন্তু তা আজ এত উল্লাস-যুক্ত হ'ল কোন্ মন্ত্রে? দক্ষিণা যখন তার সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব কর্‌ল তখন এমনি করে মৎসজীবীর সেই নির্জ্জন শান্ত অথচ বিষাদমাখা কুটীর খানি, আকাশ বাতাস দশদিক ভরে একেবারে হেসে উঠ্‌ল।

দক্ষিণা যখন পুত্র সন্তানটি প্রসব কর্‌লে তখন শ্রীমন্তের হৃদয়খানি ভক্তিতে ভরে' উঠ্‌ল এবং তারই আলোক তার চক্ষু দুটিকে উদ্ভাসিত করে' তুল্‌ল। দেবতার দয়া তার অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে স্পর্শ করে' শ্রীমন্তের জীবনকে এক মুহূর্ত্তে কৃতার্থ করে' দিল। জোড়করে আকাশের পানে চেয়ে গদগদভাবে শ্রীমন্ত বল্‌ল—"দেখো ঠাকুর! আমার খোকাকে যেন বাঁচিয়ে রেখ—দেখো যেন আকাশের চাঁদ হাতে

দিয়ে আবার তা কেড়ে নিয়ো না”—শ্রীমন্তের মুখে আর কথা সর্‌ল না —তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল—অন্তরের ভাব, ভাষা খুঁজে পেলে না!

যথাসময়ে অন্নপ্রাশনের সঙ্গে শিশুর নামকরণ হ'য়ে গেল। দেবতার দান বলে' তার নাম রাখা হ'ল 'প্রসাদ'। যেদিন শিশু প্রথম আধ আধ কথায় মা ও বাবা ডাক্‌তে শিখ্‌ল, সেদিন দক্ষিণা ও শ্রীমন্তের বুকের ভিতরটা আশায় আনন্দে কেঁপে উঠ্‌ল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখের সাম্‌নে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল। যে জগতে পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ে এত স্নেহ এত ভালবাসা—সে-জগতের ত কঠোর হবার অবসর নেই। যে সংসারে শিশু রয়েছে—তার আধ আধ কথা রয়েছে—কালো চোখের হাসিমাখা দৃষ্টি রয়েছে—সে সংসারের ত নির্ম্মম হবার সাহস নেই। শ্রীমন্তের মরুভূমির মতো সংসার এক মুহূর্ত্তে যেন মন্দাকিনীর প্রবাহে দ্রুমদল শোভিত হ'য়ে গেল। আর সে ক্লান্তি-নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই—আর সে ব্যর্থতা নেই। শিশুর আনন্দ-ময় স্পর্শে সমস্তই ধন্য ও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

প্রতিদিনের কাজগুলো যা এতদিন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণার কাঁধে ভূতের বোঝার মতো চেপে তাদের জীবনকে এখানে সেখানে নির্ম্মম ভাবে টেনে নিয়ে বেড়াত, সে-ভার শুধু একটী মাত্র শিশুর আবির্ভাবে একেবারে লঘু হ'য়ে গেল। শ্রীমন্ত যখন জাল কাঁধে নিয়ে মাছ মার্‌তে যায় তখন তার হৃদয়টা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই আজকাল নৃত্য কর্‌তে থাকে—শ্রীমন্ত তখন ভাবে যে এই দিনমানব্যাপী পরিশ্রমের যে পুরস্কার, সে-পুরস্কার এ পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশী। সে-পুরস্কার একটি ক্ষুদ্র শিশুর স্পর্শ—একটি ক্ষুদ্র শিশুর মুখে বাবা-ডাক। দক্ষিণা যখন রন্ধনে যায় তখন আর সে তা যন্ত্রবৎ সম্পাদন

করে না। রন্ধনের প্রতি ব্যঞ্জনটি যে, একটি ক্ষুদ্র শিশুর আনন্দের সামগ্রী হবে। সমস্ত দিনটার দিকে চেয়ে দক্ষিণার আর তা মরুভূমি বলে' মনে হয় না। সমস্ত দিনমান যে সে অনেকগুলো স্নেহের কাজের অধিকারিণী। শিশুকে স্নান করান—আহার করান—ঘুম পাড়ান তা যে দক্ষিণাকেই করতে হবে। ধন্য ভগবান! যিনি শিশুকে অসহায় করে' এখানে এনেছেন। পিতামাতা একটি ক্ষুদ্র শিশুর কাছ থেকে যে কতখানি আনন্দ কুড়িয়ে নেয়—তা শিশুও বোঝে না আর পিতামাতাও জানে না!

প্রসাদ ধীরে ধীরে ছ' বছরে পড়ল।

একদিন রাতে ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় দক্ষিণা ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছিয়ে শয়ন করেছে। পাশে প্রসাদ। ভোরের মুখে দক্ষিণার ঘুম ভেঙে গেল। তখন একটি মাত্র কাক ডেকেছে—সমুদ্রের আর আকাশের যেখানে মিলন হয়েছে সেখানে কেবল একটি মাত্র রেখা শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। শ্রীমন্ত তারও আগে জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছে, হঠাৎ তার চোখ পড়ে' গেল প্রসাদের মুখের উপর। দক্ষিণার আর ওঠা হ'ল না। প্রসাদকে ত সে এমন কোন দিন দেখে নি! নিদ্রিত শিশুর হাত দুটো সন্তর্পনে তার বুকের ওপর ন্যস্ত। চোখ দুটো ফুলের পাঁপড়ির মতো নিমীলিত। আর ঠোঁট দুখানিতে একটী মৃদু—অতি মৃদু হাসির রেখা। দক্ষিণা কি প্রসাদকে আর কোন দিন নিদ্রিত অবস্থায় দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে-প্রসাদে আর এ-প্রসাদে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। আর কি কোন দিন সে প্রসাদকে হাসতে দেখে নি?—দেখেছে; কিন্তু সে হাসিতে আর আজকার এই

নিদ্রিত শিশুর মৃদু হাসি টুকুতে যে কি প্রভেদ তা দক্ষিণা বল্‌তে পারে না—কিন্তু সে-হাসি আর এ-হাসি এক নয়। এ কি দক্ষিণার পুত্র—না কোন দেবশিশু! এ কি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র পিতা মাতার স্নেহাবদ্ধ সন্তান—না অনন্ত আকাশের কোন জীব! এ কি মর্ত্ত্যের মানুষ—না স্বর্গের দেবতা! দক্ষিণার কেমন ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি ডাক্‌ল—"প্রসাদ, প্রসাদ।"

দক্ষিণার ডাকে যখন প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল তখন সে চারদিকে চেয়ে যেন প্রথম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ল না, তারপর হঠাৎ তার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—"জানিস্ মা ভারি একটা মজার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

দক্ষিণা শিশুকে বক্ষে চেপে তার দুই গালে হাত বুলিয়ে বুঝ্‌ল এ তারই প্রসাদ বটে—জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"কি স্বপ্ন বাবা?"

"ভারি মজার স্বপ্ন মা! সে কি যেন কেমন—একদিন যেন আমি খেল্‌ছিলাম—সেখানে সবাই আছে মা—নরু অনঙ্গ বৈকোণ্ঠো শশী তারক—সবাই। হঠাৎ দেখি কেউ নেই! একলা আমি খালি দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার সাম্‌নে মা খালি নীল—আর নীল—আর নীল! আর সেখানে থেকে কে যেন খালি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ', আমি উত্তর দিতে যাই আর পারি না—হাঁট্‌তে যাই হাঁট্‌তেই পারি না। আচ্ছা স্বপ্নে এ রকম হয় কেন মা? হাঁট্‌তে গেলে হাঁট্‌তে পারি না—কথা বল্‌তে পারি না?"

"কি জানি বাবা কেমন করে' বল্‌ব স্বপ্নে কেন ওরকম হয়।"

"তারপর আরও কত যেন কি—সব আমার মনেই নেই। কত যেন সুন্দর সুন্দর দেশ—কত ঘর বাড়ী—ফুল ফল—কত যেন কি।

সে এমন সুন্দর—সব বুঝি পরীদের দেশ—পরীদের দেশ কোথায় মা ?”

“কি জানি বাবা তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না। তারা থাকে আকাশে—আকাশে আকাশেই ঘুরে বেড়ায়—তাদের দেশ কোথায় তা ত কেউ জানে না।”

প্রসাদ সন্দেহাকুল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল। শিশুর চোখে পড়্‌ল শুধুই আকাশ—অনন্ত শূন্য—আর কিছুই না। শিশু একটু ম্রিয়মান হ'ল। হায় পরীদের দেশ কোথায় তা কেউই জানে না!

সে-দিন রাত্রিতে ভীষণ তুফান উঠ্‌ল। কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—থেকে থেকে বিদ্যুৎ তাদের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। দিগন্তের পার থেকে সাঁ সাঁ করে' বাতাস ছুট্‌ল—সেই বাতাসের নাড়া খেয়ে লক্ষ্য ঢেউ যেন লক্ষ নিদ্রিত অজগরের মতো জেগে উঠে, তাদের লক্ষ্য ক্রুদ্ধ ফণা তুলে বেলাভূমে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। অর্দ্ধপ্রহর রাত থাক্‌তে জল ঝড় থেমে গিয়ে, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ কর্‌ল। দক্ষিণার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন পূর্ব্বদিকে ক্ষীণ উষার আলো দেখা দিয়েছে—আঁধার তখনো গাছে গাছে, তাদের ডাল পালার পাশে পাশে, ঘর বাড়ীর কোণে কোণে আশ্রয় খুঁজে আরোও কিছুকাল থাক্‌বার প্রয়াস পাচ্ছিল। দক্ষিণা উঠে ছড়া দিয়ে উঠান ঝাঁট দিল। তখন চারদিক বেশ ফর্‌সা হয়ে এসেছে। দক্ষিণা গিয়ে প্রসাদকে ডেকে তুল্‌ল—বল্‌ল—“কাল রাতে ঝড় হ'য়ে গিয়েছে—চল্‌, ঝিনুক কুড়ুতে যাবি নে?” প্রতি ঝড়ের শেষে সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে যে-সব মরা

ঝিনুক ইত্যাদি বেলা-ভূমে পড়ে' থাক্‌ত দক্ষিণা তা কুড়িয়ে বেশ-দু' পয়সা উপায় কর্‌ত। কখনও কখনও বা দু' একটা বড় শঙ্খ বা কড়িও মিলে যেত। তা অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা বেশ দাম দিয়ে কিনে নিত। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি প্রসাদকে কাপড় পরিয়ে দিল। তারপর কুটীরের দরজাটি টেনে দিয়ে মাতা এবং পুত্রে বের হ'য়ে পড়্‌ল।

ছোট বড় নানা রঙের নানান্ আকৃতির ঝিনুকে যখন দক্ষিণার ঝাঁকাটী পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল তখন সমুদ্রগর্ভস্থিত সূর্য্যের ক্রুদ্ধ রশ্মিগুলো পূর্ব্বদিগন্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘমালা তীরের মতো ভেদ করে', ঊর্দ্ধে নীলিমায় আপনাদের ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে তারা সমুদ্রের ধারে ধারে অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল। ফিরবার পথও সেই সমুদ্রের ধারে ধারে। দক্ষিণা বাম কাঁকালে ঝিনুকপূর্ণ ঝাঁকাটী বহন করে', দক্ষিণ হস্তে প্রসাদের ক্ষুদ্র হস্তটী ধারণ করে' ছেলের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

মাতা পুত্রে কথোপকথন করতে কর্‌তে চল্‌ছিল আর শিশুর চঞ্চল চোখ দুটী এদিক সেদিক ফিরছিল। একবার প্রসাদ সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখে, তারপর বলে উঠ্‌ল—"দেখ্ দেখ্ মা কেমন একখানা জাহাজ কতদূর দিয়ে ছুটে চলেছে"—কিন্তু পরক্ষণেই তার উত্তোলিত অঙ্গুলি দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে ধরে' একেবারে দাঁড়িয়ে গেল—শিশু যেন কি স্মরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—"মা জানিস!"

দক্ষিণাও প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—বল্‌ল—"কি বাবা?"

"সেই যে সে-দিনকার স্বপ্ন।"

"হাঁ বাবা"

"খালি নীল—আর নীল—আর নীল!"

"হাঁ বাবা"

শিশু তার ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সমুদ্রের দিকে প্রসার করে' বল্‌ল—"সে যেন ঐ রকম মা।"

"ছি ছি বাবা স্বপ্ন সব মিথ্যে।—স্বপ্নের কথা মনে করে' রাখ্‌তে নেই।"

দক্ষিণা প্রসাদকে টেনে নিয়ে গৃহ-অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। শিশুও অন্যমনস্ক ভাবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। সে মনে ভাব্‌লে হায়! স্বপ্ন সব মিথ্যে এমন মজার জিনিসগুলো মিথ্যে হয় কেন? এই ভেবে সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হ'ল।

সে দিন বেলা এগারটা বেজে গিয়েছে। গ্রামের উপকণ্ঠে যে মস্ত ছাতিম গাছটা ছাতার মতো ডাল বিস্তার করে' পাতা বিছিয়ে দিব্যি ছায়া করে' দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে তখনকার মতো খেলা ধুলো সাঙ্গ করে' ছেলেরা যে যার মতো গৃহে ফিরেছে। কিন্তু প্রসাদের আর সেদিন দেখা নেই। দক্ষিণা রান্না শেষ করে' তেলের বাটী নিয়ে প্রসাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল। ধীরে ধীরে যখন উঠানের কোণের ডালিম গাছটার ছায়া তার গায় গায় মিশে গেল অথচ প্রসাদ ফির্‌ল না তখন দক্ষিণা তার খোঁজে চল্‌ল। দক্ষিণা সহজেই মনে কর্‌ল যে প্রসাদ হয়ত আর কোন বালকের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। কিন্তু যখন সমস্ত প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে প্রসাদের খোঁজ মিল্‌ল না তখন তার মার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু দক্ষিণা আবার মনে কর্‌ল যে হয়ত প্রসাদ এতক্ষণ ঘরে ফিরেছে।

এই মনে করে' দক্ষিণা দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ল। না,—কুটীরের দ্বার তেম্‌নি রুদ্ধ। কেউ কোথাও নেই। আশে পাশে কোন খানে প্রসাদ থাক্‌তে পারে মনে করে' দক্ষিণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌ল "প্রসাদ প্রসাদ", কোন উত্তর নেই। প্রসাদ ফেরে নি।

ত্রস্তপদে দক্ষিণা আবার বাটী থেকে বহির্গত হ'ল। আবার পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌তে লাগ্‌ল। কোথাও প্রসাদ নেই। এমনি করে' যখন দক্ষিণা চতুর্থবার গৃহ থেকে গৃহান্তরে কেঁদে কেঁদে প্রসাদের খোঁজ করে' বেড়াচ্ছিল তখন একটি ছোটছেলে দক্ষিণাকে বল্‌ল যে, প্রসাদ খেলার মাঝখানে ছাতিমতলা থেকে চলে' গিয়েছিল—আর তার যদ্দূর মনে পড়ে তাতে সে প্রসাদকে ছাতিমতলা থেকে যে পথটী সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' তাকে যেতে দেখেছে। দক্ষিণা মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করে' দেবতার কাছে নানা মানত কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। ছাতিমতলায় এসে দেখ্‌ল সে স্থান জনশূন্য। দক্ষিণা সেখান থেকে যে-পথ সমুদ্রের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে' চল্‌ল। কিছুকালের মধ্যে দক্ষিণা সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এসে সে ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল।

দক্ষিণা দেখ্‌ল সমুদ্রের ধারে একখানে বন্যঝাউ আর নারিকেল গাছে একটী কুঞ্জের মতো সৃষ্ট হয়েছে—আর সেখানে প্রসাদ একটি ঝাউয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে' একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-উদ্দীপ্ত-আকাশ সমুদ্রকে একটা অতি মনোরম চোখজুড়ান নীল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। গত রাত্রির ঝঞ্ঝা-তাড়িত উর্ম্মিমালা এখনও যেন তাদের তাল সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারে নি—তাই

তখনও তারা গর্জ্জে' গর্জ্জে' বেলাভূমে এসে প্রতিহত হ'য়ে ফিরছিল। আর তারই উপকূলে ছায়া-সুনিবিড় কুঞ্জতলে ক্ষুদ্র শিশু আপনার ক্ষুদ্র দুটী হাতে ক্ষুদ্র দুটী হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে বসে তাই দেখছিল; শিশু পলকহীন—নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ!

দক্ষিণা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'য়ে প্রসাদকে কি ভর্ৎসনা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রসাদ মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল, তারপর মাকে দেখে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্‌ল ও উত্তেজিত ভাবে বল্‌লে—"মা মা শুন্‌ছিস্‌ কি মা?"

শিশুকণ্ঠের মা-ডাকে মাতার মনের ক্রোধ মুহূর্ত্তে চোখের জলে পরিণত হয়ে গেল। দক্ষিণা প্রসাদকে বক্ষে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন করে' জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কি বাবা?"

প্রসাদ তেম্‌নি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌ল—"ঐ শোন্‌ শোন্‌ মা সমুদ্র কেবলি ডাক্‌ছে—'প্রসাদ প্রসাদ।' শুনিস্‌ না কি মা তুই?"

শিশুর কথা শুনে দক্ষিণার বুক দুর্‌দুর্‌ করে' কেঁপে উঠ্‌ল। কোন্‌ অজ্ঞাত আশঙ্কার আশু সম্ভাবনায় তার চিত্ত মন প্রাণ খিন্ন হয়ে উঠ্‌ল। দক্ষিণা বল্‌ল—"ছিঃ বাবা পাগলামি করো না। সমুদ্র কি ডাক্‌তে পারে! ও যে ঢেউয়ের শব্দ।"

দক্ষিণা প্রসাদকে কোলে নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল।

এর পর থেকে সুযোগ পেলেই প্রসাদ সেই ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে বসে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকত। এই ক্ষুদ্র শিশুটী সমস্ত খেলাধূলা ফেলে, একা একা সমুদ্রের দিকে চেয়ে কি ভাবে তা কে জানে? সিন্ধুর ছলছলয়িত কলরোল সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরতে পরতে কোন্‌ ভাবের তরঙ্গ তুলে যায় তা কে বল্‌তে পারে? কে জানে

কোন্ রহস্যের যবনিকা ভেদ করে' কোন্ স্বপ্নের সন্ধানে শিশু তার কালো চোখের নির্ম্মল দৃষ্টি সীমাহীন দিগন্তে বদ্ধ করে' সিন্ধুকূলে বসে থাকে? কেউ জানে না। শিশু কি জানে? কে জানে শিশু জানে কি না। কিন্তু তবুও শিশু যায়। একা একা—সমস্ত ছেড়ে খেলাধুলো হাসি-গল্প সমস্ত পরিত্যাগ করে' শিশু যায়, সেই ঝাউকুঞ্জ-তলে আপনাকে ভুলিয়ে দিতে—ভাসিয়ে দিতে—ডুবিয়ে দিতে। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণা যখন জান্‌ল যে, প্রসাদ খেলবার নামে প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের ধারে গিয়ে একা একা বসে' থাকে, তখন সে প্রসাদকে প্রথমে মিষ্টি কথায় তারপর ভৎ‍র্সনায় ও অবশেষে ভয়প্রদর্শনে সেখানে যেতে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল কিন্তু যখন দেখ্‌ল কিছুতেই কিছু হ'ল না তখন দক্ষিণা হতাশ হয়ে শ্রীমন্তকে একে একে সব কথা বল্‌ল।

এর পর থেকে প্রসাদের বাহুমূল ও কণ্ঠদেশ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ঢোলোকাকৃতি নানা বর্ণের নানা রকমের কবজে ও তাবিজে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কত জনের কত মন্ত্র ঔষধী ইত্যাদির ছড়াছড়ি হতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রসাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ফাঁক পেলেই সে ঐ ঝাউকুঞ্জতলে গিয়ে একলা সমুদ্রের দিকে পলক-হীন নেত্রে চেয়ে থাকে—বুঝি কান পেতে কি শুনতে থাকে। এই রকমে যখন কিছুতেই কিছু হল না—তখন শ্রীমন্ত ও দক্ষিণা পরামর্শ করতে বস্‌ল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল যে, দক্ষিণা প্রসাদকে নিয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকবে। সে আত্মীয়ের বাড়ী সমুদ্রের উপকূল থেকে দশ ক্রোশ দূরে। আর শ্রীমন্ত মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে প্রসাদকে দেখে আসবে। তারপর

একটি শুভদিন দেখে দক্ষিণা ও প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমন্ত সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেলেকে রেখে তার নির্জ্জন কুটীরখানিতে ফিরে এল।

পৃথিবীর বুকে পুরোণো দাগ মিশিয়ে নতুন দাগ বসিয়ে দশ বছর কেটে গেল। শ্রীমন্ত যখন একদিন দক্ষিণা ও প্রসাদকে সেই আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে গেল তখন প্রসাদের ছেলেবেলার খেয়ালের কথা সবাই ভুলেছে—ভোলে নি শুধু দক্ষিণা। তাই দক্ষিণা যখন শ্রীমন্তকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিল—তখন দক্ষিণা যে নিতান্তই একটা পাগলী সেই কথাটাই শ্রীমন্ত তাকে বুঝিয়ে দিল। আরও বুঝিয়ে দিল যে শ্রীমন্তের এখন বয়েস হয়েছে—কবে পর-পারের ডাক আসবে তার ঠিক নেই—প্রসাদকে পৈতৃক ব্যবসাটা ত শিখতে হবে—খাওয়া পরার উপায়টা ত করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই শুভদিন দেখে প্রসাদ ও দক্ষিণা শ্রীমন্তের সঙ্গে আবার তাদের সমুদ্রের ধারে কুঁড়ে ঘরটিতে ফিরে এল। দক্ষিণা হৃষ্ট হয়ে দেখ্‌ল যে সমুদ্র দেখে প্রসাদের কোনই ভাবান্তর হল না। তিন মাসের মধ্যে শ্রীমন্তের শিক্ষায় প্রসাদ একজন পাকা মাঝি হয়ে উঠ্‌ল—জাল টান্‌তে, দাঁড় ফেল্‌তে, পাল খাটাতে প্রসাদের সমকক্ষ আর কেউই সেই ধীবরপল্লীতে রইল না।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। রাত্রির এমন রূপ আর কেউ কখনও দেখেনি। লক্ষ পরী বুঝি সেদিন আকাশপথে তাদের প্রিয়ের উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিল—আর তাদের লক্ষ গা থেকে বুঝি রূপোর স্বচ্ছ তরল রাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল—তাদের লক্ষ হৃদয়ের প্রেমের অনুভব বুঝি আকাশে বাতাসে পৃথিবীর জলে স্থলে বিছিয়ে

যাচ্ছিল—তাদের দু'লক্ষ পায়ের নূপুরের "যে-গান কানে যায় না শোনা"—তাই বুঝি দিগন্তের গায়ে গায়ে মাতলামি করে ফিরছিল।

সেদিন রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ করে' যখন প্রসাদের কাঁধে জাল চাপিয়ে আপনার কাঁধে দাঁড়, পাল ও পাল তুলবার খুঁটিটা নিয়ে শ্রীমন্ত গৃহ থেকে বের হল তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ আকাশে অনেক-খানি উঠে গেছে। তারা দুজনে সমুদ্রের কিনারে এসে তাদের তিন খণ্ড লম্বা পুরু তক্তায় বাঁধা ভেলাটা ডাঙ্গা থেকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর পাল খাটাবার খুঁটিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে পাল খাটিয়ে দিল—ভেলা অনুকূল-বাতাসে তর্‌তরিয়ে দিগন্তের পানে যেন উড়ে গেল—ভেলার পিছন দিকটায় প্রসাদ বৈঠা হাতে তার মাথা ঠিক রাখ্‌তে লাগল আর তার আগায় বসে' শ্রীমন্ত জালটা গুছিয়ে রাখতে লাগল।

সেদিন সাগরে রূপোর ও রূপের বাণ ডেকেছিল। দুধের চাইতেও সাদা রূপোর পাত গায় জড়িয়ে রূপসী ঊর্ম্মিবালারা চিক্‌-চিক্‌ ঝিক্‌-ঝিক্‌ করছিল—খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তীরের গাছগুলো যখন ঝাপ্‌সা হয়ে এল তখন ভেলার পাল নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর ভেলার পিছন দিকটায় বসে প্রসাদ একটু একটু করে বৈঠা মারতে লাগল আর গলুইয়ের কাছে স্তুপাকৃতি করা জালটা শ্রীমন্ত, ভাঁজ খুলে খুলে জলে নামিয়ে দিতে লাগল।

"জানিস্‌ প্রসাদ, পূর্ণিমে রাত্তিরে যেমন জালে গল্‌দা চিংড়ি পড়ে তেমন আর কখনও না। আর চাঁদ্‌নী রাত যদি মেঘলা মেঘলা হয় তবে কাঁবড়ার লেখাজোকা নেই।" শ্রীমন্ত জাল ফেল্‌তে ফেল্‌তে

অজস্র ব'কে যাচ্ছিল আর প্রসাদ তাই নির্ব্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছিল। "জানিস্ রে প্রসাদ সেই যেবার আমি তোর মাকে বিয়ে করলাম—সেই সেবার যে এই খালটাতে কোথা থেকে এক পাল হাঙ্গর এসে পড়ল—" "প্রসাদ প্রসাদ" প্রসাদের কানে এসে বাজল কে যেন ঠিক তার পিছন থেকে তাকে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ"। প্রসাদ চম্‌কে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। কই, কেউ ত নেই! প্রসাদের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রসাদের মনে পড়ে গেল একটা বহু দিনের কথা—বহুদিনের স্বপ্ন—বহুদিনের আকাঙ্খা। দশ বছর ধরে যার ওপরে বিস্মৃতির কালো পর্দা পড়েছিল তা এক মুহূর্ত্তে কোথায় সব ছিন্ন ভিন্ন করে' বেরিয়ে এলো মুক্ত স্পষ্ট উজ্জ্বল। প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে ফিরে দেখল। বৃদ্ধ তেমনি আপন মনে জাল ফেলছিল আর কত কালের কত কথা বলে' বলে' যাচ্ছিল। "প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ ফিরে চাইল। সহস্র সহস্র তরুণীর মতো অজস্র ঊর্ম্মিবালার কল কল ছল ছল হাসি—ঐ যে তারাই ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" চাঁদের আলোয় চিক্ মিক্ করে উঠে ঐ যে তাদের তরলিত তনু বিভঙ্গিত করে তাদের কমকণ্ঠে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে সহস্র কিশোরীর কলহাসির মতো, সহস্র রূপসীর রূপরাশির মতো মাদকতা ছড়িয়ে দিয়ে ডাক্‌ছে—"প্রসাদ প্রসাদ।" এ তাদের কিসের আমন্ত্রণ? কোথায় নেবে তারা? সিন্ধুর কোন্ অতল তলে? কোন্ রহস্য যবনিকার অন্তরালে? ঐ যে তরঙ্গটি ভেলার গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল সে ডাকল—"প্রসাদ প্রসাদ।" ঐ যে লহরীটি বহুদূর হতে দৌড়ে এসে ভেলার কিনারে কিনারে লুটিয়ে গেল, সে ডাক্‌ল—"প্রসাদ প্রসাদ।" প্রসাদ শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে

দেখল। বৃদ্ধ তেমনি তার দিকে পিঠ ফিরে জাল ফেলছিল। প্রসাদ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তার হাতের বৈঠাটা ভেলার ওপরে রেখে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার দু' পা জলে নামিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেলার কাঠ ধরে আপনাকে জলে নামিয়ে দিল। কোমর, বুক, কণ্ঠ, চিবুক, নাসিকা, চক্ষু, ললাট, মস্তক, মস্তকের কেশরাশি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দ্বিগুণ উৎসাহে লক্ষ লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা চিক্-চিক্ ঝিক্-ঝিক্ করে উঠল—যেখানটায় সাগরের বুক চিরে প্রসাদের সমস্ত শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেখানটার উপর দিয়ে মহা ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল আর খিল্-খিল্ করে' হাসতে লাগল।

"বৈঠে ঠেলছিস্ না ক্যান্ রে প্রসাদ ?" যখন প্রসাদের কোন উত্তর মিল্‌ল না, তখন শ্রীমন্ত মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল—দেখ্‌ল শুধু শূন্য—প্রসাদ যেখানটায় বসে' ছিল সেখানটা শূন্য—সমস্ত ভেলাটাই শূন্য—শুধুই শ্রীমন্ত—আর কেউ নেই !

মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের হৃদয় থেকে একটা তপ্ত আগুনের ঝলক্ উঠে তার সমস্ত শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। শ্রীমন্তের হাত থেকে জালের দড়ি খসে' পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞালুপ্ত চোখ দুটো দিয়ে প্রসাদ যেখানটায় বসে ছিল সেখানটায় অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মর্ম্মভেদী চীৎকার করে একবার খালি "প্রসাদ" বলে ডেকে ভেলার উপরে পড়ে গেল। উত্তরে লক্ষ ঊর্ম্মিবালারা চাঁদের কিরণে চিক্-মিক্ করে' লক্ষ নিষ্ঠুরা তরুণীর মতো ভেলার আশে পাশে প্রতিহত হ'য়ে খিল্ খিল্ করে' হাস্‌তে লাগল আর কৌতুক করে' ডাকতে লাগল—"প্রসাদ প্রসাদ !"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

INDIAN LITERATURE.

BY PRAMATHA CHAUDHURI.

[বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্র Manchester Guardian-য়ের সম্পাদকের অনুরোধে ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধটি সম্প্রতি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। Manchester Guardian এদেশে দু-চারখানির বেশী আসে না, সুতরাং আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই সে প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ পান নি। তাঁদের দৃষ্টির জন্যই আমি সেই প্রবন্ধটি "সবুজ পত্রে" প্রকাশ করছি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংরাজি প্রবন্ধ বাংলা কাগজে ছাপানো কি সঙ্গত? তার উত্তর—আমার ইংরাজি লেখা, আমি নিজে বাংলায় অনুবাদ কর্‌তে পারিনে। বাংলায় লিখ্‌লে ও-প্রবন্ধ আমি অন্যরকম করে লিখতুম, সুতরাং ওটি অনুবাদ কর্‌তে বসলে আমার হাতে ওর চেহারা একেবারে বদলে যাবে। তা ছাড়া "সবুজ পত্রের" অধিকাংশ পাঠকই ইংরাজি ভাষার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত,—সম্ভবত বাংলার চাইতে বেশী পরিচিত,—সুতরাং সে পত্রের মধ্যে এ প্রবন্ধটি নির্ভয়ে প্রক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

INDIAN literature is the creation of the Hindu mind, and so to understand that literature it is necessary to have some knowledge of the thought and institutions of ancient India, as all the roots of our

social and spiritual life are deeply embedded in our past. The complete history of India has yet to be written, but its culture-history has been fully preserved in the pages of Sanskrit literature—a literature which is as vast as it is comprehensive, practically embracing the whole sphere of human thought and imagination.

The earliest chapter of our literature, known as the Vedas, is a collection of hymns addressed to gods—that is to say, personified forces of nature—which express the sentiments of joy and wonder, of reverence and awe born of the living contact of the human mind with the external universe. For freshness of feeling and vigour of expression, there is nothing in any literature which can be compared with these. In them we find also the earliest attempts of the human mind to lift the veil of phenomena and peer into the Reality which is the ultimate basis of all that exists. The Vedas have ever been looked upon by our people as the eternal source of their spiritual and social existence. One thing is certain, that these first words of India indicated the direction in which the Hindu mind was to move, and determined the character of the laws which were to give shape and form to Hindu society, as well as of the philosophy which was to mould Hindu psychology. If the earlier portion of the Vedas was a collection

of hymns, the later portion was a manual of rituals. The Shastras (codes of conduct) and the Vedanta, which represent the two opposite poles of the Hindu mind—the practical and the speculative,—were respectively evolved from the prose and the poetry of the Vedas.

THE SHASTRAS.

The teaching of the Shastras is, that laws were not made by any legislator, human or divine, but are self-existent, and as such are eternal and immutable; and that therefore man's duty consists in unquestioning submission to them. A virtuous life means nothing more nor less than a life consecrated to the performance of one's social duties. The dividing line between law and morals was not clearly drawn, and one ran into the other. Our people's social consciousness was broken in to this doctrine, and in the result, the willingness to subordinate one's individual self to the social self has become almost instinctive with us.

The Vedanta philosophy is the complete antithesis of this doctrine. It deliberately and completely turned its back on the social life of man, and set itself to solve the problem of the individual soul. "I and my Father are one," sums up the central doctrine of the Vedanta. According to this philosophy, man's salvation depends neither on work nor on faith; it

lies in the realisation of the truth that the human soul is one with the divine. He who realises the God in him is the only free man, and as such is above all social rules. The paradox that man is socially bound but spiritually free, dominated the classical mind of India; and the tragedy of Indian history consists in this utter divorce of life from thought.

This Vedic literature was a sealed book to the masses, the real people of India, and was open only to the ruling race, the Aryan conquerors, of whose genius it was the product. What really formed, or transformed, the psychology of the people at large, was the story of the lives of the Aryans of the heroic age, recorded in the two great epics of India, the Ramayana and the Mahabharata. These are tales of heroic deeds and noble endeavours, and the outstanding feature of the epic characters is their moral grandeur. These two epics also happen to be the unfailing source of all subsequent Sanskrit literature. Generation after generation of poets, dramatists, and story-tellers have drawn both their inspiration and their material from them. It is not necessary for me to dwell at length on later Sanskrit literature, because, in spite of all its high excellence, it has had little or no influence on either the form or the spirit of our modern literature. It could not influence life, because it was too far removed from life. We admire

it, but do not imitate it. It is urbane but conventional, elegant but stiff; it has form but no movement, it has colour but no warmth; in a word, it is as refined as it is bloodless. It seems that the spirit of the Shastras—the legal spirit—had taken possession of its soul, and crushed out its vitality. The latter-day products of Sanskrit literature show that the spirit of India stood in urgent need of thorough renovation.

II.

The invasion of the Mohammedans, which took place in the eleventh century A.D., gave the death-blow to the classical civilisation of India, and along with it to the decaying Sanskrit literature. Two hundred years did not pass before India saw the birth of a new literature—the vernacular literature. As its language shows, this literature was popular in its origin, and had, whether in spirit or form, little or no connection with the classical. The so-called Prakrit, or popular literature of the previous age was, however, even more artificial than the Sanskrit, and had nothing popular whatever about it. The new literature came out of a new religious movement, in which another side of the soul of our people is revealed—the emotional. During the course of ages Brahminic institutions had become so rigid and Brahminic thought so abstract, that they had practically ceased

to be human. On the other hand, the mind of the people had become intensely humanised by the influence of Buddhism, whose great teaching of infinite compassion for all sentiment creatures had sunk deep into the soul of the nation.

The simple doctrine of the fatherhood of God and the brotherhood of man, which the Mohammedans introduced into India, appears to have stirred the soul of the people to its depths, for we find that in the fourteenth century, in almost every part of India, religious reformers rose in protest against the empty formalism and the dry intellectualism of Brahminic orthodoxy. In this age. Vaishnavism, the oldest monotheistic creed of India, was revived throughout the length and breadth of the country. Neo-Vaishnavism, with its doctrines of a personal God, incarnation, divine grace, and salvation by faith, bears a close and striking resemblance to Christianity. As a romantic spiritual movement which set a new and supreme value on human emotions, it caused a simultaneous deepening and heightening of the emotional nature of our people. And the poets of this age poured out their emotions, social and religious, in language which is as simple as it is fervent.

III.

With the British conquest of India, there opens a new chapter of our psychology. In English litera-

ture our people discovered a new mental hemisphere, a new world of knowledge—the knowledge of the facts of this world,—and a dormant faculty of our soul awoke into life. What the German philosophers call the "will to know," suddenly manifested itself amongst our people in all its freshness and vigour. The Indian mind showed no hostility—not even the faintest—towards the message of science; on the contrary, our fathers displayed an extraordinary eagerness to acquire and spread the new learning which came from the West. The opening years of the nineteenth century thus saw the birth of a new literature, largely and deeply influenced by Western thought and Western feeling. The first half of the last century did not produce any permanent literature, because it was an experimental age—an age of text-books and translations. If we take the example of Bengal, we find that her period of literary apprenticeship came to an end with the close of the first century of British rule. The birth of this literature, which is at once modern and national, was synchronous with the assumption of the government of India by the Crown.

Our new literature is the expression of our new psychology, into the composition of which elements both European and Indian equally enter. I know of no process by which these can be separated, because

the human mind is not a chemical compound which admits of either quantitative or qualitative analysis. But we shall not go very far astray if we say that, what is modern in our literature has its root in modern Europe, and what is national in ancient India. Spiritually we all hark back to the Vedanta Philosophy, because Europe has not succeeded in robbing us of our sense of the Beyond. We welcome the science of modern Europe, but not its philosophy. We would sooner believe that all is spirit, than that all is matter. But we seek to modernise the ancient thought—that is to say, we would apply the doctrines of man's spiritual freedom to his social life. Europe has simply taught us to bridge the ancient gulf between Indian thought and Indian life.

Rabindranath Tagore incarnates in himself the whole spirit of the age, and in his works Europe can find all the heights and depths of our new psychology. But whilst European readers of his writings can easily recognise what is Western in thought and feeling therein, they fail to realise that his religious consciousness is inspired by the Vedanta, and that his lyrics are informed by the spirit of Vaishnava poetry. Our new literature at its best shows that in it the East and West have not only met, but have interpenetrated each other.

Manchester Guardian, March 28, 1918.

বই পড়া। *

—:*:—

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্ব্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হই। লোকে বলে আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানটা অবশ্য অত্যাচার শ্রোতাদের উপর করারই সামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য' পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন "উদাসীন গ্রন্থকীট"। এর অর্থ, কোনও কোনও লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সে যাই হোক্, আমার আ-কৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে

* কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইনষ্টিটিউটের সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে ১৯১৮ সনের ১৯শে মে তারিখে পঠিত।

সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা আমার বিশ্বাস অসঙ্গত হবে না।

(২)

আজকের সভায় যে দু'চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে,—অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশী থাক্‌বে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্ব্বে হাজার বার কি বলা হয় নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ্‌-অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেননা মানুষে এ কালে বই পড়ে না—পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দু'টি কাজ—এক চা-পান আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে "A cup that cheers but not inebriates"—অর্থাৎ চা-পান কর্‌লে নেশা হয় না অথচ ফুর্ত্তি হয়। চা-পান কর্‌লে নেশা না হোক্‌, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তারপর অতিরিক্ত চা পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়—অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চারদিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

(৩)

কাব্যচর্চ্চা না কর্‌লে মানুষে জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনও সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি—এদেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশী লোক যত বেশী বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য,—এমন কথা বল্‌লে বোধহয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা কলহে দিন-যাপন করার চাইতে কাব্যচর্চ্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলকেই সংসার-বিষ-বৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য কর্‌তেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে,—কিছুদিন পূর্ব্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি, লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলিনে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না, কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশী ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিক-দের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাসান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "নাগরিক" বল্‌তে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত—একালে ইংরাজিতে যাকে man-about-town বলে। বাংলাভাষায় ওর কোনও নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

(৪)

যদি অনুমতি করেন ত এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এদেশে যেমন একদল ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর একদল ভোগী-পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক-ধর্ম্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার শুধু আত্মার নয় দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতি-নীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন, অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য; বিশেষতঃ ও সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্র চাদরপাতা একটি শয্যা থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চ্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর, রাত্রিশেষ অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপুটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগ-

দন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্ত্তিকা-সমুদ্গকঃ। এবং যে কোনও পুস্তক।”

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে—কেননা এর অনেক শব্দই বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতি-শয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া। এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চ্চস্থান। কূর্চ্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনও অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ্চ। আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না। সুতরাং কূর্চ্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়—আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না;—কিন্তু দেবতার ধার ষোল আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যাহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখা যাক্ বেদিকা বস্তুটি কি?—বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল। এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়। তিনি বলেন বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম—অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের

মালা। কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেননা তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য্য বুঝতেন। সিক্‌থ্‌করণ্ডক হচ্ছে—মোমের কৌটা। সেকালে নাগরিকেরা, ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিস করে নিয়ে, তারপর তাতে আল্‌তা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে—ইংরাজিতে যাকে বলে powder-box। বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে—প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানী। তারপর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তি-সংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা। টীকাকার বলেন সে বীণা আবার "নিচোল-অবগুণ্ঠিতা"। বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ী। "শাড়ীপরা বীণা"র অবশ্য কোনও মানে নেই। নিচোল অর্থে গেলাপ। জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন "শীলয় নীল নিচোলং" তার অর্থ "নীলরঙের একটি ঘেরাটোপ পর"। ইংরাজি ভাষায় ওর তর্জ্জমা হচ্ছে—put on a dark blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্। তারপর পাই চিত্রফলক। সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্ত্তিকা সমুগকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তারপর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পার্‌বেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তারপর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হ'ন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে

আর কোনও সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোন কোন ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে—

"এই সকল বীণাদিদ্রব্য সর্ব্বদা উপঘাতের অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তি নিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হবে।"

পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের আরও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন—যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং, অর্থাৎ "যা হোক একটা বই",—তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে বই, আর যে কারণেই হো'ক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই:—'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দ্দেশ হইলেও, তখনকার যে-কোনও কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও,—ও দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে—কিন্তু কাউকে জোর করে সঙ্গীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনও অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ

অনুমান করা অসঙ্গত হবে। সে যাই হো'ক, টীকাকার বলেছেন "যে-সে বই নয়, তখনকার বই"; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরাজিতে বলে classics, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনও উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনরূপ সামাজিক দায় নেই। আর এক কথা। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্য সমাজেও দেখ্‌তে পাই যে, "এখনকার" বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাসানের একটি প্রধান অঙ্গ। Anatole France-এর টাট্‌কা বই পড়ি নি, এ কথা বল্‌তে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত Kipling-এর কোনও সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বল্‌তে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ Anatole France-এর লেখা যেমন সুপাঠ্য, Kipling-এর লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বল্‌ছিনে। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব তিনি মাসে দশ বিশ হাজার টাকা রোজগার কর্‌তেন। অত না হো'ক্, যা রটে তা কিছু বটেই ত। এই থেকেই আপনারা অনুমান কর্‌তে পারেন তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু কর্‌তে লাগলেন, যতটা চোরডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি?—Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই ত! ও সব বই পড়েছি স্বীকার কর্‌তে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি

এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলেন। তিনি বল্‌লেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়্‌বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য এ রকম ব্যক্তিকে এদেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল কর্‌তে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে তিনি যত বড় আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য কর্‌বে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে পূরাকালে culture জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি, সেকালে তাকে নাগরিক বল্‌ত। অপরপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্য্যায়-শব্দ—ইংরাজিতে যাকে বলে synonyms.

(৫)

এর উত্তরে হয়ত অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চ্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করিনে, ও

চর্চ্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে "মাল্য চন্দন বনিতা" এ তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও তিনই ছিল এক পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের সামিল, বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালের নাগরিক সমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হ'লে, সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্ত্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখ্‌তে চাই। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত বর্ত্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই। আরও অনেক হওয়া চাই,—কিন্তু ও দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চ্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য—এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্ব্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসীর দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু' কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত; কেননা যুগভেদে ও দেশ ভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা-মূর্ত্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং

কোন সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয় ; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতীত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে, দেখতে পাওয়া যায় যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে কাব্যকলায় শিল্পে বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসী লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চ্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে মানুষকে ভাল করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হো'ক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে মানুষকে ভাল না করা যাক্, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চ্চা মানুষকে নীতিবান না করলেও রুচিবান করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক সেকালের নাগরিক সমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম "বিদগ্ধ মুখমণ্ডনম্"। ওরকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক্, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার সামিল ছিল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ্য যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল "বিট"। এই বিটের একটি ছবি আমরা

মৃচ্ছকটিকে দেখ্‌তে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাস-ভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখ্‌লে ও কথা শুনলে তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে হাত নিসপিস করে, অপরপক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশী যে, তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে' ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায়—দু'দণ্ড আলাপ কর্‌বার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জ্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এ সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক্ অলঙ্কৃত করে। এবং এ সকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চ্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এ সকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ সে কালের সভ্যতা ছিল aristocratic, আর এ কালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে democratic. সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার,—আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখ্‌তেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখ্‌তে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপ ভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদ সকলেরি চোখে ধরা পড়্‌বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমাণ্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশী। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন মুখপাত্রেও নন, সুতরাং সে কবির মন নিজের মন,—লৌকিক মনও নয়, সামাজিক

মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন। সেকালের সামাজিকেরা কলাবিৎ ছিলেন বলে, সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কি বললেন, তার চাইতে কি ভাবে বললেন তার মর্য্যাদা ঢের বেশী। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিষ্টিক হয়েছে, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এই সব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেননা তার গুণে ক্লাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্যে আর্টের মূল্য যে কত বড়, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু' কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ যুগের ডিমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে,—বোধহয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। অথচ ডিমোক্রাসির এ সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা materialism-এর দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চ্চা আবশ্যক।

(৬)

বই পড়ার সখটা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও, আমি কাউকে সখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ

কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে সৌখীন নই— দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক সখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের দেশে জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব, অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্ম্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই, কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা— কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারিনে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনও সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন সাহিত্যচর্চ্চা যে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনও নগদ বাজারদর নেই। এই কারণেই ডিমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডিমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উল্টো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও, ইংরাজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডিমোক্রাসীর গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক,—স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার সুফল

সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা Law-report কেননা, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিন্‌তে প্রস্তুত নন, কেননা তাতে ব্যবসার কোনও সুসার নেই। নজির বা আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে—সেত জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না—তার যে কোনও মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডর নয়, এ সত্য ত প্রত্যক্ষ কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য নয় যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের শূন্য, সে জাতির ভাণ্ডার ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়—কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম নীতি অনুরাগ বিরাগ আশা নৈরাশ্য, তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য—এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মন-গঙ্গার তোলা জল—তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে—কেনন বইপড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চ্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্ম্মের চর্চ্চা চাই কি মন্দিরে করা চলে, দর্শনের চর্চ্চা গুহায়, নীতির চর্চ্চা ঘরে, এবং

বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাদুঘরে;—কিন্তু সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চ্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না—চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ সব কথা যদি সত্য হয়—তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাঁসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চম্‌কে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বল্‌ছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সম-রেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা কর্‌বেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেঁকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য কর্‌বেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি—এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহিতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জ্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন—মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত কর্‌তে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন—এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে, সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জ্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে কর্‌তে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর না পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক্। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন—যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও বস্তু পেটে

গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে সুরু করে—তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন—"আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক" ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলাকওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ঐ একই ধরণের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে infantile liver-য়ে গতাসু হচ্ছে—তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিষ্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

(৭)

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে একবস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার কর্‌তে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসীদেশে শিক্ষা-পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers;

অর্থাৎ যারা পাস কর্‌তে পারে নি, কিম্বা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল ; নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে, সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্ম্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চল্‌ছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয়েরা নোট দেন, এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলি উগ্‌লে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগ্‌লানো দর্শকের কাছে তামাসা হলেও—বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলা-গুলির এক কণাও জীর্ণ কর্‌তে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোটনামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলা-গুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গীরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক্, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে এতে জাতির প্রাণশক্তি

বাড়্ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্ব-শিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়—স্ব-শিক্ষিত হবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে—তার আপনার বল্তে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষা পদ্ধতিও যাদের মনকে জখম কর্লেও একেবারে বধ কর্তে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুলকলেজের উপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয়শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার কর্ছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাঁসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাঁসপাতাল।

(৮)

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, "বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষতঃ প্রাচীন নজির দেখাবার কি

প্রয়োজন ছিল ? বই পড়া যে ভাল, তা কে না মানে ?” আমার উত্তর—সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান ধর্ম্মে মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত—এক যারা কেতাবি, আরেক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্ব্বদলভুক্ত নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে—অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চ্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্ত্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্ম্মার দলেই ফেলে দিই। অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্ত্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরি কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্ত্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে, জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জ্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার

অর্থ হচ্ছে জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনও নীতির অনুসারেই তা কর্ত্তব্য হতে পারে না,—অর্থনীতিরও নয় ধর্ম্মনীতিরও নয়।

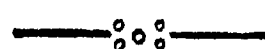
কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়,—আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই, সে নির্জ্জীব—একথা যেমন সত্য ; যে নির্জ্জীব, তারও যে আনন্দ নেই—সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জ্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্টো টান যে আমাদের টান্‌তে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চার স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানি না। সম্ভবত হই নি ; কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না ; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডিমোক্রাটিক যুগে aristocratic সভ্যতার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙ্গালীর আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে Athens যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান

অধিকার কর্‌বে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে democratic এবং aristocratic; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে democratic, এবং মানসিক জীবনে aristocratic,—সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনও বিচ্ছেদ নেই, বরং দু'য়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্ম্মীর দল যেমন একদিকে বাংলায় ডিমোক্রাসী গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর একদিকে আমাদেরও পক্ষে মনের aristocracy গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্য-কলার চর্চ্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে, কাব্য-কলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্য-চর্চ্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক—এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সাহিত্যের জাতরক্ষা।



ভৌগলিক সীমানা আর যেখানেই থাক্ না কেন, তিনটী রাজ্যে কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, ও রসের রাজ্যে। আর এই চিন্তা, ভাব ও রস—এ তিনটী হচ্ছে সাহিত্যের সম্পত্তি। সুতরাং এ কথা বল্‌লে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, সাহিত্য-সাম্রাজ্যের এমন কোন একটা বাঁধা "ফ্রন্‌টিয়ার" নেই, যেটা কোন দিনই ভাঙা চল্‌বে না।

কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে, ওটা একটা ডাহা বাজে কথা ও মিছে কথা। আর সেইজন্যে এই অনেকের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের জাতরক্ষার একটা হুজুগ বর্ত্তমানে তুলেছেন। কারণ বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য নাকি কালাপানিফের্ত্তা—ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। এ সাহিত্যের কোঁচার নীচে দিয়ে নাকি প্যাণ্টালুনের পা বেরিয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে—জামার ভিতর থেকে নাকি নেক্‌টাই কলার উঁচু হয়ে উঠেছে বোঝা যাচ্ছে। বাঙালী কবি নাকি এমন সব কবিতা লিখছেন, যা' বিদেশীরা কোনরকম ভাষ্যের সাহায্য না নিয়েই সোজাসুজি বিনি মেহনতে বুঝ্‌তে পারছেন। সুতরাং এ কথা ত মান্‌তেই হবে যে, বাঙালী কবির কাব্য বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য নয়—সেটা হচ্ছে বিদেশী সাহিত্য। অতএব বাঙালী জাতির মঙ্গলের জন্য তার

সাহিত্যের জাতরক্ষার একটা ব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই দরকার। ভারতবর্ষের মাটির এম্‌নি গুণ !

আমরা যে-সময়টায় বেঁচে আছি, সে সময়ের বাংলা-সাহিত্য বল্‌লে প্রথমত ও প্রধানত রবীন্দ্রনাথকেই বোঝায়—এ কথাটা বল্‌লে অনেকের আরামের ব্যাঘাত ঘট্‌বে জানি, কিন্তু আশা করি এটা মিথ্যা প্রলাপ নয়। এই রবীন্দ্রনাথের রচনা নাকি সব বিদেশী; কারণ তাঁর লেখা নাকি অতি সহজে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তা ইংরাজিরই অনুবাদ। সেদিন আমার এক বাংলাভাষাভিজ্ঞ জাপানী বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা অতি সহজে জাপানীতে অনুবাদ করা যায়—সুতরাং তাঁর লেখা যে জাপানী-সাহিত্যের অন্তর্গত, তার কোন ভুল নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার এক তামিল বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, (ইনিও বেশ বাংলা জানেন) বঙ্কিমের নভেলগুলো জলের মতো তামিলে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্য রচনা করেন নি—তিনি সেবা করেছেন আসলে তামিল-সাহিত্যের। অতএব এটা স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য বলে' কোন পদার্থই নেই। তার কিছুটা ইংরেজি, কিছুটা জাপানী, কিছুটা তামিল—আর বাকীটা হিন্দি, মারাঠি, ফার্‌সী, ফরাসী, ইটালিয়ান ও রাশিয়ান মিশিয়ে। মধুসূদন যে খাঁটী জার্ম্মাণ ভাষায় মেঘনাদ-বধ রচনা করেছেন, সেটা ত আমরা সবাই জানি। আশ্চর্য্য আমাদের সাহিত্যিকদের শক্তি ও আত্ম-ত্যাগ ! এতদিন ধরে' তাঁরা কায়-মন-প্রাণে পরের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেলেন। আর অপূর্ব্ব আমরা 'রিপ্‌ ভ্যান্‌ উইঙ্কলে' নব সংস্করণ—জেগে থেকেও তাঁদের এ প্রতারণাটা ধর্‌তে

পারলেম না! তাঁরা সম্পদ দিয়ে গেলেন পরকে, আর শ্রদ্ধা নিয়ে গেলেন আমাদের। যাহোক্, এতদিনে সৎ-সমালোচকের দৃষ্টির গুণে তাঁদের এ প্রবঞ্চনাটা আজ ধরা পড়ে গেল—মন্দের ভাল! তাই আমরা আজ আমাদের সাহিত্যের জাতরক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হয়েছি—ভারতবর্ষের সনাতন মাটির এমনি গুণ! এখানে কিছুই নতুন হবার জোটি নেই!

কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, ভারতবর্ষের মাটী যতটা স্থিতিশীল, ভারতবাসীর মনটা ততটা নয়। আর যে জিনিসটা সাহিত্যিক গড়ে' তোলে, সেটা দেশের মাটি নয়—দশের মন। আর এই মন জিনিসটা গতিশীল। কিন্তু সে গতি নিরেট পাকা সড়কের মতো নয়—সেটা হচ্ছে তরল উজ্জ্বল স্রোতস্বিনীর মতো—কাজেই এ গতিতে ভাঙাগড়া আছে—আর যেখানে ভাঙাগড়া আছে সেখানেই পরিবর্ত্তন আছে—এক রূপ থেকে আর এক রূপে, এক ভাব থেকে আর এক ভাবে, এক সুর থেকে আর এক সুরে। আর যেহেতু সাহিত্য জিনিসটা জাতীয় মনের দর্পণস্বরূপ, সেজন্যে সেখানে যে যুগে যুগে জাতীয় মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়বে, সেটা লজিকের পাতা না উল্‌টিয়েও বলা যায়; কেননা মনকে ফাঁকি দিয়ে আর যাই করা যাক—কাব্যও লেখা যায় না, সাহিত্যও গড়া যায় না।

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, আমাদের সাহিত্যকে যদি একটা বিশিষ্ট ভাব বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট সুরের মাঝে আবদ্ধ রাখতে চাই, তবে আমাদের জাতীয় মনটাকে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। সে মনে যেন নব নব ভাব, নব নব সুর, নব নব চিন্তা না জাগে; নবীন প্রাণের নব অনুরাগকে আমাদের অবজ্ঞার ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে শিখতে

হবে—নইলে আমাদের প্রাণ যে আমাদের মনকে ভুলিয়ে নিয়ে কোন্ পথে ছুট্‌বে তার বিন্দুমাত্র ঠিক নেই। আর প্রাণ ছাড়া মন নেই—যদি ও বা থাকে, সে মন জীবন্ত সাহিত্য গড়তে পারে না। কারণ সাহিত্যিকের প্রাণ দিয়েই তার সাহিত্য প্রাণবান্—মন জোগায় শুধু তার দেহ।

সুতরাং আমাদের পুরাতন সাহিত্যকে সনাতন করে' তুল্‌তে চাইলে প্রথমত আমাদের জাতীয় প্রাণটাকে নষ্ট করে' আমাদের সাহিত্যিকদের প্রাণ-মরা হ'তে হবে। সাহিত্যিকরা প্রাণ-মরা হ'লে তাদের চারপাশে "সনাতন জড়তার" দেয়াল এক রাত্তিরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াবে। আর সেই "সনাতন জড়তার" দেয়ালের মধ্যে সাহিত্যই বল আর যাই বল, সব সনাতন হ'য়ে উঠ্‌বে আপনাআপনি—তার জন্যে আর কাউকেই কিছু কর্‌তে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ মানুষের ভিতরে একটুও প্রাণ আছে, ততক্ষণ তা হবার উপায় নেই। প্রাণের একটা মহৎ দোষ এই যে, সে চল্‌তে চায়; কারণ এই চলাই তার সত্য—আর সেই জন্যে এই চলার মধ্য দিয়ে সে চারিদিকে আনন্দের বান ডাকিয়ে যায়। আর মানুষের যা কিছু সত্য সৃষ্টি—তার সাহিত্যিক জীবনেই হোক্ বা তার কর্ম্ম-জীবনেই হোক্, তার জন্ম এই আনন্দের মধ্যে। প্রাণের এম্‌নি একটা মহৎ দোষ আছে বলেই আমাদের দেশের যোগী ঋষিরা—অবশ্য "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগের"—প্রাণের উপরে এমন খড়গহস্ত। তাঁরা প্রাণকে কায়দা করবার কত কত উপায় বের করেছেন; কারণ প্রাণ যতদিন আছে ততদিন নির্ব্বাণ নেই। কেননা প্রাণকে না মার্‌তে পার্‌লে জগৎটা নিরানন্দ হ'য়ে ওঠে না। আর জগৎটা নিরানন্দ হ'য়ে না উঠলে নির্ব্বাণেরও কোন মূল্য থাকে না।

কিন্তু প্রাণকে কৈবল্য পাইয়ে দেবার পথে একটি মস্ত বাধা সৃষ্টি করে' রেখেছেন স্বয়ং ভগবান। সেটি হচ্ছে জীবজগতের আত্মরক্ষার দুর্বার ইচ্ছা—instinct. এখন আমরা পুরাতনকে সনাতন করে' রাখতে পারব কি না, তা নির্ভর করবে মানুষের এই আত্মরক্ষার instinct এবং সাহিত্যের জাতরক্ষা অভিলাষী সমালোচকের বুদ্ধিবিচার—এ দুয়ের মধ্যে কে জয়ী হবে, তার উপরে। এ দু'য়ের মধ্যে যে সংগ্রাম—সে সংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ভয় নেই। প্রাণের জোরে বুদ্ধিকে একদিন উদার হ'য়ে উঠতেই হবে। তখন সে বুঝবে যে একটা জাতির প্রতিভা যে সাহিত্য গড়ে' তোলে, তাই তার জাতীয় সাহিত্য। নইলে শেক্সপীয়র শেলী ও 'শ' তিন জনের রচনাই ইংরেজী-সাহিত্য বলে' গ্রাহ্য হ'ত না। কারণ এঁদের তিন জনের মধ্যে যেটুকু মিল আছে সেটুকু হচ্ছে এই যে, তিন জনের রচনাই ইংরেজি ভাষায় লেখা। এ ছাড়া আর যদি কিছু মিল থাকে তবে বুদ্ধির চোখে দূরবীণ লাগিয়েও সে মিলটা ধরা যায় কি না সন্দেহ।

(২)

আসল কথা হচ্ছে এই যে, কোন জাতিরই জাতীয় সাহিত্যের জাত বলে' কোন বস্তু নেই, সুতরাং তা' রক্ষা করবারও কোন সমস্যা নেই। একটা জাতি যতদিন ধরে' বেঁচে থাকে, ততদিন ধরে' তার সাহিত্যই রচিত হ'তে হ'তে চলে। যুগে যুগে একটা জাতির মনের কথা প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের সুখ দুঃখ আবেগ আকাঙ্খার পরিবর্ত্তন নানা নৈসর্গিক ও

অনৈসর্গিক কারণে হ'তে হ'তে চলেছে—আর তার সাহিত্যে তারই ছাপ পড়্ছে। সুতরাং একটা জাতীর জীবনে বিশেষ কোন সন তারিখ পর্য্যন্ত দাগ দিয়ে বলা চলে না যে সেই পর্য্যন্ত তার সাহিত্য জাতীয়, তার পর যা'—তা' পরদেশী। "জাতীয় সাহিত্য" সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন সেটা—"জাতীয় কি না?" তা নয়—কিন্তু—"সাহিত্য কি না?"—তাই। কারণ সব পদ্যই যেমন কাব্য নয়, তেমনি সব লেখাই সাহিত্য নয়। সুতরাং আজ আমাদের প্রশ্ন এ নয় যে, "আমাদের সাহিত্য জাত রক্ষা করে' চলেছে কি না?"—আমাদের প্রশ্ন এই যে "আমাদের জাতি সাহিত্য রচনা করে' চলেছে কি না?"

কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সাহিত্য কোন্ সন পর্য্যন্ত জাতীয়, তার একটা হিসেব নিকেশ এর মধ্যেই করে' ফেলেছেন। তাঁরা বল্‌তে সুরু করেছেন, যে বাংলা ভাষায় ফুল ফল আকাশ বাতাস চাঁদ চকোর দিয়ে যদি কোন কাব্য রচনা হয়, তবে সেটা হবে নিতান্ত বিদেশী; এবং বাঙ্গালী কবি যদি অনন্তের দিকে মুখ করে' বসে থাকেন, তবে তাঁর কাব্যে জাতীয়তার প্রাণান্ত হবে—কারণ অনন্তের আলো আর দিগন্তের বাতাসটা নাকি বাংলা ভাষার প্রাণে সয় না। অর্থাৎ এঁরা বল্‌তে চান যে, মানুষের মুখের ভাষা তার প্রাণের আশার চাইতে বড়—যেমন অনেকে বলে থাকেন যে মনুসংহিতার মূল মানুষের জীবনের গতি-ভঙ্গিমার চাইতে সত্য। আসল কথা হচ্ছে এই যে, অনন্তের আলো ও দিগন্তের বাতাস বাঙ্গালী কবির অন্তরে তার মোহিনী রূপ ফেলেছে কিনা—তা যদি ফেলে থাকে তবে বাংলা ভাষায় তা মোহন হ'য়ে ফুট্‌বেই। কারণ ভাষা মানুষের—মানুষ ভাষার নয়। মানুষই ভাষার জন্ম দিয়েছে আপনার আত্মার শক্তিতে—মানুষই শব্দে অর্থ দিয়েছে

আপনার তপঃ প্রভাবে—মানুষই অর্থকে মন্ত্রে পরিণত করেছে আপনার উগ্র তপস্যায়। ভাষা মানুষের জন্ম দেয় নি—তার প্রাণেরও না, মনেরও না, হৃদয়েরও না।

এই কথাটা আমাদের আজ ভাল করে বুঝতে হবে যে, যে-কোন যুগের চাইতে অনন্তকাল অনেক বড়—আর সে অনন্ত কালে মানুষের জীবনে কতরকম সম্ভব অসম্ভব ঘট্‌তে পারে তার পরিমাণ কেউ দিতে পারে না—তার অনুমান কেউ কর্‌তে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোন জাতি, যে-কোন সমাজ, যে-কোন নেশানের চাইতে প্রত্যেক মানুষ অনেক বড়—নইলে জার্ম্মাণীর ষ্টেট আইডিয়া হত সমাজ-সমস্যার শেষ ও শ্রেষ্ঠ মীমাংসা। আবার যে-কোন মানুষের চাইতে প্রত্যেক কবি বড়—নইলে এ পৃথিবীতে সবার চাইতে তাজ্জব ব্যাপার হত—ইংলিশ নেশানের মতো একটা নেশানের পক্ষে শেক্সপীয়রকে জন্ম দেওয়া। সুতরাং যে-কোন কবির চারপাশে তার জাতীয়তার দোহাই দিয়ে গণ্ডি টান্‌লে, সেই কবিকেই আমরা ছোট করব—তার জাতিকে বড় করতে পারব না।

কিন্তু সাহিত্যে জাত বাঁচিয়ে চলার দল আজ এই বলে' আব্দার ধরেছেন যে, আমাদের যদি কাব্য লিখতে হয়, তবে সেকাব্য লিখতে হবে বৃন্দাবনের,—তা সে জিওগ্রাফির বৃন্দাবনই হোক, বা হৃদ্-বৃন্দাবনই হোক; আমাদের যদি গান বাঁধতে হয়, তবে সে গান হওয়া চাই রাধাকৃষ্ণের—তা সে রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিকই হোক্ বা আধ্যাত্মিকই হোক্; যদি নাটক লিখতে হয় ত শ্রীরাধার মানভঞ্জন—বড় জোর সুভদ্রাহরণ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণই বাঙ্গালী কবির অন্তরে চিরটা কাল সত্য হয়ে থাকবে সৃষ্টির কোন্ নিয়মানুসারে, সেটা অবশ্য আমাদের

এ পর্য্যন্ত এঁরা বাংলিয়ে দেন নি। আর রাধাকৃষ্ণ চিরটা কাল যে কেন নায়কনায়িকার স্থান মৌরসি পাট্টা করে বসে থাকবেন, তাও বোঝা যায় না—অবশ্য একটা কারণ ছাড়া। সেটা হচ্ছে এই যে, এঁরা দু'জনেই পুরাতন। আর পুরাতনের প্রতি সনাতন মনের টান চিরকালই দেখা যায়। কিন্তু মানুষ নিজে একদিন যা' তৈরি করেছে, তা' দিয়ে আর একদিন তাকেই আবদ্ধ করতে চাওয়ার মতো মুর্খতা মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

যাহোক্, এঁদের এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতেই হবে, নইলে আমরাও হব সেই চীনেম্যানের সামিল—যে বলেছিল যে তার মাথাটা আর চীনে-মাথা নেই, সেটা হয়ে গেছে বিদেশী মাথা—কেননা সেমাথা থেকে টিকি কেটে ফেলা হয়েছে। চীনেম্যানের বুদ্ধি তাকে বোঝবার অবসর দেয় নি যে, তার মাথার ওপরেই চীনে-টিকি গজিয়েছিল—তার টিকির আগায় চীনে-মাথা গজায় নি।

(৩)

কোন মানুষ দুইমুহূর্ত্ত এক লোক নয়। দু'মুহূর্ত্ত এক হলেও দু' দিন এক নয়—দু' দিন এক হলেও দু' বছর এক নয়। তার দেহের ত কথাই নেই—সেটা আমাদের চর্ম্মচক্ষেই ধরা পড়ে—কিন্তু তার অন্তরও পলে পলে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠ্‌ছে—নব নব কল্পনা—নব নব আশা আকাঙ্খা দিয়ে—নব নব বেদনার মধ্যে দিয়ে। কেননা মানুষের জীবনের রাগ এক নয়—সহস্র। মানুষের অন্তর-দেবতার জীবন-পথে অভিযান হয় সহস্র রাগিণীতে বাঁশী বাজিয়ে—সহস্র

রঙের নিশান উড়িয়ে, এর সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্য বোধহয় প্রমাণের দরকার নেই। কারণ এ সব আমাদের দেখা কথা— অর্থাৎ Facts. এ সত্বেও যদি কেউ উপরের কথায় আপত্তি তোলেন, তবে এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি নিতান্তই একজন তার্কিক—আর কিছু নন্।

মানুষের সম্বন্ধে এই কথাটা যেমন সত্য, একটা জাতি বা সমাজের পক্ষেও এটা ঠিক তেমনি সত্য। এই যে আমরা বাঙালী জাতি—আমরা আর্য্য না অনার্য্য, মঙ্গোল না দ্রাবিড়—না সবগুলো মিশিয়ে একটা কিছু—সে সম্বন্ধে কোন থিওরি খাড়া করবার অধিকার আছে মাত্র এক নৃ-তত্ত্ববিদের। কিন্তু এমন যদি ব্রাহ্মণ আজ বাংলাদেশে থাকেন, যিনি বুক ঠুকে সাহস করে' বলতে পারেন যে, তাঁর ধমনীর প্রত্যেক বিন্দু শোণিত আর্য্য-শোণিত—তবে সেই বাঙালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সেকালের আর্য্য ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গের যে মিলটা পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁরা দু'জনেই মানুষ। কিন্তু যেহেতু মানুষ গরু গাধা নয়, সেই জন্যে আজকার এই মানুষ আর সে দিনের সেই মানুষের মধ্যে ভিতরের দিকটায় একটা প্রকাণ্ড অমিল দাঁড়িয়ে গেছে— সে এম্নি অমিল যে এদের এক জনের কথা আর এক জনের বুঝতে হলে একছত্র কথার পঞ্চাশ পত্র টীকা না হ'লে চলে না। পাঁচ ছ'শ বছর আগেকার বাঙালী আর আজকের বাঙালী এক নয়। পাঁচ ছ'শ বছর আগের বাঙালী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির জন্ম দিয়েছে। আর আজকের আমরা যে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি নই, তা সাময়িক পত্রিকার কোন কোন কবিতাতে স্পষ্ট করে' লেখা থাকে দেখতে পাওয়া যায়—যাঁর চোখ আছে তিনিই সেটা পড়তে পারেন। এখন

এই যে একটা মানুষের বা সমাজের বা জাতির পরিবর্ত্তন—তা কেন হয়, বা কেমন করে' হয়, এ প্রবন্ধে সেটা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রবন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এ-পরিবর্ত্তন ঘটে—এ সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেই।

নদীর মুখ বন্ধ হয়ে গেলে তার স্রোতহীন জল শৈবালদলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন আর সেখানে কল কল ছল ছল তান ওঠে না,—ওঠে শুধু মণ্ডুককুলের ঐক্যতান সঙ্গীত। এতো গেল নদীর কথা। তেমনি মানুষের জীবনের যে-কোন রসকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌লে তা কিছু-দিনের মধ্যেই হয়ে ওঠে তাড়ি। আর সে তাড়ি পান করে' মানুষে যে লীলাখেলা করে, তা' আর যাই হোক্ আধ্যাত্মিক মোটেই নয়। সুতরাং কোন এক যুগের মানুষের অনুভূত কোন এক বিশেষ রসকে সনাতন করে তোলায় মানুষের বিপদ আছে। তাই এমন যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্বও মেতে গিয়ে, হয়ে দাঁড়াল আদিরস। আর এই আদিরসের রঙে রঙীন্ হয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে ছবি ফুটে উঠ্‌ল, তার রস হাস্যও নয় করুণও নয়—তার রস বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোন বিশেষ অনুভূতিকে মানুষের পক্ষে সনাতন করে তুলতে কেউ-ই পারেন না—কারণ তা সনাতন করে তুল্‌তে পারার অর্থ ভগবানের এ সৃষ্টি-লীলার অবসান। তাই স্বয়ং বুদ্ধদেব তা পারেন নি—স্বয়ং খৃষ্টদেবও কৃতকার্য্য হন নি। প্রমাণ—এই দুই মহা পুরুষের আজকালকার শিষ্যেরা।

সুতরাং যখন মানুষের, সমাজের, জাতির পরিবর্ত্তন হচ্ছে—মানুষের জীবন-দেবতার লীলা-বিলাসের পরিবর্ত্তন হচ্ছে—যুগে যুগে তার অন্তরে নব নব আকর্ষণ সত্য হয়ে উঠে আনন্দের ডাক তাকে

নব নব পথে আহ্বান কর্‌ছে—তখন তারই রচিত সাহিত্যে একই রকমের রস, একই রকমের সুর, একই রকমের ভঙ্গী চিরন্তন করে রাখবার চেষ্টাটা যে কেবল বিজ্ঞান-সম্মতই নয় তা নয়—সেটা সহজ জ্ঞানসম্মতও নয়। বর্ত্তমানের মানুষকে অস্বীকার করে যদি আমরা তার অতীতকেই বড় করে তুলি, তবে সামাজিক জীবনে যেমন আমাদের মিলেছে ভণ্ডামি—তেমনি সাহিত্যিক বা কবির কাছ থেকে আমাদের যা' মিলবে সে হচ্ছে রসহীন ছোব্‌ড়া, আর কিছু নয়—বড় জোর শক্তিশালী যাঁরা তাঁদের হাতে গড়ে উঠবে চাকচিক্য-ময় প্রাণহীন প্রতিমা। কারণ মিথ্যা যেখানে, সেখানে মানুষ আনন্দ পেতে পারে না—আর যেখানে সে নিজে আনন্দ পায় না, সেখানে সে অপরকে আনন্দ দিতে কিছুতেই পারে না—মরে গেলেও নয়। সুতরাং আজ যাঁরা বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আদর্শ করে তুলে, মনে করছেন যে তাঁরা বাঙালী জাতিকে একটা মহত্ত্বের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাংলার সাহিত্যিকদের একটা মস্ত মিথ্যা পথই দেখিয়ে দিচ্ছেন। এঁদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, যেটা চলে আস্‌ছে সেটাই যদি চিরকাল চলে আসে, তবে আজ যেটা চলে আস্‌ছে সেটাও চলে আসতে পারত না।

(৪)

এই সব কথা মনে করেই আমরা বাংলার নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের আজ এই একটা সাবধানের ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য বলে মনে কর্‌ছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বীণাপাণির মন্দিরে আপনার জীবনের

সত্য খুঁজে পেয়েছেন—বীণাপাণির বীণার তানে যাঁদের মন মজেছে—তাঁরা যেন সে বীণাপাণির মন্দিরে প্রবেশ করেন—আপনার জীবন-দেবতার সত্য অর্ঘ্য নিয়ে, কোন অতীতকে নিয়ে নয়—তা সে অতীত যত বড়ই হোক, যত মহানই হোক, যত লোভনীয়ই হোক। সাহিত্যিক জীবনে সফলতা লাভের একই পন্থা—আপনার অন্তরের সত্য। সাহিত্যিকের আপনার জীবনের সত্যের মধ্যেই সেই ফুলগুলি ফুটে ওঠে—যে ফুল দিয়ে বীণাপাণি নিভৃতে বসে তার জন্যে বিজয়মাল্য রচনা করেন। এ পথের পথিকের আর কোন পন্থা নেই। শুধু এ পথেরই বা বলি কেন—কোন পথের পথিকেরই অন্য পন্থা নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

আজ বাংলার মানুষকে আহ্বান করে' আমরা বল্‌ছি যে, তাঁরা যেন বাঙালীর মিথ্যা জাতীয়তার নামে আপনার ভিতরের মানুষকে খাটো না করেন। তাঁরা যেন না ভোলেন যে, বাহিরের জগতে আমরা বাঙালী কিন্তু মনের জগতে আমরা মানুষ। সামাজিক জীবনে ত মানুষ আপনার চারদিকে গণ্ডী টান্‌তে বাধ্য—নইলে সংসার চলে না। কিন্তু মনের জগতে তার অসীম স্বাধীনতা। মনের জগতের এই স্বাধীনতার সংকোচ যেন তাঁরা কোন দিনই না ঘটান। দেশভেদে, জাতিভেদে, আচারভেদে, বর্ণভেদে, ধর্ম্মভেদেও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই—কিন্তু আমরা এই মনের জগত চিরকাল উন্মুক্ত রেখে যেন আশা কর্‌তে পারি যে বাহিরের সহস্র অমিল সত্বেও বিশ্ববাসীর একদিন এখানে মিলন হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ছোট গল্প।

——:*:——

আমরা পাঁচজনে মিলে, এই যুদ্ধ নিয়ে বাক্-যুদ্ধ করছিলুম। সুপ্রসন্ন হঠাৎ তর্কে ক্ষান্ত দিয়ে, একখানি বাঙলা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আমরা তাঁর পড়ায় বাধা দিলুম না। আমরা জানতুম যে তাঁর সঙ্গে কারও মতের মিল হচ্ছে না বলে, তিনি বিরক্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে ফের আলোচনার ভিতর টেনে আন্তে গেলে, তিনি মহা চটে যেতেন। আমি বরাবর লক্ষ্য করে আস্‌ছি যে, এই যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে গেলেই নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির অন্তরেও বীররসের সঞ্চার হয়, শেষটা তর্ক একটা মারামারি ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং আমি কথাটা উল্টে নেবার মনে মনে একটা সদুপায় খুঁজ্‌ছি, এমন সময় সুপ্রসন্ন হঠাৎ আবার বইখানা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে, বলে উঠ্‌লেন—Nonsense.

কথাটা এত চেঁচিয়ে বল্‌লেন, যে তাতে আমরা সকলেই একটু চম্‌কে উঠলুম।

আমি বল্লুম "কি nonsense হে"? সুপ্রসন্ন বল্‌লেন—

—"তোমাদের এই বাঙলা বইয়ে যা লেখা হয় তাই। সাধে ভদ্র-লোকে বাঙলা পড়ে না। এই বইখানা খুলেই দেখি লেখক বল্‌ছেন, ছোট গল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই। কি চমৎকার definition। এর পরেও লোকে বলে বাঙালীর শরীরে লজিক নেই!"

অনুকুল এই শুনে একটু হেসে উত্তর করলেন,—

—"ওহে অত চটো কেন? দেখছ না লেখক নিজের নাম রেখেছেন 'বীরবল'। ঐ থেকেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে ও হচ্ছে রসিকতা।"

—"তোমরা যাকে বলো রসিকতা আমি তাকেই বলি nonsense. একটা জোড়া কথাকে ভেঙ্গে বলায় মানুষে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

এ শুনে প্রশান্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন,—

—"তোমার বুদ্ধির অগম্য হলেই যে তা' আর সকলের বুদ্ধির অগম্য হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বীরবলের ও কথা nonsenseও নয় রসিকতাও নয়—ষোল আনা সাচ্চা কথা।"

যে যা, বল্‌ত প্রশান্ত তার প্রতিবাদ কর্‌ত; এই ছিল তার চিরকেলে স্বভাব। সুতরাং সে সুপ্রসন্ন ও অনুকুল দু'জনের দ্বিমতকে এক বাণে বিদ্ধ করায়, আমরা মোটেই আশ্চর্য্য হলুম না। বরং নিজের মতকে সে কি করে' প্রতিষ্ঠা করে তাই শোনবার আগ্রহ, আমার মনে জেগে উঠ্‌ল। তর্কের মুখে প্রশান্ত অনেক নতুন কথা বল্‌ত। তাই আমি বল্লুম—

—"দেখো প্রশান্ত, রসিকতাকে যে সত্য কথা মনে করে রসজ্ঞান তারও নেই।"

পিঠ পিঠ জবাব এলো—

—"সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে সত্যজ্ঞান তারও নেই।"

—"মানলুম। তারপর ওর সত্যিটি কোনখানে বুঝিয়ে দাওত হে?"

—"বীরবলের কথাটা একবার উল্টে নেওয়া যাক্। তাহলে দাঁড়ায় এই যে—"ছোট গল্প হচ্ছে সেই পদার্থ, যা প্রথমত ছোট নয়, দ্বিতীয়ত গল্প নয়। তা যদি হয় ত, Kant-এর শুদ্ধ বুদ্ধির সুবিচারও ছোট গল্প।"

এ কথা শুনে আমরা অবশ্য হেসে উঠলুম, কিন্তু সুপ্রসন্ন আরও অপ্রসন্ন হয়ে বল্‌লেন—"তোমার যে রকম বুদ্ধি তাতে তোমার বাঙলা লেখক হওয়া উচিত। Nonsense-কে উল্টে নিলেই যে তা Sense হয় এ তত্ত্ব কোন্ লজিকে পেয়েছে, গ্রীক না জার্ম্মাণ? ছোট শব্দের নিজের কোনও অর্থ নেই, ও হচ্ছে একটা আপেক্ষিক শব্দ, অন্য কিছুর সঙ্গে মেপে না নিলে ওর মানে পাওয়া যায় না।"

—"তা'হলে War and Peace-এর চেহারা চোখের সুমুখে রাখ্‌লে Anna Karenina-কে ছোট গল্প বল্‌তে হবে। আর রাজসিংহের পাশে বসিয়ে দিলেই বিষবৃক্ষ ছোট গল্প হয়ে যাবে। একই কথার যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা মানে হয়, এইটে ভুলে গেলেই মানুষের মাথা ঘুলিয়ে যায়। গণিতে "ছোট" শব্দ relative ও লজিকে Correlative; কিন্তু সাহিত্যে তা positive."

—"তাহলে তোমার মতে ছোট গল্পের ঠিক মাপটা কি?"

—"এক ফর্ম্মা। যার দেহ এক ফর্ম্মায় আঁটে না, তা বড় গল্প না হতে পারে কিন্তু তা ছোট গল্প নয়।"

—"তোমার কথা গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা হচ্ছে এই, যে ফর্ম্মাও সব এক মাপের নয়। ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোল-পেজি আছে।"

—"ছন্দও আট মাত্রার, বারো মাত্রার, ষোল মাত্রার হয়ে থাকে, অতএব যদি বলা যায় যে পদ্য ছন্দের সীমানা টপ্‌কে গেলে, তা গদ্য না হতে পারে কিন্তু তা পদ্য হয় না, তাহলে সে কথাও তোমাদের কাছে গ্রাহ্য নয়।"

সুপ্রসন্ন তর্কের এ পেঁচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বল্লেন—

—"আচ্ছা তা যেন হল। গল্প, গল্প হওয়া উচিত এ কথা বলে বীরবল কি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? আমরা জান্‌তে চাই গল্প কাকে বলে?"

প্রশান্ত অতি প্রশান্ত ভাবে উত্তর করলেন—

—"গল্প হচ্ছে সেই জিনিস যা আমরা কর্‌তে জানি নে।"

—"শুন্‌তে ত জানি?"

—"সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তোমরা ভালবাসো শুধু বর্ণনা আর বক্তৃতা, যার ভিতর গল্প ফোটা দূরে যাক্ শুধু চাপা পড়ে যায়। বড় গল্পের তোড়া বাঁধতে হলে হয়ত তার ভিতর দেদার পাতা পূরে দিতে হয়। কিন্তু ছোট গল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভিতর স্থান নেই।"

—"দেখো প্রশান্ত, উপমা যুক্তি নয়। যারা উপমা দিয়ে কথা বলে, তাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুর কোনও জ্ঞানলাভ করি নে, লাভ করি শুধু উপমারই জ্ঞান। তোমার ঐ ফুল পাতা রাখো, এখন বল দেখি, ছোট গল্পের প্রাণ কি?"

—"ট্র্যাজেডি।"

—"কেন কমেডি নয় কেন?"

—"এই কারণে, যে ট্রাজেডি অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যায়—যথা, খুন জখম মৃত্যু ইত্যাদি, আর কমেডির অভিনয় ত সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।"

অনুকুল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বল্‌লেন—

—"আমার মত ঠিক উল্টো। জীবনের অধিকাংশ মুহূর্ত্তই হচ্ছে কমিক। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত গুলোকেই এক সঙ্গে ঠিক দিলে তবে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা আগাগোড়া ট্রাজিক। পৃথিবীতে যা ছোট তাই কমিক আর যা বড় তাই ট্রাজিক।"

"জীবনটা ট্রাজিক কি কমিক এ তর্ক উঠ্‌লে যে প্রথমে তা কমিক হবে আর শেষটা ট্রাজিক হতেও পারে এ কথা আমি জানতুম। তারপর ঐ ত হচ্ছে সকল দর্শনের আসল সমস্যা। আর কোনও দর্শনই অদ্যাবধি যখন তার মীমাংসা কর্‌তে পারে নি তখন আমরা যে হাত হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব, সে ভরসাও আমার ছিল না। আলোচনা, যুদ্ধ থেকে গল্পে এসে পড়ায় একটু হাঁপছেড়ে বেঁচে-ছিলুম, তাই দর্শনের একটা ঘোরতর তর্ক হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি এই বলে উভয় পক্ষের আপোষ মীমাংসা করে দিলুম যে—'ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ'। প্রফেসার এতক্ষণ আমাদের তর্কে যোগ দেন নি; নীরবে একমনে আমাদের কথা শুনছিলেন। অতঃপর তিনি ঈষৎ হাস্য করে বল্‌লেন—

—"প্রশান্তর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ছোট গল্প আমারই লেখা উচিত, কেননা আমার মুখে গল্প ছোট হতে বাধ্য। আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই, আর বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি নেই। এই ত গেল প্রথম কথা। তারপর জীবনটাকে আমি ট্রাজেডিও মনে করি নে, কমেডিও মনে করি নে; কারণ আমার মতে সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও

দুই। ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখন আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা বল্‌তে যাচ্ছি। তোমরা দেখো প্রথমে তা ছোট হয় কি না, আর দ্বিতীয়ত তা গল্প হয় কি না। এই-টুকু ভরসা আমি দিতে পারি যে, তা ছাপ্‌লে আট পেজের কম হবে না, ষোলো পেজেরও বেশি হবে না—বারো পেজের কাছ ঘেঁসেই থাক্‌বে। তবে তা এক 'সবুজ পত্র' ছাড়া আর কোন কাগজ ছাপ্‌তে রাজি হবে কি না, বল্‌তে পারি নে। কেননা তার গায়ে ভাষার কোনও পোষাক থাক্‌বে না। ভাষা জিনিসটে যদি আমার ঠোঁটের গোড়ায় থাক্‌ত তাহলে আমি আঁকও কষ্‌তুম না, গল্পও লিখ্‌তুম না, ওকালতি কর্‌তুম। আর তাহলে আমার টাকারও এত টানাটানি হত না। সে যাহোক এখন গল্প শোনো।"

প্রফেসারের কথা।

আমি যে বছর B. Sc. পাশ করি সেই বছর পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে জ্বরে পড়ি। সে জ্বর আর দু'তিন মাসের মধ্যে গা থেকে বেমালুম ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লুম না। দেখলুম, চণ্ডীদাসের অন্তরের পীরিতি বেয়াধির মত, আমার গায়ের জ্বর শুধু "থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে জ্বালার নাহিক ওর।" শেষটা স্থির করলুম চেঞ্জে যাব। কোথায়, জানো?—উত্তরবঙ্গে! ম্যালেরিয়ার পিঠস্থানে। এর কারণ তখন বাবা সেখানে ছিলেন, এবং ভাল হাওয়ার চাইতে ভাল খাওয়ার উপর আমার বেশি ভরসা ছিল। এ বিশ্বাস আমার পৈতৃক। বাবার জীবনের প্রধান সখ ছিল আহার। তিনি ওষুধে বিশ্বাস করতেন

কিন্তু পথ্যে বিশ্বাস কর্‌তেন না, সুতরাং বাবার আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত মনে করলুম। জানতুম তাঁর আশ্রয়ে জ্বর বিষম হলেও সাবু খেতে হবে না।

একদিন রাত দুপুরে রাণাঘাট থেকে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম। মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল। একে ডিসেম্বার মাস তার উপর আমার শরীর অসুস্থ তাই এক পাল অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে অতটা পথ যাবার প্রবৃত্তি হ'ল না। জানতুম যে প্যাসেঞ্জারে গেলে সম্ভবত একটা পূরো সেকেণ্ড ক্লাস কমপার্টমেণ্ট আমার একার ভোগেই আস্‌বে। আর তাও যদি না হয় ত গাড়ীতে যে লম্বা হয়ে সুতে পার্‌ব, আর কোনও গার্ড ড্রাইভার গোছের ইংরেজের সঙ্গে একত্র যে যেতে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলুম। এর একটা আশা ফলেছিল, আর একটা ফলে নি। আমি লম্বা হয়ে শুতে পেরেছিলুম কিন্তু ঘুমতে পাই নি। গাড়ীতে একটা বুড়ো সাহেব ছিল, সে রাত চারটে পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ হোঁস ছিল, ততক্ষণ শুধু মদ চালালে। তার দেহের গড়নটা নিতান্ত অদ্ভুত, কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত ঠিক বোতলের মত। মদ খেয়েই তার শরীরটা বোতলের মত হয়েছে, কিম্বা তার শরীরটা বোতলের মত বলে মদ সে খায়, এ সমস্যার মীমাংসা আমি কর্‌তে পারলুম না। যারা দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, এ Problem-টা তাদের জন্য, অর্থাৎ ফিজিওলজিষ্টদের জন্য রেখে দিলুম। যাক্ এ সব কথা। আমার সঙ্গে বৃদ্ধটি কোনরূপ অভদ্রতা করে নি, বরং দেখবামাত্রই আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে, সে ভদ্রলোক এতটা মাখামাখি করবার চেষ্টা করে-ছিল, যে আমি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে পড়বার ভাণ করলুম। মাতাল আমি

পূর্ব্বে কখনও এত হাতের গোড়ায়, আর এতক্ষণ ধরে দেখি নি, সুতরাং এই তার খাঁটি নমুনা কি না বল্‌তে পারি নে। সে ভদ্রলোক পালায় পালায় হাস্‌ছিল ও কাঁদছিল। হাস্‌ছিল—বিড় বিড় করে কি বকে, আর কাঁদ্‌ছিল, পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর গুণ কীর্ত্তণ করে। সে যাত্রা গাড়ীতে প্রথমেই মানব-জীবনের এই ট্রাজি-কমেডির পরিচয় লাভ করলুম। আমার পক্ষে এই মাত্‌লামির অভিনয়টা কিন্তু ঠিক কমেডি বলে' বোধ হয় নি। দুর্ব্বল শরীরে শীতের রাত্তিরে রাত্রি-জাগরণটা ঠাট্টার কথা নয়, বিশেষত সে জাগরণের অংশীদার যখন এমন লোক যার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মদের গন্ধ অবিরাম ছুট্‌ছে। মানুষ যখন ব্যারাম থেকে সবে সেরে ওঠে তখন তার সকল ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়, বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আমারও তাই হয়েছিল। ফলে জ্বর আসবার মুখে যে রকম গা পাক দেয়, মাথা ঘোরে আমার ঠিক সেই রকম হয়েছিল। ঘ্রাণে যে অর্দ্ধ ভোজনের ফল হয় এ সত্যের সে রাত্তিরে আমি নাকে মুখে প্রমাণ পাই।

পরদিন ভোরের বেলায় শীতে হি হি করতে করতে ষ্টীমারে পদ্মা পার হলুম। সারায় গিয়ে এবার যে গাড়ীতে চড়্‌লুম তাতে জনপ্রাণী ছিল না। আগের রাত্তিরের পাপ সেইখানেই বিদেয় হল। মনে মনে বল্‌লুম বাঁচলুম। যদিচ বিনা নেশায় মানুষটা কি রকম তা দেখবার ঈষৎ কৌতুহল ছিল। সাদা চোখে হয়ত সে আমার দিকে কটমটিয়ে চাইত। শুনেছি নেশার অনুরাগ খোঁয়ারিতে রাগে দাঁড়ায়। সে যাই হোক, গাড়ী চল্‌তে লাগল, কিন্তু সে এমনি ভাবে যে, গম্যস্থানে পৌঁছবার জন্য যেন তার কোনও তাড়া নেই। ট্রেণ প্রতি ষ্টেশনে থেমে জিরিয়ে, একপেট জল খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে সুস্থে ঘটর ঘটর করে' অগ্রসর হতে লাগল। আমি সাহিত্যিক হ'লে, এই

ফাঁকে উত্তর-বঙ্গের মাঠ-ঘাট, জল-বায়ু, গাছপালার একটা লম্বা বর্ণনা লিখতে পারতুম। কিন্তু সত্যিকথা বল্‌তে গেলে, আমার চোখে এ সব কিছুই পড়ে নি; আর যদি পড়ে থাকে ত মনে কিছুই ঢোকে নি, কেননা কি যে দেখেছিলুম তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই মনে নেই। মনে এইমাত্র আছে যে, আমি গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একটা গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখি, গাড়ী হিলি ষ্টেশনে পৌঁচেছে—আর বেলা তখন একটা।

চোখ তাকিয়ে দেখি, একদল মুটে হুড়মুড় করে এসে গাড়ীর ভিতর ঢুকে এক রাশ বাক্স ও তোরোঙ্গে ঘর ছেয়ে ফেল্‌লে। সেই সব বাক্স ও তোরঙ্গের উপর বড় বড় কালির অক্ষরে লেখা ছিল Mr. A. Day. দেখে আমার প্রাণে ভয় ঢুকে গেল, এই মনে করে, যে রাত্‌টে ত একটা সাহেবে জ্বালিয়েছে দিনটা হয়ত আর একটা সাহেবে জ্বালাবে, সম্ভবত বেশিই জ্বালাবে, কেননা আগন্তুক যে সরকারি সাহেব তার সাক্ষী, তাঁর চাপ্‌রাশ ধারী পেয়াদা, সুমুখেই হাজির ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসলুম। স্বীকার করছি আমি বীরপুরুষ নই।

অতপর যিনি কামরায় প্রবেশ কর্‌লেন তাঁকে দেখে আমি ভীত না হই চকিত হয়ে গেলুম। তাঁর নাম মিষ্টার Day না হয়ে মিষ্টার Night হলেই ঠিক হ'ত। আমরা বাঙালীরা শুন্‌তে পাই মোঙ্গল দ্রাবিড় জাত। কথাটা সম্ভবত ঠিক, কেননা আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙের বেশ একটু আমেজ আছে। কিন্তু পাকা মান্দ্রাজি রঙ শুধু দু'চার জনের মধ্যেই পাওয়া যায়। Mr. Day সেই দু'চার জনের একজন। আমি কিন্তু তার রঙ দেখে অবাক

হই নি, চেহারা দেখে চম্‌কে গিয়েছিলুম। এ দেশে ঢের শ্যামবর্ণ লোক আছে যারা অতি সুপুরুষ, কিন্তু এই হ্যাটকোট ধারী যে কোন জাতীয় জীব তা বলা কঠিন। মানুষের সঙ্গে ভঁাটার যে কতটা সাদৃশ্য থাক্‌তে পারে ইতিপূর্ব্বে তার চাক্ষুস পরিচয় কখনই পাই নি। সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় সমান লোকটির, গা হাত পা মাথা চোখ গাল সবই ছিল গোলাকার। তারপর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তাঁর কোট পেণ্টালুনের ভিতর দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছিল। কোট পেণ্টালুন, কাপড়ের,—তাঁর দেহ যে তাঁর চামড়া ফেটে বেরয় নি, এই আশ্চর্য্য। তাঁকে দেখে আমার শুধু কোলাবেঙের কথা মনে পড়তে লাগল, আর আমি হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। যা অসামান্য তাই মানুষের চোখকে টানে, তা সে সু-রূপই হোক্ আর কু-রূপই হোক। একটু পরেই আম'র হোঁস হল, যে ব্যবহারটা আমার পক্ষে অভদ্রতা হচ্ছে। অমনি আমি তাঁর সুগোল নিটোল বপু থেকে চোখ তুলে নিয়ে অন্য দিকে চাইলুম। অন্ধকারের পর আলো দেখলে লোকের মন যেমন এক নিমিষে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আমারও ঠিক তাই হল। এবার যা চোখে পড়ল, তা সত্য সত্যই আলো—সে রূপ, আলোর মতই উজ্জ্বল, আলোর মতই প্রসন্ন। Mr. Day-র সঙ্গে দুটি কিশোরীও যে গাড়ীতে উঠেছিলেন, প্রথমে তা লক্ষ্য করি নি। এখন দেখলুম তার একটি Mr. Day-র ঈষৎ সংক্ষিপ্ত শাড়ী বাঁধাই সংস্করণ। এর বেশি আর কিছু বল্‌তে চাইনে। Weismann যাই বলুন বাপের রূপ সন্তানে বর্ত্তায়, তা সে-রূপ সোপার্জ্জিতই হোক আর অন্বয়াগতই হোক। অপরটির রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমার চোখে ও মনে সেই মুহূর্ত্তে যা চিরদিনের মত ছেপে গেল, সে হচ্ছে

একটা আলোর অনুভূতি। এর বেশি আমি আর কিছু বল্‌তে পারিনে। আমি যদি চিরজীবন আঁক না কষে কবিতা লিখ্‌তুম, তাহলে হয়ত তার চেহারা কথায় এঁকে তোমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারতুম। আমার মনে হল সে আপাদ-মস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, তার আঙ্গুলের ডগা দিয়ে, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। Leyden Jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চল্‌ত, তা'হলে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বল্‌তে গেলে, প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ তার অঙ্গ-ভঙ্গী তার বেশভূষা সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরচ্ছিল। সেই একদিনের জন্য আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, অধ্যাপক জে, সি, বোসের কথা সত্য,—প্রাণ আর বিদ্যুৎ একই পদার্থ।

এই উচ্ছ্বাস থেকে তোমরা অনুমান করছ, যে আমি প্রথম দর্শনেই তার ভালবাসায় পড়ে গেলুম। ভালবাসা কাকে বলে তা জানি নে, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, যে সেই মুহূর্ত্তে আমার বুকের ভিতর একটি নূতন জানালা খুলে গেল, আর সেই দ্বার দিয়ে আমি একটা নূতন জগত আবিষ্কার করলুম, যে জগতের আলোয় মোহ আছে, বাতাসে মদ আছে। এই থেকেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে। আমার বিশ্বাস আমি যদি কবি হতুম তা'হলে তোমরা যাকে ভালবাসা বলো, তা আমার মনে অত শীগ্‌গির জন্মাতো না। যারা ছেলেবেলা থেকে কাব্যচর্চ্চা করে তারা ও জিনিসের টীকে নেয়। আমাদের মত চিরজীবন আঁক-কষা লোকদেরই ও রোগ চট্‌ করে পেয়ে বসে। মাপ করো, একটু বক্তৃতা করে ফেললুম, তোমাদের কাছে সাফাই হবার জন্য। এখন শোনো তারপর কি হল।

Mr. Day আমার সঙ্গে কথপোকথন সুরু করে দিলেন এবং সেই ছলে আমার আদ্যোপান্ত পরিচয় নিলেন। মেয়ে দুটি আমাদের কথা-বার্ত্তা অবশ্য শুনছিল, স্থূলাঙ্গীটি মনোযোগ সহকারে, আর অপরটি আপাতদৃষ্টিতে—অন্যমনস্ক ভাবে। আমি আপাতদৃষ্টিতে বল্‌ছি এই কারণে যে, এ আমার এক একটা কথায় তার চোখের হাসি সাড়া দিচ্ছিল। আমার নাম কিশোরীরঞ্জন, এ কথা শুনে বিদ্যুৎ তার চোখের কোণে চিক্‌মিক্‌ কর্‌তে লাগল, তার ঠোঁটের উপর লুকোচুরি খেল্‌তে লাগল। স্থূলাঙ্গীটি কিন্তু আসল কাজের কথাগুলো হাঁ করে গিল্‌ছিল। আমার বাবা যে পাটের কারবার করেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মার্কামারা ছেলে তারপর অবিবাহিত, তারপর জাতিতে কায়স্থ, এ খবর গুলো বুঝলুম সে তার বুকের নোট বুকে টুকে নিচ্ছে। আমাদের সাংসারিক অবস্থা যে কি রকম, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় Mr. Day-র প্রয়োজন হয় নি। হয়ত তিনি আমার বাবাকে নামে জান্‌তেন, নয়ত তিনি আমার বেশভূষার পারিপাট্য, আসবাবপত্রের আভিজাত্য থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন, যে আমাদের সংসারে আর যে বস্তুরই অভাব থাক্—অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। সুতরাং আমি বাবার এক ছেলে ও ফার্ষ্ট ডিভিসনে B. Sc. পাশ করেছি, এ সংবাদ পেয়ে তিনি আমার প্রতি হঠাৎ অতিশয় অনুরক্ত হয়ে পড়্‌লেন। আগের রাত্তিরে বুড়ো সাহেবটি যে পরিমাণ হয়েছিলেন তার চাইতে এক চুল কম নয়। মদ যে এ দুনিয়ায় কত রকমের আছে, এ যাত্রায় তার জ্ঞান আমার ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

এর পর তাঁর পরিচয় তিনি নিজে হতেই দিলেন। সে পরিচয় তিনি খুব লম্বা করে দিয়েছিলেন, আমি তা দু' কথায় বল্‌ছি। তিনিও

কায়স্থ, তিনিও B. A. পাশ। এখন তিনি গভর্ণমেণ্টের একজন বড় চাকুরে—Settlement Officer। কিন্তু যে কথা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে বলেছিলেন, সে হচ্ছে এই যে, তিনি বিলেত-ফেরৎ নন, ব্রাহ্মও নন, পাকা হিন্দু ; তবে তিনি শিক্ষিত লোক বলে স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন এবং বাল্য-বিবাহে বিশ্বাস করেন না। সংক্ষেপে তিনি reformer নন—reformed Hindu। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, জুতো মোজা পর্‌তে শিখিয়েছেন, এবং এই সব শিক্ষা দেবার জন্য বড় করে রেখেছেন, এতদিনও বিবাহ দেন নি। তবে পয়লা নম্বরের পাশকরা ছেলে পেলে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন। একথা শুনে আমি তার দিকে চাইলুম, কার দিকে অবশ্য বলবার দরকার নেই। অমনি তার মুখে আলো ফুটে উঠ্‌ল, কিন্তু তার ভিতর কি যেন একটা মানে ছিল, যা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার মনে হল সে আলোর অন্তরে ছিল অপার রহস্য, আর অগাধ মায়া। এক কথায়, আরতির আলোতে প্রতিমার চেহারা যে রকম দেখায়—সেই হাসির আলোতে তার চেহারা ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। শরীর যার রুগ্ন সে পরের মায়া চায় এবং একটুতেই মনে করে অনেকখানি পায়। এই সূত্রে আমি একটা মস্তবড় সত্য আবিস্কার করে ফেল্‌লুম, সে হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকে বলকে ভক্তি করে কিন্তু ভালবাসে দুর্ব্বলকে।

সে যাই হোক, আমি মনে মনে তার গলায় মালা দিলুম, আর তার আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌লুম, সেও তার প্রতিদান কর্‌লে। এই মানসিক গান্ধর্ব্ব বিবাহকে সামাজিক ব্রাহ্ম বিবাহে পরিণত কর্‌তে যে বৃথায় কালক্ষেপ করব না, সে বিষয়েও কৃতসংকল্প হলুম। দুটির মধ্যে

সুন্দরীটিই যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। যদি জিজ্ঞাসা করো যে, দুই বোনের ভিতর চেহারার প্রভেদ এত বেশি কেন? তার উত্তর—একটি হয়েছে মায়ের মত আর একটি বাপের মত। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অবশ্য আমাকে differential calculas-এর আঁক কষতে হয় নি।

আমি ও মিষ্টার দে দুজনেই হলদিবাড়ী নামলুম। দে সাহেবের ঐ ছিল কর্ম্মস্থল এবং বাবাও তাঁর ব্যবসার কি তদ্বিরের জন্য সে সময়ে ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেসনে যখন আমি দে সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি—তখন সেই সুন্দরীর দিকে চেয়ে দেখি, সে মুখে হাসির রেখা পর্য্যন্ত নেই। যে চোখ এতক্ষণ বিদ্যুতের মত চঞ্চল ছিল, সে চোখ এখন তারার মত স্থির হয়ে রয়েছে, আর তার ভিতরে কি একটা বিষাদ, একটা নৈরাশ্যের কালো ছায়া পড়েছে। সে দৃষ্টি যখন আমার চোখের উপর পড়ল, তখন আমার মনে হল, তা যেন স্পষ্টাক্ষরে বল্‌লে "আমি এ জীবনে তোমাকে আর ভুলতে পারব না; আশা করি তুমিও আমাকে মনে রাখবে।" মানুষের চোখে যে কথা কয় একথা আমি আগে জানতুম না। অতঃপর আমি চোখ নীচু করে সেখান থেকে চলে এলুম।

তারপর যা হ'ল, শোনো। আমি এ বিয়েতে বাবার মত করালুম। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তার উপর আবার ভালো ছেলে; সুতরাং বাবা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে দ্বিধা কর্‌লেন না। প্রস্তাবটা অবশ্য বরের পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হল। উভয় পক্ষের ভিতর মামুলি কথাবার্ত্তা চল্‌ল। তারপর আমরা একদিন সেজেগুজে মেয়ে দেখতে

গেলুম। মেয়ে আমি আগে দেখ্‌লেও বাবা ত দেখেন নি। তা ছাড়া রীত রক্ষে বলেও ত একটা জিনিস আছে।

দে সাহেবের বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হবার পর, খানিকক্ষণ বাদেই একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের স্বমুখে এনে হাজির করা হল। সে এসে দাঁড়াবামাত্র আমার চোখে বিদ্যুতের আলো নয় বুকে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগ্‌ল। এ সে নয়—অন্যটি। সাজগোজের ভিতর তার কদর্য্যতা জোর করে ঠেলে বেরিয়েছিল। আমি যদি তার সেদিনকার মুর্ত্তির বর্ণনা করি, তাহলে নিষ্ঠুর কথা বলব। তার কথা তাই থাক্। আমি এ ধাক্কায় এতটা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম যে, কাঠের পুতুলের মত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পর্দ্দার আড়াল থেকে পাশের ঘরে একটি মেয়ে বোধহয় আমার ঐ অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল। আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না—সে হাসি কার। আমি যদি কবি হতুম—তাহলে সেই মুহূর্ত্তে বলতুম "ধরণী দ্বিধা হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

ব্যাপার কি হয়েছিল জানো, যে মেয়েটিকে আমাকে দেখানো হয়েছিল, সে হচ্ছে দে-সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা আর যাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল সে হচ্ছে দে বাহাদুরের বিবাহিতা স্ত্রী, অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের। বলা বাহুল্য আমি এ বিবাহ করতে কিছুতেই রাজি হলুম না, যদিচ বাবা বিরক্ত হলেন, দে-সাহেব রাগ করলেন, আর দেশশুদ্ধ লোক আমার নিন্দা কর্‌তে লাগ্‌ল।

এ ঘটনার হপ্তা খানেক বাদে ডাকে একখানি চিঠি পেলুম। লেখা স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠি এই—

"যদি আমার প্রতি তোমার কোনরূপ মায়া থাকে, তাহলে তুমি ঐ বিবাহ করো, নচেৎ এ পরিবারে আমার তেষ্টানো ভার হবে।

কিশোরী—

এ চিঠি পেয়ে আমার সংকল্প ক্ষণিকের জন্য টলেছিল; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম ও কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা দুজনেই এক ঘরের লোক এবং দুজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবে এবং সে দুই মিথ্যাভাবে। নিজের মন যাচিয়ে বুঝ্‌লুম, চিরজীবন এ অভিনয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই হচ্ছে আমার গল্প—এখন তোমরা স্থির কর যে, এ ট্রাজেডি, কি কমেডি, কিম্বা এক সঙ্গে ও দুই।

প্রফেসর এই বলে থাম্‌লে, অনুকুল হেসে বল্‌লে—

—"অবশ্য কমেডি। ইংরাজিতে যাকে বলে Comedy of Errors."

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—

—"মোটেই নয়, এ শুধু ট্রাজেডি নয় একেবারে চতুরঙ্গ ট্রাজেডি।"

ঐ চতুরঙ্গ বিশেষণের সার্থকতা কি প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর কর্‌লেন,—

—"স্ত্রী কিশোরী আর প্রোফেসার কিশোরী এই দুই কিশোরীর পক্ষে ব্যাপারটা যে কি ট্রাজিক তা ত সকলেই বুঝ্‌তে পারছ। আর এটা বোঝাও শক্ত নয়, যে দে-সাহেবের মনের শান্তিও চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল, আর তাঁর মেয়ের হয় আর বিয়ে হল না, নয় কোনও বাঁদরের সঙ্গে হ'ল।"

প্রফেসর এর জবাবে বল্‌লেন, "শ্রীমতীর জন্য দুঃখ করবার

কিছু নেই, তার আমার চাইতে ঢের ভাল বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সে আমার দ্বিগুণ মাইনে পায়। কথাটা হয় ত তোমরা বিশ্বাস করছ না কিন্তু ঘটনা তাই। দে বাহাদুর দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে একটি M. A.-এর সঙ্গে তার বিবাহ দেন, তার পরে সাহেব সুবোকে ধরে, তাকে ডেপুটি করে দেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তাকে খালি পায়ে বেড়াতে হ'ত, এখন সে দু'বেলা জুতো মোজা পরছে। তার পর বলা বাহুল্য, যে দে-বাহাদুরের যে রকম আকৃতি প্রকৃতি, তাতে করে তিনি ট্রাজেডি দূরে থাক কোনও কমেডিরও নায়ক হতে পারেন না, তাঁর যথার্থ স্থান হচ্ছে প্রহসনের মধ্যে।"

—"আচ্ছা তা হলে তোমাদের দুজনের পক্ষে ত ঘটনাটা ট্রাজিক?"

—"কি করে জানলে? অপর কিশোরীর বিষয় ত তুমি কিছুই জানো না, আর আমার মনের খবরই বা তুমি কি রাখো?"

—"আচ্ছা ধরে নিচ্ছি যে, অপরটির পক্ষে ব্যাপারটা হয়েছে comedy, খুব সম্ভবত তাই—কেননা তা নইলে তোমার দুর্দ্দশা দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌বে কেন? কিন্তু তোমার পক্ষে যে এটা ট্রাজেডি, তার প্রমাণ, তুমি অদ্যাবধি বিবাহ করো নি।"

—"বিবাহ করা আর না করা, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড় ট্রাজেডি তা যখন জানিনে, তখন ধরে নেওয়া যাক—করাটাই হচ্ছে comedy. যদিচ বিবাহটা কমেডির শেষ অঙ্ক বলেই নাটকে প্রসিদ্ধ। সে যাই হোক্ আমি যে বিয়ে করি নি তার কারণ—টাকার অভাব।

—"বটে! তুমি যে মাইনে পাও তাতে আর দশজন ছেলে পিলে নিয়ে ত দিব্যি ঘর সংসার করছে।"

—"তা ঠিক। আমার পক্ষে তা করা কেন সম্ভব নয়, তা বল্‌ছি। বছর কয়েক আগে বোধ হয় জানো, যে, পাটের কারবারে একটা বড় গোছের মার খেয়ে বাবার ধন ও প্রাণ দুই এক সঙ্গে যায়। ফলে আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। তারপর এই চাকুরিতে ঢুকে মা'র অনুরোধে বিয়ে করতে রাজি হলুম। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল, আমি অবশ্য মেয়ে দেখি নি কিন্তু পাকা দেখাও হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে আবার এক খানি চিঠি পেলুম, লেখা সেই স্ত্রী হস্তের। সে চিঠির মোদ্দা কথা এই যে, লেখিকা বিধবা হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কপর্দ্দক শূন্য। দে-সাহেব তাঁর উইলে তাঁর স্ত্রীকে এক কড়াও দিয়ে যান নি। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ঘুষের টাকা তিনি তাঁর কন্যারত্নকে দিয়ে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে খোরপোষের মামলা করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়ে ছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে মামলা করা থেকে নিবৃত্ত করে, তাঁর সংসারের ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। ভেবে দেখো দেখি, যে গল্পটা তোমাদের বললুম, সেটা আদালতে কি বিশ্রী আকারে দেখা দিত। বলা বাহুল্য, এর পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলুম, মা বিরক্ত হলেন, কন্যা পক্ষ রাগ করলেন, দেশশুদ্ধ লোক নিন্দে করতে লাগল কিন্তু আমি তাতে টল্‌লুম না। কেননা দু'সংসার চালাবার মত রোজগার আমার নেই।

—"দেখো তুমি অদ্ভুত কথা বল্‌ছ, একটি হিন্দু বিধবার আর কি লাগে, মাসে দশ টাকা হলেই ত চলে যায়, তা আর তুমি দিতে পারো না?"

—"যদি দশ টাকায় হতো তাহলে আমি পাকা দেখার পর বিয়ে

ভেঙ্গে দিয়ে সমাজে দুর্ণামেরভাগী হতুম না। সে একা নয়, তার বাপ মা আছে, তারা যে হতদরিদ্র তা বোধ হয়, তাদের দে-সাহেবকে কন্যাদান থেকেই বুঝতে পারো। তারপর আমি যে ঘটনার উল্লেখ করেছি তার সাত মাস পরে তার যে কন্যাসন্তান হয় সে এখন বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এই সবকটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাকেই কর্‌তে হয়, আর তা অবশ্য দশ টাকায় হয় না।"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"তার রূপ আজও কি আলোর মত জ্বল্‌ছে?"

—"বল্‌তে পারি নে, কেননা তার সঙ্গে সেই ট্রেণে ছাড়া আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি।"

—"কি বল্‌ছ, তুমি তার গোনাগুষ্ঠি খাইয়ে পরিয়ে রাখ্‌ছ আর সে তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করে নি?"

—"একবার কেন, বহুবার সাক্ষাৎ কর্‌তে চেয়েছিল কিন্তু আমি করি নি।"

অনুকূল হেসে বল্‌লে, "পাছে 'নেশার অনুরাগ খোঁয়ারির রাগে পরিণত হয়' এই ভয়ে বুঝি?"

—"না তার কন্যাটি পাছে তার দিদির মত দেখ্‌তে হয় এই ভয়ে।"

শেষে আমি বল্‌লুম, "প্রফেসার তোমার গল্প উৎরেছে। তুমি করতে চাইলে বিয়ে তা হ'ল না, কিন্তু বিয়ের দায়টা পড়্‌ল তোমার ঘাড়ে। এ ব্যাপার যদি ট্রাজি-কমেডি না হয়, ত ট্রাজি-কমেডি কাকে বলে তা আমি জানি নে"।

সুপ্রসন্ন বল্‌লে—

—"তা হতে পারে, কিন্তু এ গল্প ছোট গল্প হয় নি, কেননা, এতক্ষণে ষোলপেজ পেরিয়ে গেল।"

প্রশান্ত অমনি বলে উঠল যে—

"তা যদি হয়ে থাকে ত সে প্রফেসারের গল্প বলার দোষে নয়— তোমাদের জেরা আর সওয়াল জবাবের গুণে।"

প্রফেসার হেসে বল্‌লেন—"প্রশান্ত যা বল্‌ছে তা ঠিক, শুধু "তোমাদের" বদলে "আমাদের" ব্যবহার কর্‌লে তার বক্তব্যটা ব্যাকরণ শুদ্ধ হত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

"এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়"।

—*—

(১)

আমার একটি আড়াই বছরের ভ্রাতুস্পুত্র আছেন যাঁর নাম, "ছোট-কালী বাবু।" তিনি যে লোককে চেনেন না, তাকে বলেন—"কেউ নয়," আর যে জিনিষ জানেন না তাকে বলেন—"কিছু নয়।" যখন শুনি, আমাদের পলিটিক্সের একদল বলছেন, Reform-scheme "কিছু নয়," তখন আমার ছোট কালী বাবুর কথা মনে পড়ে যায়।

(২)

আমর ভ্রাতুস্পুত্রটির আর একটি গুণ আছে। কোন জিনিষ তাঁর হাতে এলে, তিনি বুক ফুলিয়ে এবং গলা মোটা করে বলেন, "এত্তো বড়"—তা সে বস্তু যতই ছোট হো'ক। যখন শুনি আমাদের পলিটিক্সের আর এক দল বলছেন, Reform-scheme, "এত্তো বড়," তখনও আমার ছোট কালী বাবুর কথা মনে পড়ে।

(৩)

পলিটিক্সের জগতে, আমরা আজও সাবালক হই নি, কিন্তু তাই বলে আমাদের পলিটিক্সের বড়বাবুরা যে সব ছোট কালী বাবু এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং এঁদের এই সব মৎকরাকা মত প্রকাশের নিশ্চয়ই অপর কারণ আছে।

(৪)

সে কারণ হচ্ছে "যুদ্ধজ্বর।" Reform-scheme-ও বার হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশে যুদ্ধজ্বরও এসে পড়্‌ল। এ জ্বরে ধরলে মানুষে বেহোঁস হয়। সুতরাং এই জ্বরের প্রকোপে উক্ত Scheme সম্বন্ধে যা বলা কওয়া হয়েছে, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কেন না সে সময়ে বক্তাদের কারও মাথার ঠিক ছিল না।

(৫)

এ জ্বর যে আমাদের পলিটিসিয়ানদের গায়েই বেশি করে ফুটে উঠে ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে,—Bengal Provincial Conference-এর সেদিনকার অধিবেশনে। সে সভার temperature সেদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ১০৫ ডিগ্রীর উপরে উঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে ক্ষেত্রে কারও কারও জ্বর যে বিকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে—তাঁদের বক্তৃতায়। শুনতে পাই এদেশের জনৈক অতি-বক্তা নাকি বলেছিলেন, যে "স্বরাজ" তিনি President Wilson-এর কাছে চেয়ে নেবেন। এ রকম প্রলাপ অবশ্য বাংলা দেশে কেউ সজ্ঞানে বক্‌তে পারে না, কেননা বাঙালীতে ও কাঙালীতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

(৬)

এই যুদ্ধজ্বরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাচ্ছি দু-দলেরই মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। যাঁরা আগে বলেছিলেন 'কিছু নয়', তাঁরা এখন বলছেন, 'না, কিছু বটে', আর যাঁরা আগে বলেছিলেন

'এত্তো বড়,' তাঁরা এখন বলছেন—'না ত্যাত্তো বড় নয়'। এখন যদি উভয় পক্ষ একত্র হয়ে এ বিষয়ে হিসাব মোকাবিলা করেন, ত আমার বিশ্বাস উভয় পক্ষই দেখ্‌তে পাবেন যে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোনও গরমিল নেই। স্থতরাং বামমার্গ এবং দক্ষিণ মার্গের পলিটিসিয়ানদের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁরা এই ফাঁকে তাঁদের আড়া-আড়ির তাড়াতাড়ি একটা আপোষ মীমাংসা করে নিন্। এ সুযোগ কোন পক্ষেরই হারানো উচিত নয়, কেননা যুদ্ধ-জ্বরের আবার relapse হয় এবং তা হলে, ব্যাপার হয়ে ওঠে একেবারে মারাত্মক।

(৭)

কিন্তু আমাদের এ প্রার্থনায় কোন পক্ষ যে কর্ণপাত কর্‌বেন, সে বিষয়ে বড় একটা ভরসা নেই। এঁরা বল্‌বেন, পলিটিক্স শুধু হিসেব নিকেশের কথা নয়, ও হচ্ছে আসলে হৃদয়ের কথা। যাদের মধ্যে বুকের মিল নেই, তাদের মধ্যে মুখের মিল কদিন থাক্‌বে?

(৮)

হৃদয়ের দোহাই দিলে এ দেশে নির্ব্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের দেশে "এত্তো বড়" জিনিষ। যার মাথা নেই তার মাথা-ব্যথার কথা শুন্‌লে আমরা অবশ্য হাসি কিন্তু যার বুক নেই তার বুকের ব্যাথার কথা শুন্‌লে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্যেই ত এদেশে কোনও কাজের কথা বলা এত কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিষ; এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচুদরের জিনিষ এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু মস্তকের সঙ্গে হৃদয়ের একটা

মস্তপ্রভেদ আছে। মানুষের মাথায় দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ সে যে তত হৃদয়বান এই হচ্ছে লোক-মত। এ মতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কেননা সে তর্ক লোকে কানে তুল্‌বে না। এ কথা কে না জানে যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"।

(৯)

তবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ও স্বরাজ-প্রাপ্তির উপায় এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। তারপর পলিটিক্সে আমরা যাকে হৃদয়াবেগ বলি, সে চাঞ্চল্যের মূল হৃদয়ে কি মস্তকে তাও ঠিক জানা নেই। আমরা যে আজ তিনপুরুষ ধরে পলিটিক্সের বিলিতি মদ্য পান করে আস্‌ছি সে কথা ত আর অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের এই পলিটিকাল ছট্‌ফটানির মূলে হৃদয়ের লালরক্তই বা কতখানি আছে আর বিলাতের লালপানীই বা কতখানি আছে,—অর্থাৎ বুকের ব্যাথাই বা কতখানি আছে, আর বইয়ের কথাই বা কতখানি আছে তা কে জোর করে বল্‌তে পারে?

(১০)

তন্ত্রশাস্ত্রে বলে,—"নাভিষেকাৎ বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্য সেবনাৎ" এ কথা যে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। এতকাল আমরা বিলাতি পলিটিক্সের শুধু মদ্যপান করে এসেছি এইবার Reform-scheme-এর প্রসাদে সে পলিটিক্সে আমরা অভিষিক্ত হব। এ শুধু যথালাভ নয়—মহালাভ। এর কারণ, এ তন্ত্রে

অভিষেকের আমাদের পক্ষে প্রয়োজন আছে। পেট্রিয়টিজম ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু পলিটিক্স হচ্ছে কর্ম্ম, এবং অপরাপর কর্ম্মের ন্যায় এ কর্ম্মেও কৃতীত্ব লাভ করবার জন্য কিঞ্চিৎ শিক্ষা দীক্ষার দরকার। তা ছাড়া ডিমোক্রাসি স্বদেশী মাল নয়—আহেল বিলাতি জিনিস, এবং এ বস্তুর এতদিন আমরা শুধু কাগজে কলমে চর্চ্চা করে এসেছি—এখন হাতে কলমে চর্চ্চা করবার দিন এসেছে।

(১১)

এই অভিষেক কথাটাই ত যত গোল বাধিয়েছে। বামাচারী ও দক্ষিণাচারীদের যত মারামারি সে সবই ত এ Scheme-য়ে ঐ বস্তুর অস্তি নাস্তি নিয়ে। কিন্তু এ নিয়ে অতি তুষ্ট কিম্বা অতি রুষ্ট হবার কোনও কারণ ত আমি দেখতে পাই নে। অতিতুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি মনে ভাবছেন যে, এই Scheme-এর প্রসাদে তাঁরা অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করেছেন? আর অতিরুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি মনে ভেবেছিলেন যে, ইংরাজ-রাজ, এই সুযোগে ভারতবাসীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে, একছুটে "বাণপ্রস্থ" অবলম্বন করবেন?

(১২)

যারা রূপকথার রাজ্যে কিম্বা পৌরাণিক যুগে বাস করে না, তাদের বক্তব্য এই যে, Reform-scheme, আকাশের চাঁদও নয় দিল্লীর লাড্ডুও নয়, কিন্তু এমন জিনিষ—যার সাহায্যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলবার সুযোগ পাব। ভুলে গেলে চল্‌বে না, যে স্বরাজ যখন আমরা উত্তরাধিকারীসত্ত্বে লাভ

করি নি, তখন তা আমাদের অর্জ্জন করতে হবে। এবং এ অর্জ্জন সাধনা অতএব সময়সাপেক্ষ।

(১৩)

সে যাই হোক্ এই Reform-Scheme-এর দৌলতে আর কিছু না হোক্ আমরা অন্তত একটা বিদ্যে শিখব। এই যুদ্ধের কৃপায় আমরা যেমন জিওগ্রাফি শিখেছি, এই Reform-এর কৃপায় আমরা তেমনি Constitutional Law শিখ্‌ব। তারপর যুদ্ধের ফলে আমাদের ঘরে ঘরে যেমন সব বড় বড় general তৈরি হয়ে উঠেছে, এই Reform-এর ফলে ঘরে ঘরে সব বড় বড় constitution builders তৈরি হয়ে উঠ্‌বে। ইতিমধ্যেই উকিলের আপিসে ও Bar Library-তে দু'চার জন "এত্তো বড়" constitution builder দেখা দিয়েছেন। জাতির পক্ষে এটা কি একটা কম লাভ! অতএব "এত্তো বড়" কথাটা কিছুতেই বলা যায় না যে Reform-scheme—"কিছু নয়"।

বীরবল।

ছোট কালীবাবু।

(তেপাটি) *

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়েস তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যবে সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
ব্যামো হলে ব্রাণ্ডি খায়, খায় নাকো সাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর,
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

* ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটি ছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটি। সে সকল তেপাটিতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত দুই জমির ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙ্গা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরৎ করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটি লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরৎ। Triolet অষ্টপদী কবিতা। এই আট পদের ভিতর, প্রথম পদটি ধুয়ো হিসেবে আর দু'বার, আর দ্বিতীয় পদটি আর একবার দেখা দেয়। তা ছাড়া এ পদ্যের ভিতর শুধু একজোড়া মিল আছে। প্রথম তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আর সপ্তম পদ একসঙ্গে মেলে; বাকী তিন পদ একসঙ্গে মেলে। বলা বাহুল্য এ কবিতার ভাব ভাষা দুই নেহাৎ হাল্কা হওয়া চাই।

ভাদ্র, ১৩২৫

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৩৫

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পত্র।

—:০:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

তোমার চিঠির জবাব অনেক দিন হ'ল লিখে রেখেছি, কিন্তু কতকগুলি দৈব-ঘটনার ধাক্কায় এতদূর অব্যবস্থিত চিত্ত হ'য়ে পড়েছিলুম যে, এতদিন সে জবাব তোমাকে পাঠাতে পারি নি। ব্যাপার যা ঘটেছিল বল্‌ছি। প্রথমে আবির্ভূত হ'ল—Reform Scheme, তার পিঠ পিঠ এল—ভূমিকম্প, তারপর দু'দিন না যেতেই ঘাড়ে পড়্‌ল—যুদ্ধজ্বর, তারপর দেখা দিল অকাল-নিদাঘ। এ জ্বরে যে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য। যে বিপদ দেশশুদ্ধ লোক মাথা পেতে নিয়েছে, আমি যে তা আমার দেহকে স্পর্শ কর্‌তে দেব না, আমার প্রকৃতি ততটা অসামাজিক নয়। এই যুদ্ধজ্বরে ছুঁলে মানুষের যে মাথা ঘুলিয়ে যায়, সেকথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এর উপর যদি আবার এই সব আকস্মিক উপদ্রবের কার্য্য-কারণ ও ফলাফল নিয়ে ঘরে বাইরে ঘোর ও জোর তর্ক কর্‌তে হয়, তাহ'লে মানুষের মাথার অবস্থা যে কি রকম হয় তা সহজেই বুঝ্‌তে পারো। ও অবস্থায় চিঠি ডাকে দেওয়া প্রভৃতি ছোটখাটো সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি ব্যক্তিবিশেষ যদি মাসাবধি কাল উপেক্ষা করে, তাহ'লে তার বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না।

আমরা এই মাসখানেক ধরে' কি কি বিষয় নিয়ে কোন্ কোন্ তর্ক করেছি, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি। এই আষাঢ়ে গ্রীষ্ম ভুঁইফুড়ে উঠেছে কিনা, অর্থাৎ তা ভূমিকম্পের ফল কিনা, অথবা দেশের এতটা গা গরম হবার কারণ এই কিনা যে, আমাদের মাতৃভূমির গায়েও যুদ্ধজ্বর হয়েছে, তারপর ভূমিকম্পটা জ্বর আস্‌বার আগে পৃথিবীর দেহের কাঁপুনি মাত্র, না আর কিছু, এই সব গুরুতর সমস্যা নিয়ে আমার চারপাশে দিনের পর দিন রাতের পর রাত নানারূপ বৈজ্ঞানিক, অ-বৈজ্ঞানিক এবং অতি-বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলেছে। এবং আমাকে তাতে বরাবর যোগদান কর্‌তে হয়েছে।

এ সকল বিষয়ে নীরব থাক্‌লে আমি যে স্বদেশ ও স্বজাতির ভাল মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে বিষয়ে অবশ্য কারও মনে আর কোনও সন্দেহ থাক্‌ত না।

তর্কে অবশ্য এ সকল সমস্যার কোনও কালে মীমাংসা হয় না, এবং হ'তে পারে না। অতএব এবং অতঃপর ভোটে স্থির হ'য়ে গেল, যে Reform Scheme-এর জন্ম হচ্ছে এই সব নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক উৎপাতের কারণ। বৌদ্ধশাস্ত্রে পড়েছ ত যে, বুদ্ধদেবের জন্মের সময় জম্বুদ্বীপে কি প্রলয় ব্যাপার ঘটেছিল, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সব পর্ব্বত হ'য়ে গিয়েছিল হ্রদ আর সব হ্রদ হয়ে গিয়েছিল পর্ব্বত।

অতএব সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে দাঁড়াল এই যে, এই অকাল-নিদাঘের কারণ যুদ্ধজ্বর—এই যুদ্ধজ্বরের কারণ ভূমিকম্প এবং এই ভূমিকম্পের কারণ Reform Scheme, কেননা ঐ Scheme সম্বন্ধে বাসুকী অসম্মতিসূচক মাথা নেড়েছেন। এর কারণও স্পষ্ট, "শেষ" যে Extremist, সে কথা যে কোনও অভিধানে যাচিয়ে নিতে পারো।

সে যাইহোক্, এই Reform Scheme-এর স্পর্শে আমাদের মনের দেশে যে একটা বেজায় ভূমিকম্প হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড ফাট ধরেছে এবং তার ভিতর দিয়ে বেরচ্ছে এখন অনর্গল ধোঁয়া। আমার জনৈক রাসায়নিক বন্ধু বলেন, সে ধোঁয়া Poisonous gas! যে ধোঁয়ায় আমাদের দেশ আজ ছেয়ে ফেলেছে, তা বিষাক্ত হোক্ আর না হোক্, তা যে আমাদের চোখে ঢুকেছে তার আর সন্দেহ নেই, কেননা আমরা কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে, কাজেই সে চোখ কেবলই রগ্‌ড়াচ্ছি, আর লাল কর্‌ছি। এই ত আমাদের অবস্থা।

আসল কথা এই, এই কলিকাতা মহানগরীতে আমারা যা হয় একটা হুজুগ না নিয়ে বেশি দিন থাক্‌তে পারি নে। যদি একটা টাট্‌কা হুজুগের মাল বাইরে থেকে না আসে, তাহ'লে আমরা তা ঘরে বসে বানাই। ঐ হচ্ছে একমাত্র স্বদেশী industry, যাতে আমরা সম্পূর্ণ কৃতীত্ব লাভ করেছি। আমাদের ধারণা, আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে হুজুগ হচ্ছে একটা প্রধান উপায়। সম্প্রতি একটা হুজুগের অভাবে আমরা একটু মিইয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময় আমাদের কপাল গুণে Reform Scheme আমাদের হাতে এসে পড়্‌ল, অমনি তাই নিয়ে আমরা একটা মহা গোলযোগ বাধিয়ে দিয়েছি। এ হুজুগে যে আমিও মাতি নি, সে কথা বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে।

আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের এমন একটি সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি, যে ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যত অনেকটা স্থির হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় ভয়ের কথাও ঢের আছে, ভরসার কথাও ঢের আছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে যাদের চিত্ত ব'লে একটা পদার্থ আছে তাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক। সাহিত্যে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হ'লেও ব্যবহারিক জীবনে জাতিগত প্রাণ; কেননা আমাদের জাতি ব'লে কোনও একটা জিনিষ নেই। সাহিত্য জগতে অবশ্য এমন সব মুক্ত পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যাঁরা স্বদেশের খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও নির্ব্বিকার চিত্তে কাব্যকলার চর্চ্চা করে গেছেন, যথা—Leonards da Vince এবং Gœthe, কিন্তু এঁরা হচ্ছেন মনোজগতের স্বর্লোকের অধিবাসী, আর আমরা হচ্ছি তুচ্ছ ভূ-লোকের। সুতরাং তাঁদের পক্ষে যা শোভা পায়, আমাদের পক্ষে তা ধৃষ্টতা মাত্র। ভাগবতে দেখ্‌তে পাই, শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি আছে, তাঁদের কার্য্যকলাপ সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণীয় নয়।

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়"—এ উপদেশ অর্জ্জুনের জন্য, তোমার আমার জন্য নয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—অতএব কর্ত্তব্যও নয়।

ফরাসী কবি Theophile Gautier-এর কাব্য আমার নিকট চিরদিনই আদরের সামগ্রী; তবুও তাঁর Emaux et Camées-এর গৌরচন্দ্রিকা আমার কাছেও চক্ষুঃশূল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে যিনি প্যারিসে বসে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে স্ত্রীজাতির কর-চরণ-বসন-ভূষণের বিষয় কবিতা রচনা করেছিলেন, তিনি অবশ্য এক-জন অতি বাহাদুর লোক। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যে নিজকে Gœthe-

এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, ঐ কথাটাই আমার কানে খারাপ লাগে। কেননা কবি হিসেবে Gautier-এর সঙ্গে Gœthe-এর সেই প্রভেদ কাব্য হিসেবে Mademoiselle de Maupin-এর সঙ্গে Faust-এর যে প্রভেদ। সুতরাং Gœthe-র পক্ষে যে ঔদাসিন্য স্বাভাবিক Gautier-এর পক্ষে তা নিতান্তই কৃত্রিম। এই কারণে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী জর্ম্মাণ সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ প্যারিসে বন্দী হয়ে Gautier-র মন্ত্র-শিষ্য Banville যে সব Idylles Prussiennes রচনা করেছিলেন, আমার কাছে আজকের দিনে তাঁর গুরুর কবিতার চাইতে তা ঢের বেশি উপাদেয়। এ সকল কবিতা Banville-এর বুকের তাজা রক্তে ছোপানো কিন্তু তাতে ক'রে সে সব কবিতার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, কেননা তার ভিতর অতিরঞ্জিত কিছুই নেই। যে রক্তে তাঁর কবিতা রঞ্জিত, সে রক্ত হচ্ছে কবির বুকের রক্ত; সাধারণ লোকের নয়, সুতরাং হিংসায় তা বিকৃত নয়, মদে তা কলুষিত নয়। Banville নিজেকে কাব্য-রাজ্যের বাজিকর বলে' পরিচয় দিয়েছেন। সেই বাজিকর এক্ষেত্রে বেদনার বলে যাদুকর হয়ে উঠেছেন। এই সব কবিতা এত যে মর্ম্মস্পর্শী—তার কারণ Banville মানুষের মনের কথা দেবতার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বিজীত ফ্রান্সের শোক যাঁর অন্তরে বিজয়ী শ্লোকে পরিণত হয়েছে, তাঁর প্রাণের বেদনা বিশ্বমানবের চির-আনন্দের সামগ্রী হয়ে রয়েছে। তবে সাহিত্যিকদের পক্ষে পলিটিক্স সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া অসম্ভব হলেও নির্লিপ্ত থাকা যে কর্ত্তব্য Gautier-এর একথা আমি মান্য করি।

Banville-র চিত্তচাঞ্চল্য কাব্য-জগতে যে স্থির সৌদামিনী হয়েছে, তার কারণ তাঁর রাগ বিরাগ, তাঁর আশা নৈরাশ্য, তাঁর হাসি

কান্নার মূলে ছিল পেট্রিয়টিজম্—পলিটিক্স্ নয়। এর প্রথমটি সাহিত্যের বিষয় হলেও দ্বিতীয়টি নয়। পেট্রিয়টিজম্ ও পলিটিক্স্ যে এক বস্তু নয়, তার প্রমাণ,—নিত্য দেখতে পাওয়া যায় যে, যার দেহে পেট্রিয়টিজমের লেশমাত্র নেই, তিনিও পলিটিক্সের দরবারে উচ্চ আসন অধিকার কর্‌ছেন। অনেকের ধারণা, পলিটিক্স পাকা কর্‌তে হলে পেট্রিয়টিজমকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে এ কথাও সত্য যে পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে হলে পলিটিক্সকে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। এ কথার ত ভুল নেই যে, পলিটিক্স পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত করে। একমাত্র শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটালে প্রাচীন সমাজ যদি রাতারাতি নবীন হয়ে উঠ্‌ত, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। সাহিত্যের ভাবনা পলিটিক্সের ভাবনার চাইতে ঢের বেশি গুরুতর—কেননা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রাচীনকে নবীন করা। সে যাইহোক্ সরস্বতীর সেবক-দের পক্ষে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকাই কর্ত্তব্য। ও যুদ্ধে সাহিত্যিকেরা যোগদান কর্‌লে পলিটিক্সেরও বিপদ সাহিত্যেরও ক্ষতি।

সাহিত্যিকেরা পলিটিক্‌সে কি গোল বাঁধান সে সম্বন্ধে নানা পলিটি-সিয়ান নানা কথা বলেছেন, সে সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাঁদের সকল কথার সারমর্ম্ম এই যে, পলিটিক্‌সের আসরে সাহিত্যিকের আসা পলিটিক্‌স ব্যবসায়ীদের কাছে তদ্রুপ ভয়াবহ, জুরির বাক্সে স্কুল মাষ্টারের বসা আইন ব্যবসায়ীদের কাছে যদ্রুপ ভয়াবহ। তবে যে পলিটিসিয়ানরা সাহিত্যিকদের দলে টান্‌বার জন্য সময়ে সময়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তার কারণ সারস্বতদের হাতে কলম নামক একটি বস্তু আছে,

যা নাকি অস্ত্র হিসেবে তলোয়ারের চাইতেও জবর। কলমের মুখ তলোয়ারের চাইতে বেশি ধারালো হোক্ আর না হোক্ এ যুগে অসিজীবীর চাইতে মসিজীবীর প্রতাপ বেশি বই কম নয়। পুরাকালে রাজনীতির লড়াই রাজায় রাজায় হ'ত, সুতরাং রাজার অস্ত্র তরবারীই ছিল সে কালের প্রধান অস্ত্র; একালে রাজনীতির লড়াই হয় রাজায় প্রজায়, সুতরাং প্রজার অস্ত্র কলমই হচ্ছে একালের প্রধান অস্ত্র। এই কারণে পলিটিসিয়ানরা সাহিত্যিকদের এলেম চান্ না—চান্ শুধু তাদের কলম। কিন্তু কলম হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিষ যা কাউকে ধার দেওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বচন এই যে—

> "লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতাগতা।
> কদাচিৎ পুনরায়াতা ভ্রষ্টা মুষ্টা চ চুম্বিতা ॥"

এই কারণেও পলিটিক্‌সের হাটে বাজারে কলম আমাদের সাম্‌লে রাখাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে এই যে, পলিটিক্‌সের রাজ্য আমাদের দেশ নয়। ওদেশে গেলে আমাদের জাত যায়, কেননা আমাদের যা ধর্ম্ম, ওরাজ্যে তার চর্চ্চা কর্‌বার যো নেই। ওদেশে টিঁকে থাক্‌তে হলে সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে পরের মতের ছাইচাপা দিতে হয়। পলিটিকাল জগতে এক অদ্বৈতবাদ ছাড়া অপর কোনও বাদ চলে না। যে দলেই যাও দেখ্‌তে পাবে নেতারা নিজেদের বল্‌ছেন "সোঽহং" আর নীতরা তাঁদের বলছেন "তত্ত্বমসি।" আমাদের পক্ষে অবশ্য অদ্বৈতবাদী হওয়া অসম্ভব, কেননা আমাদের মনের

যত কারবার সে সবই এই বহুরূপী বিশ্বের সঙ্গে, আর সেই কারণেই আমরা বহুবাদী। তারপর, পরের মতে সায় দিয়ে আমরা আমাদের মনের স্বাধীনতা হারাতে প্রস্তুত নই। কেননা স্বাতন্ত্র্যের চর্চ্চাটা আমাদের একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিলোক তার নিজের স্বাধীনতা না হারালে সমগ্রজাতি যে তার স্বাধীনতা লাভ করে না, যে গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, সে শাস্ত্রে আমাদের দখল নেই। সে যাই হোক্ পলিটিক্‌সে এমন অনেক কথা বল্‌তে হয়, যার অর্থের সন্ধান নিতে গেলে ওক্ষেত্রে অনর্থ ঘটে। তারপর পলিটিক্‌সে স্বপক্ষ-বাৎসল্য ও বিপক্ষ-বিদ্বেষ কিঞ্চিৎ অতি মাত্রায় চর্চ্চা কর্‌তে হয়, নচেৎ দল বাঁধা যায় না। এ ক্ষেত্রে উদারতা দুর্ব্বলতা এবং নিরপেক্ষতা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই গণ্য। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে যে কতদূর লাঞ্ছিত গঞ্জিত, পীড়িত ও বিড়ম্বিত হ'তে হয়, ইতিহাসে তার একটি মস্ত বড় উদাহরণ আছে—বেচারা Cicero! তার লাঞ্ছনা যিশুখৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে সুরু হয়েছে, আজও তার শেষ হলো না; রোমের জের এখন জর্ম্মাণী টানছে। অথচ Cicero-র অপরাধ কি?—তিনি থেকে থেকেই সাহিত্য চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে রোমের Republic রক্ষা কর্‌তে প্রাণপণ বাক্যব্যয় কর্‌তেন। ফলে সে Republic'ও রক্ষা হয় নি এবং সাহিত্যের republic-এও তিনি যথাযোগ্য স্থান পান নি। পলিটিক্‌সের শাস্তিভোগের হাত থেকে তিনি আত্মহত্যা করেও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পলিটিক্‌সের চর্চ্চা ত দেশশুদ্ধ লোকে করে, এমন কি এ ক্ষেত্রে রাম-শ্যাম-হরি ত জ্যেষ্ঠ অধিকারী বলেই গণ্য! তবে Cicero-র উপর নানা-দেশের নানা-লোকের নানা-ভাষায় নানা-রকম

কটু কথার কারণ কি? কারণ এই যে, এ চর্চ্চায় তিনি স্বাধিকার প্রমত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, ভগবান তাঁকে অসাধারণ বাক্‌শক্তি দান করেছিলেন, সেই শক্তি তিনি পলিটিক্‌সে অপব্যয় করেছিলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্য তাই তাঁকে অদ্যাবধি করতে হচ্ছে। আণ্টনীর ধর্ম্মপত্নী Fulvia, Cicero-র ছিন্নমস্তকের মুখে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করে' যে স্বামীভক্তির পরিচয় দিয়েছিল, আজকের দিনে অসংখ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত তাঁদের লেখনীর নিষ্ঠিবন Cicero-র প্রেতাত্মার গায়ে নিক্ষেপ করে, সেই স্বামী ভক্তির পরিচয় দিচ্ছেন! অবশ্য এঁদের স্বামী আণ্টনি নন—Cæsar, জার্ম্মাণদেশে যিনি Kaiser রূপ ধারণ করেছেন।

এইখানেই থামা যাক্, নচেৎ তুমি বল্‌বে আমি শুধু বিদ্যে দেখাচ্ছি। অবশ্য ও অপরাধের ভয়ে নিরস্ত হবার কোনরূপ কারণ নেই। পলিটিসিয়ানরা যদি মাঠে ঘাটে চিৎকার করে' তাঁদের অবিদ্যা জাহির কর্‌তে কুণ্ঠিত না হন, তাহ'লে আমরাই বা আমাদের বিদ্যে জাহির করতে কুণ্ঠিত হব কেন?

থামা উচিত এই কারণে যে, কলিকাতা সহরের হাল পলিটিক্‌সের সূত্রে, সেকালের রোম এবং একালের প্যারিসের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কথা পেড়ে আমি বিদ্যের পরিচয় দিতে পারি কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি নে। তা ছাড়া কোথায় Cicero আর কোথায় আমরা। তাঁর হাতে ছিল ভাষার বিদ্যুন্মণ্ডিত বজ্র, আর আমাদের হাতে আছে টিনের ঝুমঝুমি। তবে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যখন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, তখন সাহিত্য বিভাগ অপরাপর বিভাগ থেকে অনতিবিলম্বে পৃথক হওয়াই কর্ত্তব্য।

অপর জাতের পক্ষে যাই হোক আমাদের মনের উপর পালটিক্‌সের ধাক্কা মাঝে মাঝেই আসা চাই—নইলে আমরা কাব্য পড়্‌তে পারি কিন্তু গড়্‌তে পার্‌ব না। আমাদের সমাজ এতই একঘেয়ে, এতই জড়ভরত যে, সে সমাজ নিত্য নতুন ঘা দিয়ে আমাদের মনকে জাগ্রত রাখে না, আর কাব্য-কলাও ঝিমন্ত মনের সৃষ্টি নয়। পলিটিক্‌সের উত্তেজনা ক্ষণিক হলেও উত্তেজনা ত বটে, অতএব স্বল্পমাত্রায় ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। পলিটিক্‌স সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে যা অকর্ত্তব্য সে হচ্ছে ও-বিষয়ে কিছু লেখা। কেননা এ বিষয়ে কলম চালাতে গেলে style-এর মাথা খেতে হবে। পলিটিক্‌স লিখ্‌তে হবে প্রথমত ইংরাজিতে, তারপর খবরের কাগজের ভাবে ও ভাষায়। কাগ্‌জি ভাবে যে গোঁড়া ভাব এবং কাগ্‌জি-ইংরাজি যে পাতি-ইংরাজি, তার পরিচয় লাভ কর্‌তে বেশীদূর যেতে হবে না, "বেঙ্গলী" কিম্বা "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লেই এ সত্যের সাক্ষাৎ মিল্‌বে। মণ্টেগু সাহেবের রিপোর্ট নিয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে এত যে মতভেদ ঘটেছে তার সর্ব্বপ্রধান কারণ—সে রিপোর্ট খাঁটি ইংরাজিতে লেখা। অপর পক্ষে "রউলট কমিশন"-এর রিপোর্ট সম্বন্ধে যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে দু'মত নেই, তার কারণ—সে রিপোর্ট পাতি-ইংরাজিতে লেখা।

এই সব কারণে, অতঃপর এই Reform Scheme-এর হুজুগ থেকে আলগা হ'তে চাই। কিন্তু যা চাই তাই কি ঘটে? পলিটিক্‌সেরও একটা নেশা আছে, আর সে নেশায় যে একবার মেতেছে তার পক্ষে ও জিনিষ ছাড়া বড় কঠিন। একটি বাঙলা গানের অস্থায়ী আমার মনে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার কারণ—গানটির

কথাগুলি যেমন pathetic, তার সুরও তেমনি উচ্চ অঙ্গের—একেবারে মালকোষ!

সে গানের প্রথম পদ এই—

"ছাড়্‌ব বল্‌লে কি ছাড়া যায়!
এ ত কাক নয়, কোকিল নয়,
যে হুস্‌ কর্‌লে উড়ে যায়!"

এ কবিতায় অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—কেননা ভালবাসা মাত্রই নেশা, আর নেশা মাত্রের-ই একটা মৌতাত আছে।

২০শে আগষ্ট, ১৯১৮ খৃঃ।

বীরবল।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা।



বিশ্বসৃষ্টির পর বিধাতা পুরুষ এক জোড়া মানুষের মাথায় প্রকাণ্ড কেতাবের বোঝা চাপাইয়া ধরাতলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্র জিনিসটা এক ভাবে খুবই সহজবোধ্য। তবে এরূপ সহজবাদীদের দলে ভিড়িতে অতি বড় ভুতভক্তও এখন বোধ হয় একটু পশ্চাদ্‌পদ, কারণ শাস্ত্র-সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আদি ও অকৃত্রিম হইলেও ইহা একেবারে নিরেট খেয়ালের কোটাতেই ঠাসা, জ্ঞান ও যুক্তির মুক্ত বাতাস তাহাতে একটুও লাগিবার জো নাই। কিন্তু এদিকে কালের এমনি প্রভাব, কোন প্রকার গোড়ামিই এখন আর নিজের অটল অন্ধতার উপর খাড়া থাকিয়াই তৃপ্ত নয়, যুক্তি তর্কের খোলা পথে কোন রকমে একটু চলিবার আশায় বেজায় ব্যগ্র, তা সহজ গতিতেই হোক্, আর তির্য্যক্ ভাবেই হোক্।

মানুষ ও কেতাবী শাস্ত্র বিশ্বস্রষ্টার যমজ সন্তান, এইরূপ মত যদি কোথাও কাহারও থাকে, তবে সেটার আমরা কিছুমাত্র সম্বর্দ্ধনা না করিয়া বিদায় দিতে পারি। কি রক্ষণশীল কি উদারনীতিক, সকল তার্কিকই বোধ হয় এই মতটির পক্ষ হইয়া ওকালতি করিতে এখন কুণ্ঠিত। মনুষ্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আধুনিক অভিব্যাক্তিবাদ মানি আর না মানি, তাহাতেই বা এ বিষয়ে কি আসে যায়। মানুষ জীবপর্য্যায়ের

শেষ পরিণতিই হোক্, কিংবা কোন এডাম ও ইভের বংশধরই হোক্, মানুষ যে একেবারে পুঁথি বগলে করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নাই, এটা একটা মস্ত তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝিবার জিনিস নয়। অন্য দেশের শাস্ত্র প্রায় কথঞ্চিৎ একেলে—অনেকের গায়ে সন-তারিখের মার্কা মারা—সাহজাত্য লইয়া তাহারা মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেই পারে না।

আমাদের বেদ লইয়াই বোধ হয় কিছু গণ্ডগোল। পণ্ডিতেরা এই বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণকে একমাত্র বেদেরই সন্তান সন্ততি বলিয়া প্রচার করেন। বেদে ভারতীয় সকল শাস্ত্র বিজ্ঞানের উদ্ভব কিনা ইহা ভাবিবার এখন আমাদের দরকার নাই। বেদের উদ্ভবটাই কি এইটাই এখন জ্ঞাতব্য। বেদ অপৌরুষেয় মানে যদি এই হয় যে ওটা মানুষের রচনা নয়, বিধাতৃদেব স্বয়ং উহা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া আদি মানবের লাইব্রেরীতে রাখিয়াছিলেন, তবে সেটা এই আলোচনার একটা অন্তরায়ের মত হইয়া দাঁড়ায় বটে। কিন্তু এরূপ মতটা আমরা এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে প্রস্তুত নহি, শুধু পাল্টা জবাবে এইটুকুই বলিব, আগে বিধাতৃদেবের ভাষাটাই কি ঠিক হোক তারপর ও-কথা শোনা যাইবে। শুধু বৈদিক সংস্কৃতেই যে বিধাতা সাহিত্য বা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন, এটা আজও কিছুমাত্র প্রমাণ করা হয় নাই। কাজেই ও মতটা এখন মুলতুবিই রহিল।

তবে এটাই কি ঠিক নয় যে, শাস্ত্র মানুষ গড়ে নাই—মানুষই শাস্ত্র গড়িয়াছে। বিধাতা মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অমনি টোল খুলিয়া বসেন নাই এবং নবজাত জীবটিকেও আগে শাস্ত্রের বেত্রাঘাতে

গড়িয়া পিটিয়া তারপর কার্য্যক্ষেত্রে পাঠান নাই। বিধাতা শুধু ভারতবর্ষেরই বিধাতা নহেন, এবং তাঁহার টোল যদি থাকে, সেটা শুধু বৈদিক-সংস্কৃতচর্চ্চারই কেন্দ্র হইতে পারে না। অপৌরুষেয়ের অর্থটা অমন করিয়া খাটাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুধীজন অবশ্যই জ্ঞান ও যুক্তির সহিত মিলাইয়া ইহার অন্য অর্থও করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। কিন্তু এখনও যাঁহারা চাঁদে বুড়ীর চরকা কাটায়, কি সাপের মাথায় ধরিত্রীর অবস্থানে অটল বিশ্বাস রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র। কেহ হয়ত মনে করিবেন এমন সাদা কথা লইয়া এত কালি কলমের খরচ কেন! আমরাও বলি ঐটাই ত ক্ষোভ!

(২)

অনেকে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারেন,—বেদ ত কেতাব নয়, বেদ হইল জ্ঞান। কেতাব পরে হইয়াছে এবং সেটা অবশ্যই মানুষের লেখা। এবং জ্ঞানকে অপৌরুষেয় বলা চলে। বেশ, কিন্তু এই জ্ঞান মানুষের ভিতর গজাইল কেমন করিয়া? শাস্ত্রান্তরে আছে, মানুষ যেমনই জ্ঞান বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলটি ভক্ষণ করিল, অমনি তাহার মনে জ্ঞানের বেদনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ জ্ঞান বোধ হয় বৈদিক জ্ঞান নয়। কারণ এ জ্ঞানে হইল মানুষের পতন, বৈদিক জ্ঞানে হইল মানুষের উন্নয়ন। পতনই হো'ক, আর উন্নয়নই হো'ক এই বিভিন্ন জ্ঞানগুলো কি তড়িদ্বিকাশের মত সহসা মানুষের অন্তরে ঢুকিয়াছিল? এবং সে গুলো কি একেবারে পূর্ণ শাস্ত্রের আকার ধরিয়া মানুষের মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল? যদি তাহাই হয়, তবু সে শাস্ত্র বুঝিয়াছিল কে? অবশ্যই মানুষের মন। তাহা হইলেই শাস্ত্র আসার আগেই

মানুষের মনের সৃষ্টি মানিতেই হইবে। আর মনের সঙ্গে মনের পূর্ণ স্বাধীনতা তখন ত থাকিবেই। অতএব যে ভাবেই হো'ক মানুষের স্বাধীন মনই শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞান প্রথমেই মানুষের মন গড়িতে বসে নাই।

কিন্তু জ্ঞানের আগমন সম্বন্ধে কথাটা এখনও ঘোলাটে রহিয়াছে। সত্যই কি মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্য মনে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান একেবারে হঠাৎ আসিয়া উদিত হইয়াছিল। মানুষের মনটা কি জহ্নু মুনির মত সমগ্র জ্ঞান-মন্দাকিনী এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিল? জহ্নু-মুনির গঙ্গা গলাধঃকরণের গল্পটা অবশ্যই পৌরাণিক, প্রামাণিক নয়। এমন করিয়া মনুষ্য-মনের জ্ঞান লাভের মতটাকেও পুরাণের কোঠাতেই ফেলা চলে, কিন্তু প্রমাণের কাছ ঘেঁসিয়াও আনা যায় না। কারণ এটাও নিতান্ত আজগুবি ও গাজুরি বলিয়াই ঠেকে। মানুষের বর্ত্তমান ও অতীত ইতিহাস ইহার পক্ষে কোনই সাক্ষ্য দেয় না। সমগ্র জ্ঞানের কথা দূরে থাক্, একটি বিশেষ জ্ঞানও মানুষ বহু সাধনার পরই লাভ করে। এ সত্যের কোন একটা বিশেষ উদাহরণ দিবার দরকারই নাই, ইহা মানুষের জীবনে নিয়তই ঘটিতেছে। শুধু ব্যষ্টি জীবনেই নয়, সমষ্ঠি জীবনেও। কত ব্যক্তি-পরম্পরার সাধনার ফলে তবে একটি জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। কত পুরুষ-পরম্পরার চেষ্টায় তবে একটি জাতীয় সংস্কার গড়িয়া ওঠে। তবে কেমন করিয়া বলিব মানব সৃষ্টির আদিতে সমস্ত জ্ঞানগুলো এখনকার কল-টেপা বৈদ্যুতিক আলোর মত—মানুষের মনে একেবারে এক চোটে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! মানুষের আর যাহাই বদলাক, তাহার প্রকৃতিটা ডিগবাজি খাওয়ার মত কখনই উলটাইতে পারে না।

মানব মনে জ্ঞান কখনো এমন করিয়া একেবারে আসে নাই আর সেটা কোন যুগেই নিঃশেষে আসিবার জিনিসও নয়। জ্ঞানের একে-বারে আসাটা অনেকের কাছে অসম্ভব ঠেকিলেও, তাহার নিঃশেষে আসাটা তাঁহারা আবার অসম্ভব রকমই বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ভগবান কোন অজ্ঞাত অতীতেই তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারের যাহা কিছু সব মানুষকে দিয়া ফেলিয়াছেন, এখন তিনি যেন সম্পূর্ণ রিক্ত-হস্ত। অতীতের প্রতি একটা একান্ত ভক্তি ছাড়া এই ধারণার কি অন্য কোন ভিত্তি আছে? অতীতের প্রতি ভক্তি অবশ্যই ভাল জিনিস, কিন্তু সেটাকে এমন গরহিসেবী খেয়ালে বাড়াইয়া তোলা নিশ্চয়ই ভাল জিনিস নয়। ভারতের বেদ গড়িতে কোন কাল্পনিক অতীতে ভগবানের জ্ঞান-ভাণ্ডারটা সব উজাড় হইয়া গেল, এরূপ ধারণায় বেদের গৌরব বাড়ে কি না সন্দেহ, জ্ঞানের গৌরব ত নিশ্চয়ই বাড়ে না। গোটা কত খণ্ড আলোক—তাহার সংখ্যাও যতই কেন হোক না—সূর্য্যের জ্যোতির কাছে যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, এটা কে না স্বীকার করিবে? একটি পরিমিত জ্ঞানকে আত্মস্থ করা অপেক্ষা কি অনন্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়া বেশী গৌরব নয়?

কি প্রাকৃতিক জ্ঞান, কি অধ্যাত্ম জ্ঞান, কোন জ্ঞানই কোন দেশ কাল পাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। দুয়েরই ক্রমবিকাশ আছে, ক্রমোন্নতি আছে। তবে দুয়ের বিকাশ ও উন্নতি অবশ্যই সব সময়ে ও সব যায়গায় সমান বেগে চলিতে থাকে না। কোন একটি বিশেষ যুগে বা বিশেষ স্থলে এই দুয়ের কোন একটির বিশেষ উন্মেষ যে ঘটে, এ কথা অবশ্যই মানি। কিন্তু সেই বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ উন্মেষের সঙ্গে তাহা যে একেবারে শেষ হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই মানিবার মত

নয়। ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম জ্ঞানের দেশ, য়ুরোপ প্রাকৃত জ্ঞানের কেন্দ্র অথবা অতীতে অধ্যাত্ম জ্ঞানের চর্চ্চা বেশী হইয়াছিল, এখন প্রাকৃতিক জ্ঞানের উপরেই মানুষের বেশী ঝোঁক—এ রকম তর্ক কতকটা হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক জ্ঞানটা য়ুরোপ একেবারে বিশ্বের ভাণ্ডার ঝাড়িয়া আনিয়াছে, বলা যদি নিতান্ত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হয়, তবে অতীত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপর সর্ব্বগ্রাসী দাবিটাকেই বা কেমন করিয়া নিতান্ত সম্ভব ও স্বাভাবিক রকমে খাড়া করা যায়?

(৩)

এখন তর্ক উঠিতে পারে, সকল জ্ঞানই কি তবে অনুশীলন-সাপেক্ষ? তাহাই যদি হয়, তবে মহাপুরুষদের বিশেষত্ব কি? তাঁহারা ত আর বহু গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন নাই। দেশের পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানগুলো ঘষা মাজা করাই ত তাঁহাদের জীবনের কাজ ছিল না। তাঁহারা ছিলেন মহাগিরির অভ্রভেদী চূড়ার মত। স্বর্গের নবতর কল্যাণতর আলোকেই তাঁহাদের ললাটদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ত্তের বহু আয়াসপুষ্ট ঝাড়লণ্ঠনের বাতিতে নয়। তাঁহারা ধুলা কাদা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জ্ঞানরত্নের টুকরা-টাকরা সংগ্রহ করেন নাই, আকাশ হইতে অজস্রধারে এই রত্নবৃষ্টি তাঁহাদের চারিধারে পড়িয়াছিল। অনুশীলনের অবিরাম আঘাতে তাঁহারা জ্ঞান-মন্দিরের দরজাটা একটু একটু করিয়া খোলেন নাই, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই সরিয়াছিল—তাঁহাদের যোগমন্ত্রের প্রভাবে। যোগী না হইয়াও

যোগ মানি, এবং যোগের এই মাহাত্ম্যেও অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মহাপুরুষ বা যোগী যে একটা নিতান্ত অসম্ভব রকম আকাশকুসুম জাতীয় জিনিস এটা কখনই মনে হয় না। মহাপুরুষকে যদি ধবল-গিরি বলি, তবে তাঁহার সমসাময়িক মানবসমষ্টিকে হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিব—পুরাণের পাখাওয়ালা মৈনাকের সঙ্গে যাঁহারা তাঁহাকে সমশ্রেণী করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। পাহাড়ের সঙ্গে পাহাড়ের শৃঙ্গের একাত্মতা উড়াইয়া দিলে একটা কাল্পনিক খেয়ালই সৃষ্ট হয়, সেটা আর সত্যকার জিনিস থাকে না। মহাপুরুষ-মহীরুহের মাথাটা আকাশ স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু তাহার শিকড়টা থাকে মাটির ভিতরেই। তাহার পত্রের মুখ স্বর্গের বাতাস হইতে অনেক পুষ্টিকর খাদ্য পায় বটে কিন্তু মাটির রসে তাহার বড় কম বর্দ্ধন করে না। কৃষ্ণ বা খৃষ্ট জুলু বা কাফ্রীর মধ্যে জন্মান নাই। মহাপুরুষ তাঁহার দেশকে উচ্চে তোলেন সত্য কিন্তু তাঁহার নিজের দেশই আবার তাঁহার উচ্চতা পরিমিত করে। আর পৃথিবীতে ধবল-গিরি যেমন একমাত্র পর্ব্বতশৃঙ্গ নয়, তেমনই কোন বিশেষ দেশের মহাপুরুষের মধ্যেই মহাপুরুষত্বের খতম হয় না। মহাপুরুষের আবির্ভাব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল কালেই ঘটিতে পারে। সেই আবির্ভাবের সঙ্গে কত শাস্ত্রমতেরও বিবর্ত্তনের ও বিসর্জ্জনের সম্ভাবনা।

জ্ঞানীই বল, আর যোগীই বল, সকলেই নিজ নিজ সমাজ-ক্ষেত্রেই ফুটিয়া ওঠেন, আকাশকুসুমের পর্য্যায়ে কাহাকেও ফেলা চলে না। ইঁহারা নব নব জ্ঞানের সৌরভে ধরিত্রী বক্ষ আমোদিত করেন বটে, কিন্তু সে সৌরভের সম্পর্ক শুধু নন্দনের পারিজাতের সঙ্গেই নয়

ক্রমিক অনুশীলনে দেশের মধ্যে যে জ্ঞানের আবাদ হইয়াছিল, তাহার গন্ধও সেই মর্ত্ত্যের পুষ্পের সৌরভে বহুল পরিমাণে সৌরভিত। ফল কথা, জ্ঞানের আবির্ভাবের মধ্যে কখনবা একটি আকস্মিক দৈব ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ক্রমবিকাশের পদ্ধতিটা সেই সঙ্গে না মানিবার জো নাই। জ্ঞানের এই দৈব ও মর্ত্ত্য বিকাশ এক বিশেষ দেশ কাল পাত্রের বিশেষ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ধরাবক্ষে মানুষের স্থিতি যতদিন, ততদিনই ইহার প্রক্রিয়া সর্ব্বত্র চলিতে থাকিবে। এই বিকাশ-ক্রিয়ার মূলে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা চিরদিনই বিদ্যমান, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ বিকাশ স্থবিরত্বে সম্ভবে না, ইচ্ছার গতিশীলতা হইতেই যে ইহার উদ্ভব।

(৪)

তবে স্বাধীন মতের নাম শুনিলেই আমরা আঁতকাইয়া উঠি কেন? পুরাতন বন্ধনের অচলতার মধ্যে মানুষ বেশ একটা আরাম পায়। নূতনকে মানুষ স্বভাবত একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে। যাহার সঙ্গে বহুদিন ঘরকন্না করিয়াছি, তাহাকে মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে পারে, একজন নূতন অতিথিকে ততটা বিশ্বাস করিতে চায় না। পুরাতন কতকটা নিশ্চিত, ইহার মধ্যে একটা শান্ত নিশ্চিন্ততা আছেই। আবার নূতনের সঙ্গে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কা জড়ানো। তাই নূতন অনেকেরই দু-চক্ষের বিষ। নূতনকে বিশ্বাস করা দূরে থাক, তাহাকে পরখ করিবার ইচ্ছাটাই অনেকে দাবিয়া রাখে। তাহা হইলেও এমন সময় আসে যখন ঐ পুরাতন নিশ্চিন্ত শান্তিটিই মানুষের মনের উপর একটা বোঝার মত হইয়া দাঁড়ায়। সে তখন

একটু চিন্তা করিবার স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হয়। শেষে সে বুঝিতে পারে, যাহাকে সে বিষ বলিয়া ভাবিয়াছে তাহারই মধ্যে অমৃতরূপে তাহার নব জীবনের বীজই বিদ্যমান।

নূতন মাত্রকেই আমরা অশুভ মনে করিব কেন? আর এই নূতনের জননী যে মানব-মনের স্বাধীনতা, তাহাকেই বা শত্রু বলিয়া ভাবিব কেন? যদি শত্রুর কথাই তোল, তবে দেখিবে নূতন পুরাতন উভয়ের মধ্যে সে ওৎ পাতিয়া থাকিতে পারে। পুরাতনের বন্ধনে কিছু না কিছু জড়ত্বের জাল রচনা করে আবার নূতন স্বাধীনতার মধ্যেও কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিবার সম্ভাবনা। অবিমিশ্র মঙ্গল কোনটাই নয় অথচ দুই-ই আমাদের চাই।

যখন দুই-ই আমাদের দরকার তখন উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজিতেই হয়। কিন্তু এই সামঞ্জস্য করার ভার ত আর পুরাতন শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপানো যায় না। পুরাতন শাস্ত্র নিজে ত এখন কতকগুলো কালির আঁচড় মাত্র, তা সেটা ভূর্জ্জপত্রেই থাকুক, আর ফুলিস্কেপেই পড়ুক। এই কালির আঁচড়ের সঙ্গে যখন আমাদের জ্ঞানের সংযোগ ঘটে, তখনই না তাঁহার গৌরব আমরা বুঝ্‌তে পারি। আর স্বাধীনতা জিনিসটি কি, তাহাত আমরা নিজেদের জীবনে পদে পদে বুঝিতেছি। মানুষ যখন শাস্ত্র ও স্বাধীনতা দুই-ই বোঝে, তখন মানুষের পক্ষে উভয়ের একটা সামঞ্জস্য সাধন করা অসম্ভব নয়। অসম্ভব ত নয়-ই, বরং মানুষ এরূপ একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা নূতনের প্রচারক তাঁহারা ত একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টায় ফিরিবেন-ই, কিন্তু পুরাতনের উপাসকেরা-ই কি এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন?

কথাটা শুনিতে একটু হেঁয়ালীর মতই ঠেকে। নিরেট শাস্ত্রাধীনতার মধ্যে আবার সামঞ্জস্যের স্থান কোথায়! সামঞ্জস্য ত নূতনকে লইয়া, এই নূতনকে আমল দিলেই যাঁহাদের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে, তাঁহাদের সামঞ্জস্যে প্রয়োজন কি? তাঁহাদের ধর্ম্মে ইহার প্রয়োজন না থাকুক, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম অনেক সময় এই প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। শাস্ত্র না বদলাক, সময় যে বদলায়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। আবার অবস্থার অনুযায়ী একটু ব্যবস্থার বদল না করিলেই বা চলে কৈ? হাজার বৎসরের বিধিগুলো এখনকার অবস্থার সঙ্গে কি ষোল আনা খাপ খাওয়ান যায়? তাই অবস্থার গতিকে শাস্ত্রপন্থীরও পক্ষে সজ্ঞানেই হোক্ আর অজ্ঞানেই হোক পুরাতনের সঙ্গে এই নূতনের একটু সমন্বয় করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তবে তাঁহার সমন্বয়টা চলে একটু বেনামি রকমে। পুরাতনের সঙ্গে নূতন বিধির সংযোগ করা তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম হইলেও, পুরাতনকে মাজিয়া ঘষিয়া একটা নূতন জলুস দিতে তিনি পিছ পা হন না। তাঁহার শাস্ত্রের অক্ষরগুলো যেমন, তেমনই থাকে বটে, কিন্তু তাহার অর্থটি, তাঁহার ব্যাখ্যা, ভাষ্য টীকা টিপ্পনির মুখে বেশ একটু ওলট পালট খায়। তবে এই চেষ্টা অনেক সময় সম্যক ফলবতী হয় না। অবস্থার একটু আধটু অদল বদলে এটুকুতে কিছু কাজ দেখিতে পারে কিন্তু অবস্থাটা যখন কালপ্রভাবে বড় বেশী ফারাক হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর ঐ বেনামি সমন্বয়ের ছিটে-ফোটায় কিছুই শানায় না।

(৫)

যাঁহারা স্বাধীনতার প্রচারক, শাস্ত্রপন্থীরা তাঁহাদের উপর বড় সদয় নহেন। ইঁহাদের উক্তিগুলো শাস্ত্রপন্থীরা অনেক সময় নিজেদের সুবিধা মত বেশ একটু একপেশে রকমেই ব্যাখ্যা করেন। ইঁহাদের কথার অ-বিভক্ত ভাবটা না বুঝিয়া তাহার বিভক্ত শব্দগুলোই যেন বেশী নাড়াচাড়া করা হয়। তাই অনেক সময় এই সব আলোচনার মধ্যে ব্যখ্যাতার উপলব্ধি অপেক্ষা যেন আক্রোশই বেশী প্রকাশ পায়। শাস্ত্রপন্থীদের শাস্ত্রের স্থান বুঝি স্বয়ং ভগবানের চেয়েও উচ্চে। শাস্ত্রের উপর কোন রকম একটু মৃদু আলোচনার আঁচও ইঁহারা সহ্য করিতে অপারগ। কাহারও ভাবভঙ্গীতে শাস্ত্রের প্রতি একটু অ-বশ্যতা দেখিলেই তাঁহারা বেজায় খাপ্পা হইয়া পড়েন। এই অ-বশ্যতার কারণটা কি এবং সেটা বাস্তবিক বিবেচ্য কি না, এ সব দেখিবার তাঁহাদের অবসরই থাকে না। তাই তাঁহাদের পাল্টা জবাবে যুক্তি ততটা থাকে না, যতটা থাকে হয় ভাবের ফোয়ারা, নয় গালি-গলাজের নর্দ্দামা। এই ফোয়ারা বা নর্দ্দামার বেগ কোন সমাজকে ক্ষণিক টানিয়া লইয়া যাইতে পারে কিন্তু সে খুব বেশী দূর নয়। কারণ শাস্ত্র-গৌরবের যে একটু অংশ তাঁহারা নষ্ট করিতে বসিয়াছে মনে করেন তাহার পুনরুদ্ধারের যথার্থ পথ ত আর ইহাতে একটুও বাড়ে না বরং ক্রমে মরিয়াই আসে।

শাস্ত্রপন্থীদের অভিধানে স্বাধীনতা মানে—একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা। শাস্ত্রের প্রতি অ-বশ্যতার হ্রাস মানে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র, রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি একেবারে সবগুলো সাপ্‌টাইয়া অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন। স্বাধীনতা জিনিসটা কি বাস্তবিক এমনই বিকট! যখন

আমাদের আত্মাপুরুষ কোন একটা জড়ত্ব বা দাসত্বের বন্ধন ছিঁড়িতে উদ্যত, তখন তাহার সেই উদ্যমটায় অল্পাধিক একটা বিপ্লবের ভাব থাকিতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু সেইটাই ত আর স্বাধীনতার চিরন্তন মূর্ত্তি নয়। যে শাস্ত্রটা বর্ত্তমানে মানবাত্মার প্রসারণে অন্তরায় ঘটায়, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সেটাকে না ছাঁটিয়া থাকিতে পারে না কিন্তু তাহা বলিয়াই আমরা অতীত হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাকে নির্ম্মূলে ধ্বংস করাই স্বাধীনতার কাজ নয়। যদি কখন কোন স্বাধীনতা এমন প্রলয়ের আকারে দেখা দেয়, তবে তাহারও বিলয় অচিরেই ঘটে। এবং আবার সেই মৃত্যুঞ্জয় অবিনাশী অতীত নূতন কল্যাণের রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

স্বাধীনতার কাজ শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করা নয়, শাস্ত্রকে আত্মস্থ করা। শাস্ত্র যখন আমার জ্ঞানের ভিতর থাকে না, থাকে শুধু কেতাবের অক্ষরে, দশের কথায় ও দেশের প্রথায় তখন তাহা আমার মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করিলেও যথার্থ আমার জিনিস হয় না। যখন তাহাকে আমি আমার নিজের সাধনা ও উপলব্ধির মধ্যে লাভ করি, তখনই সে আমার হয়। স্বাধীনতা শাস্ত্রকে বাদ দিতে চায় না, কথা ও প্রথা বহুকাল ধরিয়া তাহার উপর যে একটি পুরু জাল বুনিয়াছে, সেইটাকে সরাইয়া তাহার আসল মূর্ত্তিটি দেখিতে চায়। এই দেখিবার ফলে তাহাতে যদি কোন অমঙ্গল বা অসঙ্গতির লক্ষণ ধরা পড়ে স্বাধীনতা তখনই তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে কোমর বাঁধে, নহিলে শাস্ত্র দেখিলেই তাহার মাথায় মুগুর মারা, স্বাধীনতার এমন ডাকাতী পেশা নয়।

এমন যথেচ্ছ ভাবে মুগুর মারিতে গেলে সে আঘাত কি আমাদের স্বাধীন জ্ঞানের নিজের গায়েও কতকটা পড়ে না? আমাদের স্বাধীন

জ্ঞানের ভিতরে কি পূর্ব্বসঞ্চিত শাস্ত্রজ্ঞান নিহিত নাই? অতীতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে বাদ দিলে মানবের স্বাধীন জ্ঞানের আর থাকে কি? সেটা ত তখন আদি মানবের একটা অপরিস্ফুট আবছায়া রকমের সংস্কারে পরিণত হয়। তাহার পরিধি অতি ক্ষুদ্র, তাহার চিন্তাশক্তি অতি তুচ্ছ। ক্রমশঃ বিকসিত, বিবর্দ্ধিত ও সঞ্চিত জ্ঞানের সাহচর্য্যেই না সেই স্বাধীন জ্ঞান আজ এমন পরিপুষ্ট। যে জাতির মধ্যে সমষ্ঠিগত জ্ঞান বর্দ্ধিত ও সঞ্চিত হয় নাই, তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীন জ্ঞানও অতি অপরিণত। পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান-সমষ্ঠি দ্বারাই আমাদের ব্যষ্টি-জ্ঞানের উৎকর্ষ পরিমিত হয়। তবে স্বাধীন জ্ঞানকে একটা উদ্ভট কিছু বলিয়া আমাদের মনে করিবার কি কারণ আছে? আমাদের স্বাধীন জ্ঞান ত আর পূর্ব্ব-লব্ধ শাস্ত্র জ্ঞানের একান্ত সম্পর্ক বিরহিত একটা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস নয়।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বাধীন জ্ঞানের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা দিলেও, বাস্তবিক তাহারা উভয়ে উভয়ের শত্রু নয়। তাহারা পরস্পরের পরিপোষণই করিয়া থাকে। এই পরিপোষণের পথ খোলসা থাকিলে, বিরোধের ভাব কখনই থাকিতে পারে না। আমাদের এই কথা হইতে বোধহয় কেহই এমন বুঝিবেন না যে আমরা স্বাধীন মত মাত্রকেই বরণ করিয়া লইতে বলিতেছি, মানবের কল্যাণের জন্য যেমন শাস্ত্রজ্ঞানের দরকার, তেমনই তাহার কল্যাণের জন্যই স্বাধীন জ্ঞানের দাবিটাও অগ্রাহ্য নয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

পয়ার।

—:*:—

কবিবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্ব-করকমলেষু—

সবিনয় নিবেদন,

সেদিন "বিচিত্রায়" যখন ছন্দের আলোচনা হয়, তখন সে আলোচনায় যে আমি যোগদান করি নি, তার প্রথম কারণ—সভার একটেরে বসেছিলুম বলে', আপনার বক্তব্য সকল কথা আমার কর্ণগোচর হয় নি, এবং তার দ্বিতীয় কারণ ওবিচারে আমি অনধিকারী। এ কথা আমি বিনয় করে বল্‌ছি নে। এ বিষয়ে আমার শক্তির অভাবের পরিচয় আমি আর্টের অপর একটি ক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব্বে লাভ করি। আমার তালজ্ঞান যদি সহজ হ'ত, তাহ'লে আমি একজন চলনসই গাইয়ে হ'তে পারতুম; কেননা আমি তাল-কাণা হ'লেও সুর-কালা নই,—এবং সুর ভগবান শুধু আমার কানে নয় কণ্ঠেও দিয়েছিলেন। আমার এমন একদিন গিয়েছে যখন, আমি আর সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে গান অভ্যাস কর্‌বার চেষ্টা করেছি এবং সে চেষ্টার ফলে সুরকে কায়দা করে আন্‌তে অল্প-বিস্তর কৃতকার্য্যও হয়েছিলুম। কিন্তু একদিন আমার একটি পাখোয়াজি বন্ধু আমাকে 'বেতাল সিদ্ধ গায়ক' বলাতে চিরদিনের মত সঙ্গীতের চর্চ্চা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হই। অতএব এ কথা স্বীকার

করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ছন্দ সম্বন্ধে আমার অশিক্ষিত কিম্বা শিক্ষিত কোনরূপ পটুত্ব নেই। কবিতা আমি ছন্দের দিকে নজর রেখে পড়ি নে। তবে এমন সব কবি আছেন, যাঁদের কবিতার ছন্দ অতিশয় অন্যমনস্ক লোকেরও চোখ এড়িয়ে যায় না—যথা ভারতচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। এঁদের লেখা পড়েই কবিতায় ছন্দের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমার চোখ ফুটেছে।

এ অবস্থায় আপনার অনুরোধে আমি কেন যে অনধিকার চর্চ্চা করতে উদ্যত হয়েছি তারও কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। সেদিনকার সভায় আমার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও ভদ্রলোক আমার মৌনতা, আপনাদের মতের সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেন্ নি। তিনি বলেন যে, আমি পয়ার ত্রিপদীর ভক্ত বলে ওক্ষেত্রে নীরব ছিলুম। এ কথা বলার অর্থ এই যে, যার বিষয়ে দুটো ভাল কথা বল্‌বার নেই তার বিষয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আমি পয়ার ত্রিপদীর ভক্ত কি না সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, তবে বাংলার ঐ দুই মামুলি ছন্দের স্বপক্ষে যে কিছু বলবার নেই, এ কথা আমি বিনা ওজরে স্বীকার করে নিতে পারি নে। সুতরাং আমি এই সুযোগে পয়ার ত্রিপদীর পক্ষ থেকে একটু ওকালতী করতে চাই। বলা বাহুল্য ছন্দ সম্বন্ধে আমি যা বল্‌ব সে উপরচাল হিসেবে গণ্য করতে হবে—অর্থাৎ তা গ্রাহ্য করা আর না করা সম্পূর্ণ খেলোয়াড়দের হাত।

আমি পয়ার ত্রিপদীর বিরোধী নই, কেননা আমি কোনও ছন্দেরই বিরোধী নই। সকল ছন্দেরই এক একটা বিশেষ মুল্য, বিশেষ মর্য্যাদা ও বিশেষ সার্থকতা আছে। আমি কোনও art-form-কেই অবজ্ঞা করিনে; এবং প্রত্যেকটিকেই আর্টের রাজ্যের চিরস্থায়ী

সম্পদ বলে মনে করি। শুনতে পাই এই জড়জগতের শক্তি ও পরমাণুর পুঁজি বাড়েও না কমেও না, প্রকৃতির ও মূলধন অনাদি ও অনন্ত। চোখের সুমুখে আমরা যে হ্রাস বৃদ্ধি দেখতে পাই তার কারণ বিশ্বের একদিকে যেমন শিকস্তি হয় আর একদিকে তেমনি পয়স্তি হয়। এর এক অংশে যখন কিছু যোগ হয়, তখন বুঝতে হবে আর এক অংশে ঠিক ততখানি বিয়োগ হয়েছে। সমগ্রটার পরিমাণ ও ওজন চিরকালই সমান থেকে যায়। কিন্তু মনোজগতের হিসেবটা এর ঠিক উল্টো। জড়জগৎটা আমাদের পড়ে পাওয়া আর মনোজগৎটা আমাদের হাতে গড়া। সে জগৎটা শুধু বেড়েই চলেছে আর সে যোগের গুণে। মানুষের জ্ঞানের সম্বল, চিন্তার ধারা, অনুভূতির প্রসার যে যুগের পর যুগে বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই। তার কারণ এক যুগের মনের ধনের সঙ্গে আর এক যুগের মনের ধনের যোগ হচ্ছে। এস্থলে অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বচিন্তা কি সব বজায় থাকে, না ও সব বস্তু ক্রমান্বয়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং নূতন জ্ঞান নূতন চিন্তা পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করছে? এর উত্তরে আমি বলি—পুরাতনই নূতনের জন্মদাতা; সুতরাং তার যা যথার্থ সম্পাদ নূতন তা উত্তরাধিকারী সত্ত্বে লাভ করে। নূতন কতক পরিমাণ পুরাতনেরই জের টেনে চলে—এ সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মমত নীতিমত প্রভৃতি কখনও স্ব-রূপে চিরস্থায়ী হতে পারে না, এ সবারই অস্তিত্ব কালের অধীন। একমাত্র আর্টই কালের অধীন নয়। যাকে আমরা আর্ট বলি তা আপাদ-মস্তক একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি বলে তা আর হ্রাস-বৃদ্ধির অধীন নয়। Venus de

Milo, তাজমহল, শকুন্তলা ও হ্যামলেট প্রভৃতি প্রতিটি একটি সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মানসী সৃষ্টি, ওর উপর আর মানুষের খোদকারি চলে না। মানুষে নূতন সৃষ্টি যে করতে পারে শুধু তাই নয়—সে যদি প্রাণে নয় মনেও বেঁচে থাকতে চায়, তাহ'লে মনের দেশে সে নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু যা আর্ট তা মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। A thing of beauty is a joy for ever—এ কথা যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য।

মানুষে যে শুধু আর্ট সৃষ্টি করে তাই নয়—সেই সঙ্গে কতকগুলি art-form-ও সৃষ্টি করে। এবং আর্টের মত এই আর্ট-ফরমগুলোও—মানুষের চির-সম্পদ। এই সব চিরাগত art-form-কে সানন্দে বরণ করে নেওয়ায় মানুষে আত্মার দৈন্য নয়—শক্তিরই পরিচয় দেয়। মানুষে যাকে ভাষা বলে সেও একটি art-form ছাড়া আর কিছুই নয়, আত্ম-প্রকাশের একটি বিশিষ্ট উপায়। এই ভাষার ছাঁচে নিজের মন ঢালাই করতে কোনও কবি অদ্যাবধি আপত্তিও করেন নি, ব্যথাও বোধ করেন নি। এ ছাঁচ একটি প্রকাণ্ড ছাঁচ বলে লোকে এটিকে ছাঁচ বলে চিনতেই পারে না, অথচ ভাষা ভাবের ছাঁচ বই আর কিছুই নয়। তর্ক অবশ্য ওঠে ছোটখাটো ছাঁচ নিয়ে—যেমন গ্রীসের নাটকের ছাঁচ, আমাদের দেশের রাগরাগিণীর ছাঁচ, আর সকল দেশের কবিতার ছন্দের ছাঁচ। এই সব সঙ্কীর্ণ ছাঁচ যে গুণী লোকের প্রতিভাকে চেপে মারে নি—তার প্রমাণ Æschylus, Sophocles Euripides প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বাগ্রগণ্য নাটককারেরাও ঐ একই ছাঁচে তাঁদের সকল মন, সকল প্রাণ, সকল জ্ঞান, সকল ধ্যান ঢেলে দিয়ে এক একটি অপূর্ব্ব সুন্দর-মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, অথচ এঁদের একের প্রতিভা অপরের

প্রতিভার স্বজাতি নয়। Æschylus-এর সঙ্গে Euripides-এর তফাৎটা কতদূর তার পরিচয় Aristophanes-এর Frogs-এ পাবেন। এঁদের জ্যেষ্ঠটি দক্ষিণ মার্গের, কনিষ্ঠটি বাম মার্গের এবং মধ্যমটি মধ্যপথের চরম কবি। ভরসা করে চরম কবি বল্‌ছি এই জন্যে, যে অনুবাদে যাঁদের রচনা এত চমৎকার, তাঁদের মূল রচনার সৌন্দর্য্যের নিশ্চয়ই আর তুলনা নেই।

এই লম্বা ভূমিকাই প্রমাণ যে, এক্ষেত্রে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত হতে পিছ-পা হচ্ছি, কারণ ছন্দের উপর হস্তক্ষেপ কর্‌তে আমি স্বতঃই নারাজ। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দের বাঁধাবাঁধি নিয়মকে আমি কবিতা রচনার শত্রু নয়—মিত্র হিসেবেই গণ্য করি। আমি ইতিপূর্ব্বে আমার মত দু'ছত্রে প্রকাশ করেছি। আমি লিখেছি—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহা মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

একথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার মনের কথা, আমার সনেটের অন্তরে যে মুক্তি নয়—স্ফূর্তি লাভ করেছে, তার কারণ আমি ছন্দ-শিল্পী নই। আপনার হাতে ঐ একই জিনিস চতুর্দ্দশ-দল ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ত। পয়ার ত্রিপদী যে ছন্দশিল্পীদের তেমন প্রিয় নয়—তার কারণ এদের বন্ধন কড়া নয়—ঢিলে। এক হিসেবে এ দুই verse-form-এর ঐ সহজ ঢিলেঢালা ভাবটা দোষেরও বটে গুণেরও বটে। আনাড়ির হাতে এ দুই-ই যেমন অচল, গুণীর হাতে আবার তা তেমনি সচল। কেন তা পরে বল্‌ছি।

(২)

পয়ার বাংলা কাব্যের শুধু বাঁধা সড়ক নয়—একেবারে বড় রাস্তা, সাধুভাষায় যাকে বলে রাজ-পথ। কাব্যের এ রকম রাজ-পথ সকল ভাষাতেই আছে। গ্রীকের Hexametre, সংস্কৃতের অনুষ্টুপ, ফরাসীর Alexandrine, ইংরাজির Iambic-pentametre-এ—সবই হচ্ছে পয়ারের স্বজাতি। এক আধ মাত্রার কমবেশিতে কিছু যায় আসে না—এ সব ছন্দের ভিতর একটা মস্ত বড় মিল আছে। এ সব ছন্দই চরণে চরণ মিলিয়ে চলে এবং এদের প্রত্যেকের প্রতি চরণটি কিঞ্চিৎ লম্বা। এর একটি কারণ এ সব ছন্দের জন্ম গদ্যের জন্মের বহুপূর্ব্বে হয়েছিল। সভ্যতার আদিযুগে এই শ্রেণীর পদ্যই ছিল মানুষের সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়। এরি সাহায্যে মানুষকে গল্প বল্‌তে হ'ত, জ্ঞান বিতরণ কর্‌তে হ'ত, রাগ বিরাগ প্রকাশ কর্‌তে হ'ত। কিন্তু এ সব ছন্দ হচ্ছে প্রধানত আখ্যায়িকারই বাহন। একটানা একটা লম্বা গল্প বলে যাবার জন্য এই হচ্ছে কাব্যের সনাতন্ পথ। এ সব ছন্দে মানুষের মন চল্‌তে পারে, এমন কি ছুট্‌তেও পারে কিন্তু নাচ্‌তে পারে না, অন্তত সহজে ত নয়-ই। অবের এ বাহনের যে শুধু পিঠ চৌড়া তা নয়—এর গতিও ধীর, ললিত। এ ছন্দের ভিতর space এবং repose দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই কারণে অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল দেশেই কবিরা ভাবের দীর্ঘযাত্রা কর্‌তে হলে ঐ প্রশস্ত পথই অবলম্বন করেন। এ সব ছন্দের তাল হচ্ছে চৌতাল ধামারের ঘরের। পয়ারের তাল ঢিমে বলে আনাড়ির হাতে তা প্রায় গদ্য হয়ে যায়—অপরপক্ষে গুণীর হাতে তার ধ্বনি মৃদঙ্গের পরং-এর মত জমাট ও

ভরাট হয়ে ওঠে। উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত। এ পয়ার কালিদাসের মন্দাকান্তার অনুরণনে ভরপুর। এ ছন্দ ইচ্ছামত দ্রুত ও বিলম্বিত করা যায়—অবশ্য এর অবিরল ঘন ভাবটি বজায় রেখে, নচেৎ এর স্ব-রূপটি বজায় থাকে না। এই কারণে যদিচ ভাবপ্রকাশের একটি নতুন ও সোজা পথ—গদ্য বেরিয়েছে তবুও কাব্যের এই আদি ছন্দ আজও সশরীরে বর্ত্তমান হয়েছে। গদ্যেরও অবশ্য rhythm আছে কিন্তু metre নেই। এই metre-এর অভাবেই গদ্য এশ্রেণীর পদ্যের মত সাকার হয়ে উঠ্‌তে পারে না এবং art হিসেবে সেইজন্য গদ্যের স্থান আজও পদ্যের নীচে। আমি পূর্ব্বে বলেছি পয়ার প্রভৃতি চৌতাল ধামারের ঘরের তাল। ও তালে ভাষাকে নাচান যায় না—কিন্তু ঐ তালকে আড়্ করে নিলে, ভেঙ্গে নিলে—যৎ খেমটা সবই পাওয়া যায়। সুতরাং পয়ার প্রভৃতি ছন্দ যেমন metre-এর বন্ধন মুক্ত হয়ে একদিকে গদ্যে পরিণত হয়েছে অপর দিকে তেমনি metre-এর ভাঙ্গচুরে নানা ছন্দে পরিণত হয়েছে। সকল ছন্দের কুলের খবর আমি জানিনে কিন্তু পয়ার ত্রিপদী ভেঙ্গে ও আড় করে যে নানা ছন্দ গড়া যায় তার পরিচয় ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব দাঁড়াল এই যে, পয়ার ত্রিপদী যে নিজগুণে বেঁচে আছে—তাই নয়, ঐ মূল ছন্দ থেকে নানা ছন্দের উদ্ভবও হয়েছে। আমার একথা যদি সত্য হয়, তাহলে পয়ার ত্রিপদীকে কাব্যরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করে দেবার দিন আজও আসে নি। ভবিষ্যতে কি হয় তা বলা যায় না।

(৩)

কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার এ ওকালতিটে একদম বাজে খাটুনি হয়েছে।—আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, পয়ার ত্রিপদীকে মানে মানে বিদায় দেবার কথা কেউ মুখে আনা দূরে থাক্ মনেও আনেন্ নি। শুনছি, তর্ক উঠেছে এই নিয়ে যে, চল্‌তি বাংলা কথাকে পয়ারের ভিতর খাপ খাওয়ানো যায় কি না। এর জবাব দিতে হলে পয়ারের শুধু চরিত্র নয় জীবনচরিত ও ঈষৎ আলোচনা করা দরকার।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ জাতের ছন্দ সকল ভাষাতেই আছে এবং সকল ভাষারই সেটি শুধু পুরাতন নয় সনাতন ছন্দ। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে এ ছন্দ গড়্‌লে কে? এর উত্তরে অনেকে বল্‌বেন—"জাতীয় প্রতিভা।" আমার মতে ও উত্তর—"জানি না" বলারই সামিল। কেন না জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা যাই বলুন—"জাতীয় প্রতিভা" বলে' কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। প্রতিভা শুধু দুচার জনের থাকে, এবং জনগণের মধ্যে সকলযুগে সকলদেশে যা পুরো মাত্রায় থাকে তা হচ্ছে প্রতিভা-বিদ্বেষ। জাতীয় নির্বুদ্ধিতাই জাতিকে বিশিষ্টতা দেয়, কেননা প্রতি জাতের একটা বিশেষ রকম নির্বুদ্ধিতা আছে। জার্ম্মাণরা যাকে বলে "জাতীয় অহং"—তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জাতীয় অহঙ্কারে। এবং যার জন্য যে জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত, তাই নিয়ে সে জাতি গৌরব করে। এর প্রমাণ এক জাতির হামবড়ামি অন্য জাতির কাছে চির দিনই—যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি বিরক্তিকর। বাল্মীকির মুখে "শ্লোক" যেমন একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল তেমনি অপর সকল জাতির ভিতরও কোনও না কোনও কবির মুখেই এসব ছন্দ অকস্মাৎ জন্ম লাভ করেছে। এশ্রেণীর ছন্দকে এই হিসাবে জাতীয় ছন্দ বলা যায়

যে এপথ একের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও বহু কবির পায়ে পায়ে তা কাব্যের বড় রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—এ সব ছন্দ কেন অপরের কাছে এ ভাবে গ্রাহ্য হয়েছে। এর একমাত্র উত্তর, এ সব ছন্দের জাতীয় ভাষার সঙ্গে ওজনেও পরিমাণে একটা স্বাভাবিক মিল আছে অর্থাৎ ভাষার শব্দরাশি এই সব ছন্দের ভিতর আরামে এবং খাপে খাপে বসে যেতে পারে। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে বাংলা কথার যে বাংলার পয়ারের ভিতর স্থান হবে না, এ হতেই পারে না। তবে এ রকম সন্দেহ যে লোকের মনে জাগে তার কারণ, আমাদের এ কালের মুখের কথার সঙ্গে সেকালের পদ্যের কথার সম্পূর্ণ মিল নেই। পয়ারের নাম উচ্চারণ কর্‌বামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ান কৃত্তিবাস ও কাশিদাস। আমাদের চল্‌তি ভাষায় হয়ত কাশিদাসী পয়ার লেখা না যেতে পারে কিন্তু তাই বলে পয়ার কেন লেখা যাবে না তা বুঝ্‌তে পারি নে। মুখের কথাকে আমি পয়ারস্থ কর্‌তে পারি নে, কিন্তু আপনি ও রবীন্দ্রনাথ যে ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই।

পয়ার বল্‌তে আমরা সাধারণ লোকে কি বুঝি? সেই ছন্দ—যার প্রতি পদে চৌদ্দটি করে অক্ষর থাকে। পয়ারের পয়ারত্ব যদি অক্ষরের সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে তাহলে বলা বাহুল্য নানা রকম মাত্রায় ও ছন্দকে চালানো যেতে পারে। শুধু চার মাত্রা নয়, তিন মাত্রা, পাঁচ মাত্রার তালেও পয়ারকে খেলানো যায়। অর্থাৎ আমরা কাওয়ালি ছাড়া—একতালা, ঝাঁপতাল এমন কি যৎও লাগিয়ে দিতে পারি। তা যে পারি তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধে পাবেন। পয়ারের আকার যে অক্ষরগত তার কারণ, বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ হয়

দু'অক্ষরের নয় তিন অক্ষরের, বড় জোর চার অক্ষরের, তার বেশি নয়। সুতরাং চৌদ্দ অক্ষরের পদের অভ্যন্তরে আমাদের অধিকাংশ শব্দই অক্লেশে পাশাপাশি বসে যায়।

পয়ারের রূপ যে অক্ষরের উপর নির্ভর করে এ কথা যে সকলে মানেন না, তার কারণ বাংলা শব্দের অক্ষরের আকারের সঙ্গে মাত্রার ওজন মেলে না। বাংলা শব্দের হয় মধ্যে, নয় শেষে হসন্ত থাকায় দুই অক্ষরের শব্দের মাত্রা দেড় এবং তিন অক্ষরের আড়াই। এবং তাল জিনিসটে যখন মাত্রাগত তখন অক্ষর গুণে পয়ার লিখ্‌লে ছন্দ যে বেতালা হয়ে যাবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ গরমিল কবির কোনও ক্ষতি করে না। কেননা কবি অক্ষর গুণেও কবিতা লেখেন না, মাত্রা গুণেও নয়। তাঁর রচনা আপনা হতেই ছন্দে পড়ে যায়,— কেননা তিনি যখন কবিতা লেখেন তখন তাঁর কানে—ছন্দের পুরো সুরটা বাজ্‌তে থাকে,—তিনি মাত্রার সঙ্গে মাত্রা জুড়ে পদ্য রচনা করেন না। অর্থাৎ কবির মনপ্রাণ থেকে যা বেরয় তা গোটা ভাবেই বেরয়, আমরা সেই গোটা জিনিসটিকে পরে ভাগ করে তার গড়নের সন্ধান পাই। আর যিনি কবি নন্‌ অর্থাৎ যাঁর অন্তরে ছন্দ নেই তিনি অক্ষর গুণেই লিখুন আর মাত্রা গুণেই লিখুন—তাঁর হাত থেকে যা বেরবে তার হয়ত তাল পাওয়া যাবে না, আর যদি তাল পাওয়া যায় ত সুর পাওয়া যাবে না। "অন্য লোকে লাঠি বাজে" বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে" না, এমন কথা কেউ বল্‌তে পারেন্‌ না। মাত্রার হের-ফের করে কবি ছন্দের সম্পূর্ণতা রক্ষা করেন। মাত্রার কম বেশীর হিসেব তখনই চোখে পড়ে যখন আমরা প্রতি শব্দটিকে আলাদা করে দেখি—কিন্তু একটি পুরো

পদকে একটি ধ্বনি হিসেবে দেখ্‌লে ও জিনিস আমাদের নজরেই পড়ে না।

তারপর আর একটি প্রশ্ন ওঠে। যদি পয়ারকে মাত্রাগত ছন্দ হিসেবে গ্রাহ্য কর্‌তে হয় এবং কাশিদাসী পয়ারকেই আদর্শ পয়ার হিসেবে গণ্য কর্‌তে হয়—তাহলে সে পয়ারের ভিতর মুখের কথাকে বেমালুম খাপ খাওয়ান যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে পয়ারের তাল কাওয়ালি অর্থাৎ চারটি পদে এ ছন্দ সম্পূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, এ ছন্দের ভাগ চারটি হলেও ঝোঁক দুটি মাত্র। সুতরাং একে আট মাত্রার দ্বিপদী ছন্দ বলা যেতে পারে। হসন্তের গুণে প্রতি বাংলা শব্দের একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে—সুতরাং এ সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়, যে এত ঝোঁকওয়ালা শব্দকে কি করে ঐ দুই ঝোঁকের ছন্দে বসিয়ে দেওয়া যায়। তারা ত প্রত্যেকেই নিজের ঝোঁকে ঠেলে ঠেলে উঠবে এবং এদের কারও ঝোঁক মধ্যে কারও ঝোঁক শেষে।

বাংলা কথার ঝোঁক বেশি আর টান কম; আর সাধুশব্দের টান বেশি ঝোঁক কম। সুতরাং কারও কারও মতে পয়ারের মত সটান ছন্দে সাধুশব্দেরই ন্যায্য অধিকার আছে—বাংলা কথার নেই। এর উত্তরে আমার বক্তব্য যে, যার পদে পদে ঝোঁক নেই, তাকে ছন্দ নামে অভিহিত করা যায় না। কাশিদাসী পয়ার গাওয়া যায় কিন্তু পড়া যায় না। যে পয়ার পড়বার জন্য রচিত হবে তাতে সাধুশব্দ চলবে না, কেননা সে শব্দের ঝোঁক নেই। ঝোঁক আর টান দুইয়ে মিলে এক না হলে ছন্দ হয় না। স্রোতের জল একটানা অথচ হিল্লোলিত অর্থাৎ সে জল সটান চলে কিন্তু ঝোঁকে ঝোঁকে। যে জলের ঝোঁক নেই—তার

গতিও নেই তার একটানা চেহারাটা শুধু অচলতার লক্ষণ। সুতরাং ঝোঁকপ্রধান বলে বাংলা শব্দ কেন উদার ছন্দের মধ্যে স্থান পাবে না বুঝতে পারছি নে। ইংরাজি শব্দও ত সব ঝোঁকপ্রধান, তৎসত্ত্বেও Iambic pentametre-এর মধ্যে তারা সজোরে বসে রয়েছে। বাংলা শব্দ যদি আট মাত্রার তাল অর্থাৎ মধ্যমানে পড়্তে রাজি না হয় তাতে কিছু আসে যায় না—কাওয়ালি ঠুংরিতে ঠিক বসে যাবে। সুতরাং মুখের কথায় সেকেলে পয়ার লেখা না গেলেও, তার চাইতে ঢের বেশি স্রোতস্বতী ছন্দে লেখা যাবে।

আমার এ সব কথা আমি কাউকে গ্রাহ্য কর্তে বলিনে, কেননা আমি জানি যে, আমি ভাদ্র মাসে জন্মায় নি। তবে কোনো বিষয়ে যখন একটা তর্ক ওঠে তখন সে বিষয়টাকে শুধু ভিতর থেকে নয় বাইরে থেকে দেখারও একটা সার্থকতা আছে, এই বিশ্বাসে আমি ছন্দসম্বন্ধে out-sider হিসাবেই আপনার অনুরোধ মত এ আলোচনায় যোগদান কর্তে সাহসী হয়েছি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

একটি সত্যি গল্প।

—:*:—

উচ্ছল উদ্দাম পার্ব্বত্য ঝরণা হু হু শব্দে পাহাড়ের গা দিয়ে ছুটে চলেছে—যেন সে জানিয়ে দিতে চায় যে, এ জগতে গতির চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। সেই ঝরণার ধারে একটুখানি সমতল্ জায়গার উপরে ছোট্ট একটি কুটীর—আর সেই কুটীরে বাস করত এক তরুণ পাহাড়ি। তরুণ পাহাড়ির দিনমান কোনই কাজ ছিল না—সে তার কুটীরের চার পাশ বন্য গোলাপের গাছে গাছে ভরে' তুলেছিল—বন্য গোলাপ আরও কত রকমের ফুল লতা পাতা দিয়ে তার কুটীর খানিকে কুঞ্জবনের মত করে' তুলেছিল। দিনমান সে সেই ফুল লতা পাতার চর্চ্চা করেই কাটিয়ে দিত—কেবল সকাল বেলায় যখন প্রভাতী সূর্য্যের আলোর স্পর্শে পাহাড়ের গায়ের বরফ চিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একবার সেই ঝরণাটির ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। সেখানে গিয়ে ঝরণার অপর দিকে বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থাক্‌ত, যেন কার আসবার কথা আছে—যেন সে কার অপেক্ষায় সেখানে কুটীর বেঁধে রয়েছে। কিন্তু সারাবেলা দেখে দেখে যখন মাথার উপরে উঁচু পাহাড়ের বরফের সোনালি রঙ্ চলে' গিয়ে তা রূপোলি রঙে ঝিক্ ঝিক্ করে' উঠ্‌ত তখন সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে কুটীরে ফিরে আস্‌ত—আবার ফুলগাছগুলোর তত্ত্বাবধান, পরিচর্য্যা করত।

এমনি করে কিছু দিন কেটে গেল। এক দিন তা'কে আর অমনি ফিরে আস্‌তে হ'ল না। সে ঝরণার ধারে গিয়ে দেখ্‌লে যে অপর পারে একটা পাথরের উপরে চুপ করে' বসে রয়েছে এক সুন্দরী তরুণী, যেন পাষাণ ফেটে পদ্মফুল ফুটেছে।

মুহূর্ত্তে পাহাড়িকে কে যেন বলে' দিয়ে গেল যে এ সেই—যার অপেক্ষায় সে প্রতিদিন ঘুরে বেড়াত। মুহূর্ত্তে পাহাড়ির অন্তরটা সার্থকতায় ভরে' উঠ্‌ল—তার চোখে পলক পড়্‌ল না—অনিমেষ নয়নে সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেই সুন্দরী অপরিচিতা তরুণীকে।

অচেনা? অচেনা ত বটেই; কিন্তু তার মত চেনা ত আর কেউ নেই—আর কিছু নেই। বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে পলে পলে তারই অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গড়ে' উঠেছে—তারই আনন্দের ভিতর দিয়েই যে তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয়। এ পরিচয় ত এক দিনের নয়—এক কালের নয়—এ পরিচয় যে বহু দিনের, বহু কালের—কত জন্মের। অচেনাই বটে—কিন্তু অতি অন্তরতম।

পাহাড়ি জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ওগো তরুণি, তোমার নামটি কি? তুমি আস্‌ছ কোথা থেকে?"

তরুণী উত্তর দিলে—"নাম আমার তরুণী—আস্‌ছি আমি বহুদিন হ'তে—বহুদূর থেকে।"

"বহুদিন হ'তে?—তবে ত তুমিই সেই—যার অপেক্ষায় আমি এতদিন কাটিয়েছি। বহুদূর থেকে!—তাই বুঝি আমি দিগন্তের কোলে কোলে তোমারই পায়ের নূপুরের গুঞ্জন শুনতে পেতুম—ঐ দূর বনান্তরাল থেকে যে বাতাস বয়ে' আস্‌ত তাতে তোমারই কুন্তলের সুরভী-ঘ্রাণ পেতুম—ঐ ঊর্দ্ধে বহুদূরে সুনীল গগনে তোমারই নীল

নয়নের অসীম দৃষ্টির গভীরতা আমার চোখে ধরা পড়্ত। তবে ত তুমিই সেই—তবে ত তুমি আমার-ই। ওগো তরুণি, আমাদের মিলন হবে কেমন করে? ওপার ছেড়ে এ পারে আস্‌বে না কি—?"

"তোমার নামটী কি?"

"নাম আমার কল্পশেখর।"

"কল্পশেখর, তোমার সাধ্য কি আমায় ধরে' রাখ্‌বে তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে—তোমার ঐ ছোট্ট কুটীরে ত আমার জায়গা হবে না। আর এই খরস্রোতা নির্ঝরিণীকেই বা আমি পেরিয়ে যাব কেমন করে—এ স্রোত যে মত্ত-মাতঙ্গকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার চাইতে কল্পশেখর, তুমিই এধারে এস। ওধারে ঐ কুটীর তোমার গণ্ডী। কিন্তু এধারে ত কোন গণ্ডী নেই—এধারে দিগন্তের আলো, দিগন্তের বাতাস। সার দিয়ে ঐ যে পাহাড়ের পর পাহাড় অনন্ত যুগ ধরে' মৌন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেই অনন্ত যুগের স্বপ্ন এধারে। ঐ অনন্ত যুগের স্বপ্ন নিয়ে অনন্ত যুগের সাক্ষী হ'য়ে যে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে তার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে কত পথ কত অপথ—কত উপত্যকা অধিত্যকা—কত অসমাপ্তি। এই পথ অ-পথ ধরে' উপত্যকা অধিত্যকার ভিতর দিয়ে এই অসমাপ্তির দিকেই আমরা যাত্রা কর্‌ব, কল্পশেখর—তুমিই ওধার ত্যাগ করে এধারে এস না।"

"তবে তাই আস্‌ব তরুণী।"

কল্পশেখর জলে নাম্‌ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অনুভব কর্‌লে যে তাকে নির্ঝরিণীর খরস্রোত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। কল্পশেখর তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে নির্ঝরিণীর তটে দাঁড়ালে। সাধ্য কি মানুষের এই খরস্রোতা অগভীর নির্ঝরিণী পায়ে হেঁটে পার হয়।

কল্পশেখর বল্‌লে—"শোনো তরুণী, মানুষের সাধ্য নেই এই খর-স্রোতা নির্ঝরিণী হেঁটে পার হয়। শোনো, চল আমরা দুজনে এই ঝরণা ধরে' উজানের দিকে চলে যাই। যেখানে এর পরিসর স্বল্প হবে সেখানে এটাকে আমি ডিঙ্গিয়ে যাব।" তরুণী বল্‌লে—"আচ্ছা চল।"

দু'জনে দু'পার দিয়ে ঝরণার উজানে যাত্রা কর্‌ল।

দু'জনে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে সোনালি সূর্য্য পূব গগনে উঠে মাঝ গগনে গিয়ে পড়ল—আবার সেখান থেকে ক্লান্ত দেহে রাঙ্গা মুখে পশ্চিমে ঢলে' পড়ল, কিন্তু ঝরণা তেমনি হুহু শব্দে ছুটে চলেছে, কোনখানেই তার পরিসর এমন সঙ্কীর্ণ হয় নি যে, কল্পশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যা যখন তার কাজল আঁখি নিয়ে, তার কালো আঁচল আকাশে উড়িয়ে প্রকৃতিকে নিস্তব্ধ হ'তে ইঙ্গিত কর্‌ল তখন তরুণী ব্যথিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"কল্পশেখর।"

"কি ?"

"আর ত আমি হাঁট্‌তে পারি না, কল্পশেখর।"

কল্পশেখর বল্‌লে—"তবে আজকার মত আমাদের যাত্রা শেষ। শোনো তরুণি, এইখানে আমরা দু'জনে রাত কাটাব। তারপর প্রভাত হ'লে আবার চল্‌ব।"

তারা সেইখানে নির্ঝরিণীর দু'ধারে দু'জনে শ্রান্ত দেহে বসে' পড়ল, দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। চারিদিকের স্তব্ধতার বুক চিরে হু হু শব্দে উদ্দাম উচ্ছল ঝরণা তাদের দু'জনার মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মতো অক্লান্ত বেগে ছুটে চল্‌ল।

ধীরে ধীরে চারিদিকে আঁধার নিবিড় হ'য়ে এল, সুন্দরীর নীলাঞ্চলে চুম্‌কির মতো, নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে' উঠ্‌ল। কৌতূহলী

হ'য়ে বুঝি তারা মুখর ঝরণার দু'পাশে এই দুটী মৌন প্রাণীকে দেখ্‌তে লাগল। কি চায় এরা? কোন্ মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে এরা? পরিণাম কি হবে এদের? তাই বুঝি তারা পরস্পরের মাঝে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল।

তার পরদিন প্রভাত হ'লে তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু যেমন ঝরণা তেমনি, কোথাও একটু সংকীর্ণ হয় নি, কোথাও তার গতিবেগ একটু মন্দ হয় নি—এ যেন অনন্ত কালের পথে অনাদি কাল থেকে ছুটে চলেছে। আবার সন্ধ্যা হ'ল, আবার নীলাকাশে লক্ষ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে' উঠ্‌ল। আবার তারা বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌ল।

পরদিন প্রভাতে আবার তারা চল্‌তে লাগ্‌ল, তার পরদিন—তার পর দিন, এমনি করে' তারা চল্‌তেই লাগ্‌ল। যতই তাদের আশা ব্যর্থ হচ্ছিল—ততই তাদের আকাঙ্খা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, যতই তাদের আকাঙ্খা প্রবল হচ্ছিল ততই তাদের উৎসাহ উদ্যম অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এমনি করে' কত দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কত উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে', কত পর্ব্বতচূড়া প্রদক্ষিণ করে' তারা সেই পার্ব্বত্য ঝরণার উজানে চল্‌ল। কিন্তু সে ঝরণার কোন পরিবর্ত্তন নেই—একই গতি, একই পরিসর, কোথায়ও এমন অবসর নেই যেখানে কল্পশেখর তা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে, সাহস করে' উল্লম্ফনের চেষ্টা করতে পারে। এমনি করে' পাঁচটী বৎসর কেটে গেল।

সেদিনও তারা চল্‌ছিল, হঠাৎ নির্ঝরিণীর হুহু শব্দকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে এক বিশাল গর্জ্জন তাদের কানে এসে বাজ্‌ল। যেন সহস্র প্রভঞ্জন এ সৃষ্টিকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে সহস্র দিকে একসঙ্গে ছুটেছে—যেন সপ্ত সিন্ধুর লক্ষ লক্ষ উর্ম্মি সহসা ক্ষিপ্ত হ'য়ে একসঙ্গে

পৃথিবার পায়ে এসে মাথা খুঁড়্‌ছে। কল্পশেখর একটু থেমে তরুণীকে বল্‌লে—"তরুণি শুন্‌ছ ?"

"শুন্‌ছি।"

"কিসের শব্দ এ ?"

"বুঝি মহাপ্রলয়ের ?"

"অগ্রসর হবার সাহস আছে ?"

"তুমি যেখানে যাবে সেখানে আমার ভয় নেই।"

"তবে চল।"

দুজনে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। তারা যতই অগ্রসর হতে লাগ্‌ল ততই সে গর্জ্জন প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে তারা সেই বিশাল গর্জ্জনের কারণ আবিষ্কার কর্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চলাও বন্ধ হ'ল। কিন্তু হায় তাদের যাত্রা শেষ হ'ল না!

তারা যেখানটায় এসে পড়্‌ল সেখানে তাদের সাম্‌নে বিশাল প্রাচীরের মত এক খাড়া পাহাড় আপনার মাথা তুলে রয়েছে—একেবারে খাড়া—দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, তৎদূর এই খাড়া পাহাড়। উপরে তাকিয়ে তার উচ্চতার শেষ দেখা যায় না। যেন বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীর সকল কৌতূহলের, সকল আশা-আকাঙ্খার বাধা স্বরূপ যোজন-দীর্ঘ যোজন-উচ্চ এক খাড়া প্রাচীর তৈরী করে' এখানে বসিয়ে দিয়েছেন ; পৃথিবীর মানুষের এখানেই গতির শেষ—আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। আর সেই পাহাড়ের মাথার উপর থেকে একটি প্রকাণ্ড জল-প্রপাত বিরাট গর্জ্জন করে' এসে পড়্‌ছে। এই প্রপাতই সেই ঝরণা হ'য়ে বয়ে গিয়েছে যার তীরে তীরে তারা এই পাঁচ বৎসর হেঁটে এসেছে। এই প্রপাতের শব্দই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত

হয়ে চতুর্গুণ শব্দে তাদের কানে এসে বাজ্‌ছিল। তারা সেই প্রপাত ও নির্ঝরিণীর সঙ্গম স্থলে নির্ঝরিণীর দু'পারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কল্পশেখর ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

এতদিন অন্ততঃ তাদের মিলনের চেষ্টা কর্‌বার উপায় ছিল, আজ তারও শেষ। হয় মিলন, নয় মিলনের চেষ্টা। চেষ্টাও যখন অসম্ভব, তখন জীবনে কাজ কি? কিন্তু এত সহজেই নিরস্ত হব? প্রথম বাধাতেই আ-জীবনের সাধনা পরাজয় মান্‌বে? অসম্ভব! কল্পশেখরের অন্তর দেবতা ত তা মান্‌তে চায় না। এই দুরারোহ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন পথই নেই? এই জলপ্রপাতেই নির্ঝরিণীর উৎপত্তি। সুতরাং সেখানেই এর শেষ। এই পাহাড়ের ওপরেই তাদের যাত্রা শেষ হবে—তাদের মিলন হবে। কল্পশেখর তার বামে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখ্‌ল। যতদূর দৃষ্টি চলে খাড়া পাহাড় পূর্ব্বে পশ্চিমে আপনাকে বিস্তার করে' নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন বল্‌ছে—মানুষ, তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা জল্পনা উদ্যম উৎসাহের এইখানে শেষ—যাও ধরিত্রীর সন্তান আপনার মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরে যাও।

এমন সময় সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে একবার কল্পশেখরকে আরবার তরুণীকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—যেন তাদের এখানে উপস্থিতির অর্থ সে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে সে কল্পশেখরকে সম্বোধন করে' বল্‌লে—"তুমি কে?"

"আমি মানব।"

তরুণীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে?"

"আমি মানবী।"

"কোথা থেকে আসছ তোমরা ?"

কল্পশেখর বল্‌লে—"আমরা আস্‌ছি সেই দেশ থেকে, যেখানে ফুল ফোটে আবার ঝরে' যায়—মানুষ জন্মে আবার মরে' যায়—যেখানে গড়ে আবার ভাঙে—ভাঙে আবার গড়ে—যেখানে আশার অন্ত নেই, আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, সাহসের সীমা নেই।"

"তোমরা মর্ত্ত্যের জীব ?"

"আমরা মর্ত্ত্যের জীব।"

"কি চাও তোমরা ?"

"তুমি কে ?"

"আমি গন্ধর্ব্ব।"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—আমরা চাই পরস্পরের মিলন। এই পাঁচ বৎসর ধরে' আমরা এই নির্ঝরিণীর দু'তীর দিয়ে দু'জনে হেঁটে এসেছি—আর এই পাঁচ বৎসর ধরে' এই নির্ঝরিণী আমাদের মাঝ দিয়ে একটা অনন্ত বাধার মত বয়ে' গিয়েছে। জানি আজ আমাদের যাত্রার শেষ। কোথায় ? ওইখানে—যেখান থেকে জলপ্রপাত পড়্‌ছে—ঐখানে নির্ঝরিণীর শেষ, ঐখানে বাধার শেষ, ঐখানে আমাদের মিলন হবে।"

"অসম্ভব।"

"কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব ?"

"তোমাদের মিলন।"

"কেন অসম্ভব গন্ধর্ব্ব ?"

"কেন অসম্ভব তা বল্‌তে পারিনে। তবে বোধ হয় মিলন হলে' সকল পাওয়ার, সকল চাওয়ার শেষ—তাই বুঝি অসম্ভব। শোনো মানব, এ চেষ্টা ছাড়—তোমরা ফিরে যাও।"

মানব উন্নত-শিরে বজ্র-কণ্ঠে বল্‌ল—"কখনও না।"

মানবী নত-নয়নে মৃদুস্বরে প্রতিধ্বনি কর্‌লে—"কখনও না।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার কি কোন উপায় নেই—কোন রাস্তা নেই গন্ধর্ব্ব?"

"তোমরা ফিরে যাও।"

"এ পর্ব্বতে আরোহণ করা কি অসম্ভব গন্ধর্ব্ব?"

"শোনো—তোমরা ফিরে যাও।"

"একি মানুষের অসাধ্য গন্ধর্ব্ব?"

"অসাধ্য নয়—দুঃসাধ্য।"

"তবে সাধ্য।"

"আপনার অদৃষ্টকে বশ কর্‌তে চাও?"

"চাই।"

"নিতান্তই ফির্‌বে না?"

"শোনো গন্ধর্ব্ব—ফির্‌ব কোথায়? ফেরা মানে মৃত্যু। আজন্ম যে স্বপ্ন অন্তরে সুপ্ত হয়েছিল—কৈশোরে যে স্বপ্ন অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার নিরুদ্দেশ সন্ধানে ঘরছাড়া করেছিল— যৌবনে গত পাঁচ বৎসর ধরে' যে আকাঙ্ক্ষার মাদকতা এ দেহের অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে—সেই স্বপ্ন সেই আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়তে বল, গন্ধর্ব্ব! মানুষের মন তুমি জান না।"

"বেশ তবে শোন। এ পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা আছে—কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে চাই অসীম ধৈর্য্য। তোমাদের তা আছে।"

"মানুষের ধৈর্য্যের সীমা নেই।"

গন্ধর্ব্ব বল্‌তে লাগ্‌ল—"এই যে পাহাড় এ প্রাচীরের মতো, যোজন দীর্ঘ—একেবারে প্রাচীরের মতো খাড়া। কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রাচীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুই প্রান্ত শুধু উপর থেকে ঢালু হ'য়ে নেমেছে। সেই ঢালু জায়গা দিয়ে এর উপরে ওঠ্‌বার পথ। এখন তোমাদের দু'জনকে নির্ঝরিণীর দু'তীর থেকে পর্ব্বতের দু'প্রান্তে পৌঁছিতে হবে। সেখানে পৌঁছে পাহাড়ে ওঠ্‌বার রাস্তা দেখ্‌বে। দু'ধার থেকে দু'রাস্তা বরাবর চলে' পাহাড়ের উপরের একটা হ্রদের তীরে প্রকাণ্ড একটা শাল্মলী তরুর মূলে এসে মিলেছে। সেই হ্রদ থেকেই এই ঝরণার উৎপত্তি। ওই রাস্তায় যদি তোমরা পথ হারিয়ে না ফেল তবে সেই হ্রদের তীরে তোমাদের মিলন হ'তে পারে।"

কল্পশেখর জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এ যাত্রা শেষ হবে কত দিনে?"

গন্ধর্ব্ব উত্তর দিলে—"কত দিনে তা কে জানে—কে বল্‌বে সে কথা?"

গন্ধর্ব্ব অন্তর্ধান হ'ল।

কল্পশেখর তরুণীর দিকে ফিরে বল্‌ল—"তরুণী সাহস আছে?" তরুণী উত্তর দিলে—"আছে।"

"লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে না?"

"না।"

দু'জনে দু'দিকে যাত্রা কর্‌ল। কত দিনের জন্যে কে বল্‌বে?

* * * * *

সে দিন সূর্য্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখর বাতাসের গায় তাজা পদ্ম ও ভিজে শেওলার গন্ধ পেলে। কল্পশেখর বুঝ্‌ল যে গন্ধর্ব্ব যে হ্রদের কথা বল্‌ছিল সে হ্রদ আর বেশি দূরে নয়—তার যাত্রা শেষ হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। কল্পশেখর দ্রুত পদে চল্‌তে লাগ্‌ল। যখন চারদিক আঁধার হয়ে এল তখন সে হ্রদের তীরে এসে পৌঁছিল। চারদিকে চেয়ে সে হ্রদের উত্তর তীরে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখ্‌তে পেলে। বুঝ্‌লে এই সেই শাল্মলী তরু। কল্পশেখর হ্রদের তীর দিয়ে গিয়ে সেই শাল্মলী তরুর মূলে পৌঁছিল। তারপর তারি নীচে বসে' পড়্‌ল।

চারদিক তখন নিবিড় কালো আঁধারে ঢেকে গেছে—গভীর নিস্তব্ধতায় ভরে উঠেছে। আলকাৎরার চাইতেও কালো সে আঁধার, মৃত্যুর চাইতেও গভীর সে নিস্তব্ধতা। এম্‌নি আঁধারের মাঝে, এমনি নিস্তব্ধতার মাঝে কল্পশেখর বসে' বসে' হাজার চিন্তার জালে তার মনটাকে জড়াতে লাগ্‌ল।

কল্পশেখরের ত আজ যাত্রা শেষ। কিন্তু তরুণী!—কোথায় সে? সে কি এই কঠিন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে' আস্‌তে পার্‌বে এই তার গম্য-স্থানে—এই তাঁর কাম্য-স্থানে? পথে কত বিপদ কত আপদ অতিক্রম করে' না কল্পশেখর আজ এই হ্রদের তীরে কত বর্ষ পরে পৌঁছেচে—ওঃ কত বর্ষ—সে যেন সৃষ্টির আগে হতে—সারাজীবন যেন সে পথই চলেছে—এই সাহস এই ধৈর্য্য কি তরুণীর হবে?—ওঃ—তরুণি—তরুণি!

সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতা বিভিন্ন করে' কার পায়ের শব্দ কল্পশেখরের কানে এসে বাজ্‌ল। কল্পশেখর উৎকর্ণ হয়ে সেই দিকে

চেয়ে দেখ্‌ল। নিবিড় আঁধারে কিছুই দেখা যায় না—কিন্তু স্পষ্ট পদশব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে কল্পশেখরের দৃষ্টি আঁধার ভেদ কর্‌তে সমর্থ হ'ল। সে দেখ্‌লে একটা মানুষের মূর্ত্তিই বটে—তারই পানে আস্‌ছে।

কল্পশেখরের শিরায় শিরায় শোণিত দুরন্ত নৃত্য লাগিয়ে দিল—তার হৃদয়ে যেন অসংখ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল। কল্পশেখর উঠে সেই মূর্ত্তিটীর পানে অগ্রসর হ'ল। যখন তারা পরস্পর কাছাকাছি হ'ল তখন কল্পশেখর যেন অপরিচিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তুমি কে?"

"আমি তরুণী।"

মুহূর্ত্তে চারটি বাহু দুইটি দেহকে জড়িয়ে নিল—তাদের আজীবন ব্যর্থ প্রাণের অনন্ত পিপাসা নিয়ে, চারটি অধর একটা নিবিড় চুম্বনে যুক্ত হ'ল—তাদের আজীবন পরিপুষ্ট হৃদয়ের অদম্য কামনা নিয়ে। তারপর আজীবন সাধনার সিদ্ধিলাভের শেষে জীবনব্যাপী ক্লান্তি যেন তাদের দুটি শরীরের ওপরে একেবারে ভেঙে পড়্‌ল—তারা সেইখানে বসে' পড়্‌ল—তারপর ধীরে ধীরে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে সেই পাষাণ শয্যায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল। পাষাণ-শয্যা?—না, সে-শয্যা পুষ্পের চাইতেও কোমল।

পরদিন প্রথম উষার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশেখরের ঘুম ভাঙ্‌ল। ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়্‌ল। সফল তার জীবন। আজীবন সাধনার ধন আজ তার আলিঙ্গনে। কল্পশেখর আলিঙ্গন-বদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—একি!!!

উদ্যতফণা ফণিণীকে সাম্‌নে দেখ্‌লে পথিক যেমন লাফিয়ে উঠে দশ হাত পিছিয়ে যায়, তেমনি চক্ষের পলকে কল্পশেখর তাকে আপনার আলিঙ্গন মুক্ত করে' লাফিয়ে উঠে সেই পাষাণ শয্যার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। তারপর বজ্রাহতের মতো শূন্যদৃষ্টিতে তারি সারা-নিশার আলিঙ্গনবদ্ধা নিদ্রাভিভূতার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিদ্রাভিভূতা আলিঙ্গনচ্যুতা হ'য়ে ধীরে ধীরে চোখ মেল্‌ল। পাষাণ শয্যা ত্যাগ করে' উঠে বস্‌ল। তারপর কল্পশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল!

কল্পশেখর কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কে তুমি?"

"আমি তরুণী।"

কল্পশেখর পাগলের মতো হেসে উঠ্‌ল। সে হাসি আশে পাশে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে কোন্ এক প্রেতলোকের বিকট বীভৎস শব্দের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। চীৎকার করে' নিশির সঙ্গিনীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে ঘৃণার স্বরে বলে উঠ্‌ল—"তুমি—তুমি তরুণী—এই লোল চর্ম্ম, বিরল দন্ত, মুখের উপরে শুক্‌নো চামড়ার মতো দু'খানা ঠোঁট—দীপ্তিহীন কোটরগত ঐ দু'টি চোখ—মাথায় কাশফুলের মতো সাদা একরাশ চুল—তুমি—তুমি—তরুণী!"

জরাগ্রস্ত রমণী করুণ বিষাদের হাসি হেসে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কল্পশেখরের কাছে এসে তার হাতখানি ধরে' তাকে হ্রদের তীরে জলের কিনারে নিয়ে গেল। তারপর আপনার কৃশ হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি বিস্তার করে' জলের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"দেখ।" কল্পশেখর দেখ্‌ল।

কল্পশেখর দেখ্‌ল হ্রদের জলে আপনার প্রতিবিম্ব। পেশীহীন গণ্ডদ্বয়ে রসহীন চাম্‌ড়া ঝুল্‌ছে—সাদা ভুরুর নীচে কোটরগত দু'টি চক্ষু কুয়াশায় ঢেকে গেছে—মসৃণ ললাটে করাল কাল তার নিষ্ঠুর দাঁত বসিয়েছে—আর মাথার ওপরে বরফের চাইতেও সাদা একরাশ চুল গুচ্ছে গুচ্ছে তার অস্থি-চর্ম্ম-সম্বল কাঁধের ওপরে এসে পড়েছে। তরুণীর ধ্যানে এতদিন তার তা চোখেই পড়ে নি। কল্পশেখর দুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে সেইখানে বসে পড়ল।

মানুষের দেহ তার মনকে ব্যর্থ করেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বন্ধু।

—-০:*:০—-

অজিতদের যে গ্রামে বসবাস, সে গ্রামে ত'দের স্বজন বা স্বজাতীয় বল্‌তে কেউ ছিল না। তেমনতর একটি স্থানকে অজিতের পূর্ব্ব-পুরুষ যে বাড়া করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করেছিলেন, তার কারণ তাঁর কাছে হয়ত স্বজন বা স্বজাতির চাইতে জল-বাতাস-আলোর খাতিরটা ছিল ঢের বেশি। অজিতের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যেন সমস্ত গ্রামের ভিতর ছিল গ্রাম্য-দেবতা, অথবা দেবতার চাইতেও উন্নততর কোন জীব। কারণ, তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যে ক'জনের সঙ্গে আমার পরিচয়, তাঁদের ত জানি সবারই ভোগ-রাগ আছে, মানুষের হাতে তৈরী লুচি-সন্দেশ বা পোলাও পরমান্নে। কিন্তু অজিতদের গ্রামবাসীরা তাদের কাছে ছিল এতই হেয়, যে তাদের ছোঁয়া লাগ্‌লে অজিতদের বাড়ীর কুয়োটার পর্য্যন্ত জাতিপাত হবার সম্ভাবনা।

এই গ্রামে জয়হরি সরকার ছিল একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। জমি-জমা তার ছিল বিস্তর। আর নিজহাতেই সে চাষ-আবাদের কাজ করত। জয়হরির ব্যবসা ঘৃণিত হলেও, তার সততার খ্যাতি গ্রামের ভিতর বেশ ছিল। তার মানের অভাব থাক্‌লেও, ধনের অসদ্ভাব ছিল না। জাতিতে জয়হরি ছিল নমঃশূদ্র। এই জয়হরি সরকারের পুত্র ভজহরি হ'ল অজিতের বন্ধু।

অজিত আর ভজহরির মধ্যে কোন্ সূত্রে বন্ধুত্ব হ'ল, তার ইতিহাস একটুখানি বলে রাখা আবশ্যক। আন্তরিক প্রীতির যোগই এ বন্ধুত্বের ভিত্তি নয়। বর-কণের পরস্পরের হৃদয়ের প্রীতি বা প্রাণের আকর্ষণ ব্যতিরেকে, একমাত্র অভিভাবকদের মর্জ্জিতেই যেমন তাদের উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়, তেমনিতর অজিত ও ভজহরির মধ্যে যে বন্ধুত্বের যোগ,—ও ব্যাপারটি অভিভাবকদের ইচ্ছা ক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

অজিত যখন ছ'সাত বছরের বালক, তখন দেশে একটি নতুন ব্যামো দেখা দিয়েছিল। সেকালে পল্লীর পিতামাতার অন্তরে এই একটি সংস্কার ছিল, যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধ পাতিয়ে পুত্র কন্যাদের ধর্ম্ম-সূত্রে যুক্ত না করলে, ধর্ম্মরাজের চর বা অনুচর বর্গের হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই। সে কারণ, নতুন ব্যামোটি যখন দেখা দিল, তখন চিকিৎসকের শরণাগত হবার আগ্রহ পল্লীবাসীদের ভিতর তেমন প্রকাশ পেলে না; বরং ধর্ম্ম-রাজের অনুচরবৃন্দকে একটি বন্ধনের অজুহাত দেখাবার জন্য ধর্ম্মকে স্বাক্ষী-রেখে "সই" পাতাবার বা বন্ধুত্ব স্থাপন কর্‌বার হুজুগটা পল্লীতে বড় বেশি বেড়ে গেল।

অজিতের ঠাকুরমা ছিলেন সেকালের গিন্নি। এমন কোন কুসংস্কার দেশে ছিল না, যার উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা না ছিল, দেশে এমন কোন আজগুবি কথা উঠ্‌ত না, যার উপর তিনি বিশ্বাস স্থাপন না করতেন। আকাশের অনন্তব্যাপী যে নীলিমা, ওটা একদিন একটা শামিয়ানার মতো মানুষের ঠিক মাথার উপরেই ছিল, হাত বাড়িয়ে বেশ ছোঁয়াও চল্‌ত। তারপর কোন্ আদ্যিকালের এক বুড়ি কোন রাজার বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে হাতের ঝাঁটাখানি তুলে যেমনি আকাশের গায়ে একটি বাড়ি মার্‌লে, অমনি ক্ষোভে অভিমানে

নিকটের আকাশ কোন্ সুদূরে প্রস্থান কর্‌ল,—এম্‌নি ধরণের ঢের ঢের শিক্ষা অজিত তার ঠাকুরমার কাছে পেয়েছিল। তারপর পৃথিবীটা যে ত্রিকোণ, তিন মুড়োতে তিনটি ভীমকায় জন্তু,—সিংহ, হস্তী আর অজগর, পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে, আর এরাই ধরার পাপের ভার যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন এক একবার ঘাড় নাড়া দেয়, আর অমনি পৃথিবীতে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়,—অজিত ইংরেজি ইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে যেদিন থেকে 'বিজ্ঞান পাঠ' পড়্‌তে সুরু করেছিল, সেই দিন থেকে ঠাকুরমার ঐ রকমের ধারণাগুলি দূর করবার জন্য তাঁর সঙ্গে বিস্তর তর্ক বিতর্ক করেছিল, কিন্তু তবু কৃতকার্য্য হতে পারে নি। দেশে নতুন ব্যামোটি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, তার "প্রিভেণ্টিভ" স্বরূপ একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধ পাতাবার যে হুজুগটা উঠেছিল, সেটা এহেন ঠাকুরমার কানে যেদিন এসে পৌঁছিল, সেদিন কাউকে ধরে তাঁর নাতিটির সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে দেবার তাঁর ব্যস্ততার আর পরিসীমা রইল না। কিন্তু ভদ্র-পরিবার গ্রামে একটিও ছিল না। গ্রামের ভিতর অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল জয়হরি সরকার। তার পুত্র ভজহরি অজিতদের পাঠশালাতেই পড়্‌ত, আর বয়সেও সে ছিল অজিতের সমান। তারপর চেহারাখানিও তার ছিল বেশ ভদ্র-দস্তুর। জাতিতে নমঃশূদ্র হলেও, একটি ব্রাহ্মণ কুমারের বন্ধু হবার যোগ্যতা গ্রামের ভিতর যদি কারু থাকে, ত সে হ'ল ভজহরি। ঠাকুরমা ভজহরিকেই মনোনীত কর্‌লেন।

যদিচ প্রাণের প্রীতিই বন্ধু দু'টির মিলনের সূত্র নয়, তবু যে পর্য্যন্ত অজিত গ্রামের পাঠশালাতে পড়েছিল, ভজহরিকে না হ'লে তার চল্‌ত না।

বাড়ীর ভিতর তার খেলার একমাত্র সাথী ছিল তার ছোট বোনটি—রেণুকা, আর পাঠশালাতে অজিতের প্রধান সঙ্গীই হ'ল ভজহরি। অজিত যখন পাঠশালা থেকে ফিরত, গঙ্গাজলে তার দেহের পরিশুদ্ধি না হ'লে ঠাকুরমা অবশ্য তাকে স্পর্শ করতেন না। তবু জাতিতে ভজহরি তার চাইতে যে ঢের নীচু, সে কারণে পাঠশালার জীবনে অজিতের অন্তরে তার প্রতি কোনরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয় নি। কিন্তু অজিতের বাপ যখন জেলা কোর্টে ওকালতি করতে বসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অজিত পাঠশালার পড়া শেষ করে, সহরের ইংরেজি ইস্কুলে পড়তে সুরু করল, তখন ভজহরির সম্বন্ধে অজিতের মনোভাবের বেশ একটু বিপর্য্যয় ঘটল। ছুটিতে অজিত যখন সহর থেকে বাড়ী আসত, ভজহরির সংসর্গ সে আদৌ আর বাঞ্ছনীয় মনে করত না; বরং অজিতের মনে একটা শঙ্কা থাকত, কখন বা ভজহরি ছুটে এসে বন্ধু বলে তাকে সম্বোধন করে। দু'জনের ভিতর যে আকাশ পাতাল প্রভেদ! ভজহরির প্রমোশন হয়েছে গ্রামের পাঠশালা থেকে বাড়ীর গো-শালাতে। আর অজিত সহরের ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। মা, খুড়িমা, মাসী, পিশি সবার কাছে অজিত ইংরেজিতে কত কথা কয়! জল আবশ্যক হ'লে, ছোট বোনটিকে আদেশ করে, 'রেণু! এক গেলাস ওয়াটার।' ভাত চাইতে হ'লে মাকে ডেকে বলে, 'মাদার, এক মুঠো রাইস্ দাও।' আবার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে,—'ঠাকুরমা, তুমি আমার গ্র্যাণ্ড মাদার।' তারপর চাকর-বাকর, অতিথি-অভ্যাগত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অজিত উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ইংরেজি পুঁথির পাঠ আবৃত্তি করে,—"আই মেট্ এ লেম ম্যান্ ক্লোজ টু মাই ফার্ম,"

ইত্যাদি। ইংরেজিতে যে এতদূর বিদ্বান, সে গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশোনা ইতি করেছে এমন একটি কৃষক-বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করতে লজ্জিত না হবেই বা কেন? ভজহরি আবার জাতিতেও এমনি নীচ যে, তার হাতের জলটুকু মুখে তুলতেও নেই। তারপর ভজহরির পিতা জয়হরি সরকার সামান্য একজন হেলে। অজিতের বাপের সঙ্গে সে লাগে কোথায়? অজিতের বাপ জেলা কোর্টের উকীল, জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজি ভাষাতে কত লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন। এমনি ধারা যথেষ্ট হেতু ছিল, যাতে করে অজিতের মনোবৃত্তিগুলো দিনে দিনে ভজহরির প্রতি বিমুখ হয়ে উঠ্ল। তবু অজিতের বাড়ী আস্বার সংবাদটি কানে পৌঁছামাত্র, ভজহরির পিসিমা ভ্রাতষ্পুত্রের বেশ-ভূষা বেশ একটু পরিপাটি করে, তাকে সঙ্গে নিয়ে অজিতদের বাড়ী এসে হাজির হ'ত।

ভজহরির মাথার উশ্‌কো-খুশ্‌কো চুলগুলো তেলে-জলে বেশ করে চুপিয়ে দেওয়া হ'ত। পরণে তার থাক্‌ত রঙ্গীন জোলাটে কাপড়, ঘাড়ের উপর কোঁচানো ফুলদার একখানি চাদর। দু'হাতে তার রূপোর দু'গাছি বালা। তারপর ভজহরির কপালের উপর এসে পড়্‌ত, তার এক গোছা চুলের সঙ্গে সংলগ্ন রূপোর দু'টি ঘুন্‌টি। আর তার বুকের উপর ঝুল্‌ত রূপোর একটি পান।

কিন্তু ভজহরির এই সজ্জাটি তার পিসিমার প্রাণে যতই আনন্দ দান করুক না কেন, অজিতের অন্তরে আদৌ প্রীতির সঞ্চার কর্‌ত না। ইংরেজি ইস্কুলের বিদ্যা আর সহরের অভিজ্ঞতা নিয়ে অজিত যে কালে বাড়ী আস্‌ত, গ্রামের ভজহরি ছোঁড়াটা তার যে বন্ধু এ কথা স্মরণ করে, অজিত ঠাকুরমার গুরুতর অপরাধটি মনে প্রাণে কোনক্রমে

আর ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ত না। ভজহরি পিসিমার সঙ্গে এসে অজিতদের অন্দর-বাড়ীতে যেমনি প্রবেশ কর্‌ত, অজিত বাহির-বাড়ীতে দৌড়ে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একখানি চৌকী টেনে বসে, খুব করে' দু' পা নাচাত। এরপর অবশ্য, ভজহরি তার বন্ধুর সাহচর্য্য লাভের আশা ত্যাগ করে পিসিমার আঁচল খানিই বিশেষ করে আশ্রয় কর্‌ত।

অজিত বিদ্যার সিঁড়ি এক একটি করে ডিঙ্গিয়ে যতই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল, তার বন্ধু ভজহরির স্মৃতি, কালির আঁচরটির মতো যেন ছুরি দিয়ে চেঁচে উঠিয়ে মনটাকে পরিষ্কার করে ফেল্‌ল। এর পর ঠাকুরমার মৃত্যুতে গ্রামটির সঙ্গেও অজিতদের সম্বন্ধ এক রকম ঘুচ্‌ল। আত্মীয় স্বজন বা স্বজাতি মোটেই যেখানে নেই, তেমনতর একটি স্থানে অজিতদের যে বস-বাস বজায় ছিল, তার একমাত্র হেতুই হ'ল—ঠাকুরমা। স্বামীর প্রেম-প্রীতির আকর্ষণী-শক্তি যেন গ্রামের মাটিতে জড়িয়ে থেকে ঠাকুরমাকে সেই খানেই আবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যু যে দিন ঠাকুরমাকেই সেখান থেকে টেনে সরিয়ে ফেল্‌ল, তখন আর গ্রামের ভিঁটে মাটি ত্যাগ করে একেবারে সহুরে হবার পক্ষে অজিতদের কোন দিকে কোন বাধা রইল না।

অজিত এরপর স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ কর্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার মাত্রাও তার দিন দিন বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। আর একটিবার তার মনের গতির চেহারা বদল হল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সোপানটি অতিক্রম করে এসে, অজিত একটিবার ফিরে চাইল। অমনি তার পনেরো বৎসরের সাধনার যে ধন তার মোহটা অনেকখানি কেটে গেল।

গ্রামের বিল-খাল, নালা-ডোবাতে বন্যার জল যখন প্রথমে এসে

পড়ে, তখন তার চলার ভঙ্গীতে, উৎক্ষেপ বিক্ষেপে, উদ্দাম গতিতে, কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দে তার আগমন-বার্ত্তা দশ জনকে জানিয়ে দেয়। জ্ঞানের আসার রীতিও যেন তাই। কিন্তু যে দিন তার পরিপূর্ণ, প্রশান্ত রূপটির দর্শন-লাভ ঘটে তখন চিত্তের সমস্ত বাড়াবাড়ি ভাব সমাহিত হয়ে আসে। সেই পূর্ণ জ্ঞানের আভাতে অজিতের মনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, তার বিদ্যার আস্ফালন, শিক্ষার অভিমান, বংশের গৌরব, জাতের বড়াই তার মন থেকে অন্তর্হিত হ'ল।

তার প্রাণের উপর রুশীয় সোস্যালিজ্‌ম্‌ আর ফরাসী সাম্যবাদের ধ্বজা উড়্‌ল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ জীবনের চির-সাথী হ'ল। টলষ্টয়, গান্ধীকে অজিত তার জীবনের আদর্শ কর্‌ল। মিল, টুর্‌গেনিফ ইব্‌সেন্‌, বার্ণার্ড শ, গ্যালস্‌ওয়ার্থী প্রভৃতি সাহিত্যিকদের অজিত তার গুরু-পদে অভিষিক্ত কর্‌ল। দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বদ্ধ-বাতাসে অজিতের অন্তর পুরুষটি যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। দেশের একদল নবীন সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে অজিত জাতীয় মনের আব্‌হাওয়াতে বিপুল একটি পরিবর্ত্তন ঘটাতে প্রবৃত্ত হ'ল। সমাজ-সংস্কারকদের দলের একজন চাঁই হয়ে, অজিত দেশের সমাজটাকে ভেঙ্গে-চুরে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপর নতুন করে তার গোড়াপত্তন কর্‌তে কৃতসংকল্প পেল। পল্লীর উন্নতি সাধন আর দেশের নারী-জাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান, এই দু'টি তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল। লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত জন-সাধারণের অন্তরে আত্ম-সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলা, দেশের কৃষক শ্রেণীর মান বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে অজিত যেন একবারে উঠে পড়ে লাগ্‌ল।

কিন্তু একদিকে অজিত যেমন দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে সারা হচ্ছিল, অন্যদিকে অজিতের পিতা অনাদিনাথ তেমনি পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বিশেষ করে মন দিয়েছিলেন। অজিত এম্ এ, পাশ কর্‌বার পর থেকে, অনাদিনাথ প্রতিদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়ে তাঁকে সেলাম জানিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর বেশ একটি সুযোগ উপস্থিত হ'ল। বিভাগীয় কমিশনার সাহেব অনাদিনাথের কোন এক মক্কেল-জমিদারের এলাকার ভিতর শিকার কর্‌তে এলেন। অনাদিনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে জমিদারের খরচায় রসদাদি জোগালেন, এবং যথা-বিধি তদ্‌বির-তদারক কর্‌লেন। এর ফলে, অনাদিনাথ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আর বিভাগীয় কমিশনার উভয়েরই বিশেষ প্রীতিভাজন হলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে হাকিমী-পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা পুত্র অজিত-মোহনের অনেকটা বেড়ে গেল। তবু একটা বাধা ছিল, অজিতের বয়সের অঙ্কে একটি বৎসর বাহুল্য হয়ে পড়েছিল। সেটি ঝেড়ে ফেল্‌তে অজিতের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে অজিত এমন একটি সত্য-পাঠ কর্‌ল, যার প্রধান অঙ্গই হ'ল—জল-জ্যান্ত একটি মিথ্যা!

যে পদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল চোরকে সাজা দেওয়া, সেই পদটি অধিকার কর্‌বার জন্য সর্ব্বপ্রথমে চুরি বিদ্যাই অজিতকে অবলম্বন করতে হ'ল। তবে পরদ্রব্য অবশ্য নয়, আপনার বয়স চুরি, কাজটি হয়ত গর্হিত না হতেও পারে। তবু অজিতের বিবেক-বুদ্ধি তার প্রাণে যে হুল না ফুটিয়েছিল, তা নয়। কিন্তু মাথার উপর ছিল তার পিতৃ-আজ্ঞা। পরশুরাম যে দেশের দশ-অবতারের এক অবতার, সেই দেশেতে জন্ম নিয়ে পিতৃ-আদেশ অমান্য করবে এমন সাধ্য কার?

কত যুগ যুগান্তরের শ্রদ্ধার ভারে যে সংস্কারটি মনের ভিতর কেটে বসেছে, একদিন ইচ্ছামাত্র সেটিকে মন থেকে সরিয়ে ফেলা, বড় সহজ কথা ত নয়। কাজেই দেশের উন্নতিকল্পে যে সব শুভ অভিপ্রায় আকাশের তারার মত অজিতের অন্তরে এক একটি করে ফুটে উঠেছিল, পিতৃ-আজ্ঞার সুমুখে এক নিমিষে সব যেন আকাশ কুসুমের মতো ঝরে পড়্‌ল। দেশ উদ্ধারের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে, চোর ডাকাতের দণ্ড-মুণ্ডের একটি বিধাতারূপে অজিত একদিন বিচার-আসন দখল কর্‌ল।

অজিতের কার্য্যকালের প্রথম দু'টি বৎসর কেটেছিল তার আপনার জেলাতে। সেই সময়ের একটি ঘটনা, নিতান্ত ক্ষুদ্র হ'লেও আজকের এই ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

যে গ্রামের মাটিতে অজিত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর যাকে জড়িয়েছিল তার শৈশবের স্মৃতি, অর্দ্ধ যুগ বাদে আবার একটি দিন অজিত সেই গ্রামে পদার্পণ কর্‌ল। এবার অবশ্য গ্রামের একজন অধিবাসী রূপে নয়, একটি বাঁটোয়ারা মোকদ্দমার তদন্তকারী একজন হাকিম স্বরূপে। গ্রামে এসে অজিত তার বাড়ীর ভিঁটেতেই তাঁবু গাড়্‌ল। বাড়ীর ঘর-দুয়োর তখন একখানিও অবশিষ্ট ছিল না। ঘরগুলোর সব চালের খড় পচে খসে পড়েছিল। বাঁশের সাজ উঁইতে জীর্ণ করেছিল। মাটির দেয়াল বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ধ্বসে পড়েছিল। ঘরের মেঝের উপর ঘাস-দূর্ব্বো গজিয়েছিল। আর বাড়ীর উঠোন এরণ্ড-আকন্দ, শুঁটি, ভেঁটি, তৃণ, লতা, গুল্মতে ভরে উটেছিল। বাড়ীর এই দৃশ্য কোন পরম আত্মীয়ের চরম দুর্দ্দশার মতো অজিতের মনকে বড়ই পীড়া দিতে লাগ্‌ল। আজ যেন অতীত তার মোহিনী রূপ ধারণ

করে অজিতের অন্তর মাঝে দেখা দিলে। রেণু,—আহা রেণু, আজ কোথায়? ছোট বোনটির কথা মনে আস্‌তেই বেদনার একটি প্রবল উচ্ছ্বাস অজিতের প্রাণটার ভিতর ঢেউ তুল্‌ল। অজিতের মনে পড়্‌ল, পুজোর পর ইস্কুলের ছুটি যখন শেষ হয়, বাড়ী থেকে তার যাত্রার দিনে, সে যখন নদীর ঘাটে নৌকোতে এসে উঠ্‌ল, রেণু ঠাকুরমার আঁচলখানি ধরে ঘাটের পাড়ের উপর দাঁড়াল, আর নৌকোখানি যে পর্য্যন্ত না তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এল, রেণু সেইখানে ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে দাদার নৌকোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। রেণুর কাছে সেই হ'ল অজিতের জন্মশোধ বিদায়।

ঠাকুরমা?—ঠাকুরমার ত স্নেহের অন্ত ছিল না। নিত্যি তিরিশ দিন সাঁঝের সময় মণ্ডপ-ঘরের দুয়োরে উপুড় হয়ে পড়ে অজিতের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর দেবতার কাছে তিনি কত প্রার্থনাই না করেছেন। আহা! ঠাকুরমাও আজ আর নেই।

অজিতের প্রীতি ও অনুরাগের যে ধারাটি দিনে দিনে শুকিয়ে এসেছিল, আজ আবার তাতে প্রবল জোয়ার এল। আর সেই জোয়ারে ভেসে এল আর একজনের স্মৃতি। সে হ'ল গ্রামের জয়হরি সরকারের পুত্র ভজহরি সরকার। গ্রামের যে পাঠশালাতে অজিত ভজহরির সঙ্গে একত্রে পড়্‌ত, আজও সে পাঠশালা আছে। তবে যাঁদের যত্নে পাঠশালা গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল, তাঁদের অভাবে অনাদরের রূপ পাঠশালার ঘরে ফুটে বেরিয়েছে। ঘরের মেঝেতে এতই ধুলো জমেছে যে, একত্র কর্‌লে তার ওজন হয়ত এক মণের কম হবে না। ঘরের চৌকাঠ-কবাট কোথায় সব অদৃশ্য হয়েছে, আর তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য রয়েছে ক'খানি দরমা।

বেঞ্চিগুলোর ভিতর কোনোখানির হয়ত একদিকের দুটো পায়া ভেঙ্গেই গেছে আর সেই পায়ার পরিবর্ত্তে দুটো বাঁশের খুঁটো পুঁতে রাখা হয়েছে। একখানি বেঞ্চির গায়ে আজও লেখা রয়েছে, 'ভজহরি আমার বন্ধু।' অজিত একদিন তার ছুরির ডগা দিয়ে আঁচড় কেটে ওবাক্যটি বেঞ্চির গায়ে লিখেছিল। এরপর অজিত যখন ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়্তে গিয়েছিল, তখন ভজহরির প্রতি তার কি অবজ্ঞা! আর ঠাকুরমা ভজহরিকে বড়ই অসামান্য একটি অধিকার দান করেছেন, এইটে বিবেচনা করে, অজিত তার ঠাকুরমাকে পর্য্যন্ত ক্ষমা কর্‌তে পারে নি। ঠাকুরমার কাছে অজিতের সে অপরাধের গুরুত্ব যেন আজ দশগুণ বেড়ে উঠ্‌ল। আইডিয়ালের যে উচ্চ আকাশে অজিতের প্রাণটি একদিন ডানা মেলে ছিল, সেইখান থেকে অজিত লক্ষ্য করে দেখ্‌ল, ভজহরিকে হেয় জ্ঞান কর্‌তে পারে এমন কোন হেতু তার নেই। ভজহরির পেটে বিদ্যা নেই বটে, কিন্তু অজিতের বিদ্যাই বা তার কোন্ কাজে লাগ্‌ছে? অজিত ত একদিন দেশ-বিদেশের ঢের ইতিহাস মুখস্থ করেছিল। অমুক রাজার রাজত্বকালে অমুক দেশের রাজনীতিক বা সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল। অমুক সাম্রাজ্য কি ভাবে গড়ে উঠ্‌ল। অমুক দেশের অমুক সময়ের ধর্ম্ম বা সমাজ-বিপ্লব কি ভাবে সংঘটন হ'ল। অমুক সভ্যতার কি রূপ, কি নিদর্শন, কি আদর্শ, কি মুলমন্ত্র ইত্যাদি ঢের তথ্য অজিত জেনে ছিল। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা চুরি মোকদ্দমার রায় লিখে, অথবা বাঁটোয়ারা মোকদ্দমার তদন্তের রিপোর্ট লিখে যার জীবন কাট্‌ছে, তার দেশ-বিদেশের নানা তথ্য জেনে রাখবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? আর শিক্ষার গুমরই বা কোথায়? অজিত যখন কলেজে পড়েছে, অনেক

রাত জেগে এথিক্‌সের সূত্রগুলো ধরে সে টানা হেঁচ্‌ড়া করেছে। সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেহারা অজিত পর্য্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তার জীবনের ফাঁকে সুবৃহৎ ও সুস্পষ্ট মিথ্যা প্রবেশ লাভ করেছে।

অজিতের মগজের ভিতর যে সব আইডিয়া একদিন ভিড় করেছিল, যদিও সে গুলো অন্তর্হিত হয়েছিল, তবুও তারা তার মনের উপর রেখাপাত করে গিয়েছিল। সেই রেখাগুলো আজ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আইডিয়ালের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে অজিত তার আপনার জীবনটাকে বড়ই খাটো করে দেখ্‌ল। আর তার কল্পনার দৃষ্টিতে কৃষক-পুত্র ভজহরির জীবনটাই মহিমাময় হয়ে উঠ্‌ল। অজিত মনে মনে ঠাহর কর্‌ল, ভজহরির যথেষ্ট সমাদর করে, ঠাকুরমার কাছে তার অপরাধের গুরুত্ব লাঘব কর্‌বে। সেই কারণে, ভজহরিকে ডাক্‌বার জন্য অজিত সেই দিন সাঁঝের আগে তার কাছে লোক পাঠাল।

প্রবল প্রতাপান্বিত যে পুলিশ-দারোগা তার উপরেও অজিতমোহন হ'ল দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতারূপী একজন হাকিম। ভজহরি ঘাড়ের উপর চাদরখানি ফেলে দিয়েই, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাকিম অজিতমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দৌড় দিল। আস্‌বার পথে, অজিতমোহন যে এককালে তার বন্ধু ছিল, এই দুরন্ত চিন্তাটি বারবার একটি বিভীষিকার মত ভজহরির অন্তরে উদয় হল। আর ভজহরি শঙ্কিত হয়ে সেটিকে তার সমস্ত মন দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। বিশহাত দূরে থাক্‌তেই, ভজহরি জোড়-করে একেবারে নুইয়ে পড়ে মাটীতে কপাল ঠেকাবার উপক্রম করল। অজিত হাকিমী পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও, মানুষের মনুষ্যত্বকে কোন রকমে খর্ব্ব হতে দেখ্‌লে, বড় বেশি খুসি

হ'তে পারত না। আর আজকের কথা ত ছিল স্বতন্ত্র। ভজহরি তার কাছে এতদূর খাটো হয়ে যে আসবে, এটা যদিও খুব স্বাভাবিক, তবু অজিতের কল্পনাকে যথেষ্ট পীড়া দেবারই কথা। তারপর যে এতদূর খাটো হয়ে এল, তাকে বন্ধু-সম্ভাষণে আপনার উচ্চতর প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে উন্নত করা, অজিতের পক্ষে বড় সহজ হ'ল না। দু'টো বিপরীত শক্তি তার প্রাণের ভিতর যেন ঠেলাঠেলি করতে সুরু করল। একদিকে হাকিমী পদের মান-মর্য্যাদার দাবী আর অন্যদিকে তার আদর্শ-জীবনের উদার সাম্য-জ্ঞান, যেন দুটো ষাঁড়ের মত অজিতের মনের ক্ষেত্রে বিষম একটা হুড়াহুড়ি বাধিয়ে দিল। সেই লড়াই-এর একটু ফাঁকে একটি কথা অজিতের প্রাণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, "বন্ধু"! এ কথায় বক্তা ও শ্রোতা দু'জনেই সমান চম্‌কে উঠল। অজিত লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল, ভজহরি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর পত্র।

—ঃ০ঃ—

৺চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজীবন পত্রব্যবহার ছিল। এই পত্রযোগে পরস্পরের ভিতর বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা চল্‌ত। বসু মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ, তিনি সাহিত্যসেবীদের মধ্যে এইরূপ literary correspondence-এর প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আজ ৩৪ বৎসর পূর্ব্বের লেখা বসু মহাশয়ের দু'খানি পত্র প্রকাশ করছি—এর থেকে সেকালে কি ভাবে সাহিত্য আলোচনা করা হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

সম্পাদক।

(১)

কলিকাতা
৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পড়িয়া আমি বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমি যাহাদিগকে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে সম্মান করি, তাঁহারা আমাকে স্নেহ করেন ইহা বুঝিতে পারিলে আমি যথার্থই সুখী হই।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি আপনাকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে নিষেধ করি না—সাহিত্য ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহ বড় আবশ্যক। সঞ্জীবনীতে আপনি আমার পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াও আমি দুঃখিত হই

নাই। আমি যথার্থই * * বাবুকে গালি দিয়াছি, পাছে আপনারা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—এই ভাবিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। আপনার সুধাময় পত্রপাঠে সে ব্যথা নিবৃত্ত হইয়াছে।

আমার কোন লেখা আপনি কখনও কোন লোকের কাছে নিন্দা করিয়াছেন, এ কথা আপনার পত্রে প্রথম জানিলাম, আগে জানিতাম না। অতএব সেরকম নিন্দার কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত হই নাই। আপনার লিখিত একটি প্রবন্ধে আমার নিন্দা দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যখন সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন সে প্রবন্ধের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আর ব্যথিত করিব না।

লোকের কাছে মুখে মুখে সমালোচনার কথা যখন উঠিল, তখন আমার একটা সামান্য মত প্রকাশ করি। আমার বোধ হয় যে, আমাদের পরস্পরের গ্রন্থ শুধু ছাপায় সমালোচিত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে চিঠিতে সমালোচিত হওয়া ভাল। বন্ধুর গ্রন্থ সম্বন্ধে বন্ধুকে মত জানাইতে হইলে যে শুধু প্রশংসাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরং বন্ধুভাবে বন্ধুকে মত জানাইতে বন্ধুর লেখার দোষগুলির প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকা সম্ভব এবং উচিত। লেখার গুণ এবং দোষ, এ দু'য়ের মধ্যে গুণ জানা খুব আবশ্যক,—কিন্তু দোষ জানা তদপেক্ষা বেশী আবশ্যক। ছাপার সমালোচনায় কি গুণ, কি দোষ, কিছুই ভাল করিয়া বুঝান হয় না, অথচ দোষগুলি অতি অযথা প্রণালীতে গাহিয়া দেওয়া হয়, প্রায়ই রূক্ষ এবং অভদ্র ভাষায় বলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে যাঁহার দোষের উল্লেখ করা হয়, তাঁহার দোষগুলি হয় দোষ বলিয়া মনে হয় না, নয় সমালোচনার ব্যবহার দেখিয়া

তাঁহার কথিত দোষগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিয়া তাহার সংশোধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুভাবে চিঠিতে সমালোচনা হইলে এ সকল কুফল ফলে না। কারণ, সেরকম সমালোচনা প্রথমতঃ যত্নসহকারে করিতে হয়, অতএব সমালোচনা বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সে সমালোচনা ভদ্রভাবে এবং সহানুভূতির সহিত লিখিত হওয়ায়, যাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা তাঁহারও তাহাতে আস্থা হয়, এবং সমালোচনা ঠিক বোধ হইলে তদনুসারে নিজের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্তি, যত্ন এবং চেষ্টা হয়। এবং এই প্রণালীতে সমালোচনা করিতে করিতে আমাদের সাহিত্যের, বিশেষত সমালোচনা-সাহিত্যের (Critical literature-এর) ভাবভঙ্গী ভদ্রোচিত এবং সম্মানার্হ হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি দেখিয়া বড় দুঃখিত যে, আমাদের মধ্যে এই প্রণালীর সমালোচনার জন্য কাহারও বড় একটা স্পৃহা নাই। আমাদের মধ্যে বন্ধু বন্ধুকে বই উপহার দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মতের বা সমালোচনার কামনা করেন না। বোধহয় কেবল প্রশংসার তৃষ্ণা প্রবল বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে প্রধান লেখকেরা সমালোচনাকে বেশী ভয় করেন। আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, আমরা বড়ই অপদার্থ। কিন্তু আমি যে প্রণালীর সমালোচনার কথা লিখিলাম, সে প্রণালী প্রচলিত হইলে সমালোচনাটা ক্রমে গা-সওয়া হয় না? এবং মোটের উপর আমাদের খুব উপকার হয় না? বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে প্রকৃত literary correspondence নাই বলিয়া আমার বোধ হয়।

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

(২)

কলিকাতা,
৯ অক্টোবর, ১৮৮৪।

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্কিম বাবুর আধুনিক গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে আপনি আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ বলিতেছি।

* * * * *

তারপর দেবী চৌধুরাণীর কথা। দেবীর সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আপনাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যেন আপনি একটু ভুল বুঝিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন—দেবী চৌধুরাণী কেমন করিয়া ডাকাইত হইল, কেমন করিয়া ডাকাইতি করিল?—কিন্তু দেবী চৌধুরাণী ত ডাকাইতি করে নাই। ডাকাইতের সঙ্গে ঘুরিত ফিরিত বটে, কিন্তু কখনও ডাকাইতি করে নাই। ডাকাইতের দলকে উৎসাহিত, চমকিত এবং আবদ্ধ রাখিবার জন্য ভবানী পাঠক দেবীকে রাণী সাজাইয়াছিল, কিন্তু দেবী ডাকাইতি করিত না। তবে দেবী ডাকাইতের দলের রাণীগিরি করিয়া, স্বয়ং ডাকাইতি না করিলেও ডাকাইতিকে প্রশ্রয় দিয়াছে, এরূপ তর্ক করা যাইতে পারে। কিন্তু গোড়ায় ভবানী পাঠক দেবীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে তাহার ডাকাইতি, ডাকাইতি নয়—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন মাত্র। দেবী তখন সেই

কথা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিল। এরূপ বুঝা নিতান্ত অসম্ভব, অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। অতএব দেবীর ডাকাইতের দলে থাকা বড় একটা বিচিত্র নয়। কিন্তু ডাকাইতের দলে থাকা দোষের নয়, এরূপ বুঝিয়াও দেবী স্বয়ং ডাকাইতি করে নাই, করিতে পারে নাই। ইহাতে নারীচরিত্রের সঙ্গতিই রক্ষিত হইয়াছে, অসঙ্গতি ঘটে নাই। ডাকাইতের দলে থাকিয়া দেবী তাহার দৈব-লব্ধ প্রভূত অর্থ গরিব দুঃখীকে দান করিয়া বেড়াইত। ইহাও স্ত্রী-স্বভাবসঙ্গত। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি দুই একটি স্ত্রীলোক স্বামীর বিষয় পাইয়া তাহা গরিব দুঃখীকে দিয়া কাঙ্গালিনী হইয়াছে। তারপর রাণীগিরি করা। সেটা কিন্তু তাহার মনোগত নয়। গল্পটি পড়িলে এ কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দেবীর রাণীগিরি করা তাহার মনোগত নয়, কেবল ভবানী পাঠকের অনুরোধে তাহা করিত। ভবানী পাঠকের প্রয়োজন সাধন হইয়া গেলেই রাণীগিরি ছাড়িয়া কাঙ্গালিনী সাজিত। ভবানী পাঠক তাহাকে বড় বিপদ হইতে রক্ষা করে, তাহাকে অনেক যত্নে শিক্ষা দান করে, তাহাকে বড়ই ভালবাসে এবং ভক্তি করে। সেও ভবানীকে পরম গুরু বলিয়া ভক্তি করে। অতএব ভবানী পাঠকের অনুরোধে তাহার এক আধবার রাণীগিরি করা বড় একটা অসঙ্গত কাজ নয়। অতএব দেবীকে আমি এমন কোন কাজ করিতে দেখি নাই, যাহার মূল তাহার "ভিতর" নাই, অথবা যাহা স্ত্রী-চরিত্রের সহিত সঙ্গত হয় না। দেবীর মাতৃ-গৃহ ত্যাগ হইতে শ্বশুরগৃহে পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার জীবনপ্রণালীটা (Mode of life) অবশ্যই কতকটা masculine-রকম বোধ হয়। অত স্বাধীন ও সাহসিক ভাব পুরুষকেই সাজে, বাঙ্গালি স্ত্রী-কে সাজে না। কিন্তু প্রথম কথা এই যে,

দেবী জীবনের চিত্র নয়, আদর্শ চিত্র ; এবং সেই জন্য কবি দেবী-চরিত্রে এমন মশলা সংযোগ করিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালি মেয়ের চরিত্রে থাকিলে ভাল হয়। একজন ইউরোপীয় স্ত্রী দেবীর মতন জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিলে বোধহয় তাহাতেও স্ত্রী-চরিত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অর্থাৎ দেবীতে যে উপকরণ কবি যোগ করিয়াছেন, সে উপকরণ ইউরোপীয় স্ত্রী-চরিত্রে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই উপকরণ স্ত্রী-চরিত্রের একেবারে অনুপ-যোগী নয়। তাই, কবি বাঙ্গালি মেয়ের চরিত্রে সে উপকরণ থাকা স্পৃহনায় বিবেচনা করিয়া দেবীর চরিত্রে সে উপকরণ সংযোগ করিয়াছেন। আনন্দ মঠের শান্তিতেও এরূপ করা হইয়াছে। অতএব আমার মতে, দেবীকে কবির ideal বা আদর্শ চরিত্র বলিয়া ধরিলে, দেবীর জীবনাংশটা বড় একটা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সেই জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে আমি ইহাও বলি যে, সেরূপ জীবনপ্রণালী সাধারণত বাঙ্গালির মেয়ের পক্ষে অসম্ভব বা অসঙ্গত হইলেও, সকল বাঙ্গালির মেয়ের পক্ষে অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। রাণী ভবানীর কথা আমরা যেরূপ শুনিয়া থাকি, তাহাতে বোধ হয় যে রাণী ভবানীও আবশ্যক হইলে দেবীর জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যখন প্রফুল্লকে প্রথম দেখি, তখনও তাহাতে এমনি সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভর-শক্তির লক্ষণ দেখিতে পাই যে, তাহার পরে যখন তাহাকে ডাকাইতের দলে থাকিয়া প্রভুত্ব করিতে দেখি, তখন কিছুমাত্র বিস্মিত হই না। তখন যথার্থই বোধ হয়, এরূপ অবস্থায় সেই প্রফুল্ল যে এই দেবীরাণী হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়। অতএব দেবীতে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত বা হঠাৎ

আরোপিত হইয়াছে, অথবা তাহার গোড়ার চরিত্রের সহিত অসঙ্গত হইতেছে, এমন কিছুই আমি দেখিতে পাই না।

তথাপি আমি বলি যে বঙ্কিমের আগেকার উপন্যাস আমাকে যত ভাল লাগিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী তত ভাল লাগে নাই। তাহার কারণ দেবী চৌধুরাণীতে theory-র অবতারণা। দেবী অনেক সাহসের, অনেক বুদ্ধির, অনেক দয়ার কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু কবি যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ভবানী পাঠকের শিক্ষার গুণে দেবী সে সব কাজ করিয়াছিল, তাহাই কি ঠিক? সে শিক্ষা না পাইলে দেবী কি সে সব কাজ করিতে পারিত না? আমাকে বেশ পরিষ্কার বোধ হয় যে, দেবী এমন কোন কার্য্য করে নাই—যাহা করিবার জন্য তাহার বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আমি গল্পের গোড়াতেই দেবীতে যে সকল মশলা দেখিতে পাই, সে সকল মশলার গুণে দেবীকৃত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়, বিশেষ শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। শিক্ষার কথাটা এত করিয়া লিখিবার ফল এই হইয়াছে যে, দেবী যা কিছু করিতেছে তাই যেন সেই শিক্ষার গুণে করিতেছে, তাই যেন সেই শিক্ষার demonstration মাত্র, এরূপ মনে হয়। দেবী রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কোন পক্ষে একটিও মানুষ মরে নাই, একটিও মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই? অমনি মনে হইতেছে যেন দেবী সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কসামাজা theory বজায় রাখিতেছে। অনেক স্থলে এইরকম মনে হয়। দেবীকে শিক্ষার অধীন না করিলে, এবং কথায় কথায় নিষ্কাম ধর্ম্মের নিক্তি তুলিয়া না ধরিলে, দেবীর কোনও কার্য্যের বিবরণ পড়িয়া ক্ষুন্ন হইতে হইত না—কোনও কার্য্যই unspontaneous বলিয়া বোধ

হইত না। দেবীর সকল কার্য্যই তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ এবং সেই-জন্য বড়ই প্রীতিকর। কেবল এক শিক্ষার কথা এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের ধুয়া তুলিবার দরুণ, সেই সকল চমৎকার কার্য্যের বিবরণ অনেকাংশে পূর্ণানন্দ প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কোন কার্য্যই আমার অসঙ্গত, অস্বাভাবিক বা অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। আমার বোধহয় যদি ভবানী পাঠকের শিক্ষাপ্রণালীর উল্লেখমাত্র না থাকিত, এবং গল্পের মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম্ম এই শব্দ পর্য্যন্তও ব্যবহৃত না হইত, তাহা হইলে দেবী চৌধুরাণী শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, মনুষ্যের সাহিত্যের একখানি চমৎকার রত্ন হইয়া থাকিত। গল্পের তবে তাৎপর্য্য উৎসর্গপত্রে ইঙ্গিতে লক্ষিত হইলেই বেশ সুন্দর হইত।

সীতারামে আমি এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে আমার আরো অনেক আছে। দরকার হয় পরে বলিব। ইতি

বিনীত
(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

পত্র।

—:*:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর

কল্যানীয়েষু।

আমার শেষ চিঠি পড়ে, তুমি চম্‌কে না যাও, চমৎকৃত যে হয়েছ, সে কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি নে। পত্রখানি যে আগাগোড়া পড়্‌তে পেরেছ, এই আমার সৌভাগ্য। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ—ইউক্লিড পরমতত্ত্ব নয়, চরম আর্ট—একথা বলে আমি কি বল্‌তে চেয়েছি? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর—যা বল্‌তে চেয়েছি, তা ঐ পত্রের ভিতরেই আছে। মনে ভাব্‌তে পার, এ উত্তর হচ্ছে—চালাকি করে ও প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আসলে কিন্তু তা নয়। লেখক কি সব সময়ে জানেন যে তিনি কি বল্‌তে চান? কলমের মুখ দিয়ে যে অনেক সময় এমন সব কথা বেরিয়ে যায়, যা বল্‌বার লেখকের কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না,—তা লেখকমাত্রেই জানেন। লিখ্‌তে বস্‌লেই দেখা যায়, কথায় কথা টানে, ভাব ভাবের পিছনে ছোটে, তারপর লেখা আপনা হতেই তার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। সুতরাং সে মূর্ত্তির যদি কোনও মাথামুণ্ডু না থাকে, ত সে কলমের দোষ, লেখকের নয়। কবিকঙ্কন ভারতচন্দ্র প্রভৃতি যে বলেন যে সরস্বতী তাঁদের মুখে বাণী দিয়েছেন, সে কথা আমি বিশ্বাস করি। আমরা যাঁদের কবি বলি, তাঁদের মন যে ভাবসাগরে চিরদিন পাল খাটিয়ে অকূলের দিকে চলে, এ কথা যে না জানে, সে কাব্য কাকে বলে তা

জানে না। তবে অ-কবি আমরা, অবশ্য চিরদিন গুণ টেনেই চলি,—অর্থাৎ মাটির আশ্রয় ত্যাগ কর্‌বার আমাদের সাহসও নেই, শক্তিও নেই। ভাবের যাত্রা নিরাপদে সাঙ্গ করবার জন্য আমাদের মত সাহিত্যিকদের পক্ষে, নিরেট বস্তুজগতের উপর পা রেখে লজিকের সিধে পথ ধরে চলা ছাড়া আর উপায় নেই। সুতরাং আমি এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে, আমার গেল চিঠিতে আর যাই থাক্—কোনও প্রকাণ্ড সত্য নেই। তবে কি ওটি একটি প্রকাণ্ড রসিকতা?—তাও নয়, কেননা রসিকতা কখন প্রকাণ্ড হয় না। ইংরেজরাও জানেন যে 'Brevity is the soul of wit. ও একটা খামখেয়ালি লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর ভিতর যদি কিছু থাকে ত,—মানুষের মন লজিকের পথ ছেড়ে দিলে কি ভাবে চলে, তারই পরিচয়। যদি বল লজিকের ধ্রুবপদ ছেড়ে খেয়ালের বেচাল ধরবার প্রয়োজন কি? তার উত্তর—গুণটানার দাসত্ব হতে অব্যাহতি লাভ কর্‌বার লোভ সকলের-ই মাঝে মাঝে হয়।

আমি জানি, এ কথার জবাব তুমি কি দেবে। তুমি বল্‌বে, ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনে, আইডিয়া নিয়ে খেলা করাটা কি সঙ্গত?—তোমরা যে আজকাল সব কাজেরই হাতে হাতে ফল পেতে চাও, সে কথা কে না জানে। এ ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, কেননা আমাদের কোন কাজেরই ফল ফলে না। যাদের সুমুখে সময় ঢের আছে তারা মেওয়া ফলাতে চেষ্টা করুক—কিন্তু আমাদের বয়েসের লোকের সবুর সয় না, আর তা'তে করে শুধু মেজাজ বিগড়ে যায়। এ অবস্থায় মনের কথা লিখ্‌তে গেলেই তা মেজাজি লেখা হয়ে উঠ্‌বে। আর আমার মতে মেজাজি লেখার চাইতে খেয়ালি লেখা ঢের ভাল, কেননা ঢের বেশি নিরাপদ। যে লেখার মাথা-মুণ্ডু নেই—তার মুণ্ডুপাত কেউ

কর্‌তে পার্‌বেন না, অতএব তার বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্রধারণ কর্‌বেন না। অপর কিছু লিখ্‌তে গেলেই কলমধারীদের সঙ্গে আমার কাজিয়া বাধে। কেউ ডান গালে চাঁটি মারলে, বাঁ গালটি যে অমনি বাঁয়া করে দিতে হবে, এ মন্ত্রে আমি দীক্ষিত হই নি। আমাদের দেশে যাঁরা লেখনী ধারণ করেন, তাঁরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই লেখক না হয়ে সমালোচক হতেই ব্যস্ত। সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ে বলে, প্রদীপ দিয়ে ঘর আলো করাই সঙ্গত, চালে আগুন লাগিয়ে দেওয়া অসঙ্গত। সেকালের জনসাধারণ যে কথাটা জান্‌ত, একালের শিক্ষিত সমাজ তা ভুলে না গেলে, মনের প্রদীপের আমরা এর চাইতে সদ্ব্যবহার কর্‌তে পার্‌তুম। অমরা যে তা করিনে, তার কারণ—আমরা আলোর চাইতে আগুনকে চিনি বেশি। ফলে, যে কথায় মনে আলো ফেলে, তার চাইতে যে কথায় বুকে আগুন জ্বলে, এদেশে তার বাজার-দর ঢের বেশি। কাজেই বাজে কথা বক্‌তে হয়।

তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক্‌ যে, আমাদের পক্ষে এখন প্রধান দরকার হচ্ছে—প্রাণের তেজ বাড়ানো। আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উত্তাপটা যে এখন subnormal—একথা আমিও অস্বীকার করি নে। তবে আলোর ভিতরে যে আগুন নেই, এ সত্য কোন্ হাতে ধরা পড়েছে? রক্তমাংসের হাতে ত নয়ই। রসিকতাকে পাঁচজনে এত নীচু নজরে দেখে কেন? লোকের বিশ্বাস হাসির আলোর গায়ে চমক আছে, কিন্তু তার অন্তরে কোনও শক্তি নেই; অর্থাৎ বিদ্যুতের অন্তরে বজ্র নেই। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে তাঁদেরি মত, যাঁরা যে বস্তু স্পর্শ কর্‌তে পারেন না তার গুণাগুণ মানেন না, কেননা জানেন না। আলোর দোষই-এই যে, ও বস্তু মানুষের করতলগত

হয় না। তারপর রসিকতা ছেড়ে যদি সত্যকথা বল, তাতেও রক্ষে নেই। অমনি লোকে বল্‌তে সুরু করবে যে, সে কথা অপ্রিয়, এবং অপ্রিয় সত্য বলা শাস্ত্রে নিষেধ। এ নিষেধ আমিও মান্য করি। তবে সত্যের খাতিরে আমি বল্‌তে বাধ্য যে, সত্য প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়—তা শুধু সত্য। সত্যের প্রিয়তা অপ্রিয়তা নির্ভর করে শ্রোতার উপরে। যা একজনের কাছে প্রিয়, তা আর একজনের কাছে অতিশয় অপ্রিয় হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। একালে যে কথা আমাদের জাতের আত্ম-গরিমা না বাড়ায়, সকলেই জানে যে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়,—হো'ক না সে কথা ষোল-আনা সত্য। কিন্তু সেকালে ভারতবর্ষে আর্য্য নামক এক জাত ছিল—যাদের প্রকৃতি ছিল ঠিক আমাদের উল্টো। ভাসের নাটকে পড়েছি যে, উত্তরগোগৃহে শত্রুর দল রণে ভঙ্গ দেবার পর, রাজকুমার উত্তর ঘরে এসে শুন্‌লেন যে, দূতমুখে বিরাট-রাজের কাছে এই সংবাদ পৌঁচেছে যে, তাঁর বীরত্বেই সে যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে। ব্যাপার হয়েছিল অন্য-রূপ। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন বৃহন্নলা, আর উত্তর শুধু রথের মধ্যে সাক্ষী-গোপাল হয়ে বসেছিলেন। উত্তর এই মিথ্যা-প্রশংসায় হৃষ্ট হওয়া দূরে থাক্‌, অতিশয় রুস্ট হয়ে বিরাট-রাজের কাছে বলেন যে, এই মিথ্যা-খ্যাতি বিষের মত তার দেহ-মনকে দগ্ধ করছে; কেননা যে সত্যসন্ধ, মিথ্যা-প্রশংসা তার কাছে যেমন অগ্রাহ্য, তেমনি অসহ্য। এই কথায় উত্তর যে মনোভাব প্রকাশ করেন, সে মনোভাব যে আর্য্য, তার পরিচয় আমরা ঐ একই নাটকে, দ্রোণের মুখেও পাই। দ্রোণ শকুনীকে বলেন যে, সত্যের অপলাপ করা গান্ধার দেশের লোকের ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু আর্য্যের নয়। সে যাই হো'ক, একালের সাহিত্যে

রসিকতার চাইতে সত্যকথা যে বেশি অচল—সে কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই।

সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যই অবশ্য সমালোচকদের কাছে লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হয়ে এসেছে। সামাজিক মনের সাহিত্য-বিদ্বেষের একটা টাট্‌কা উদাহরণ নেওয়া যাক্।—তুমি সম্ভবত জান যে, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে দু'দল লেখকের আবির্ভাব হয়। একটি ছিল আর্টের দল, আর একটি বিজ্ঞানের দল। Realist-রা বল্‌তেন যে, সাহিত্যের কর্ত্তব্য, সত্য কথা বলা; আর Parnassian-রা বল্‌তেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সুন্দর কথা বলা। এ দু-দলের ভিতর অবশ্য যথেষ্ট দলাদলি ছিল, এবং পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে যথেষ্ট মিথ্যা কথা আর যথেষ্ট কদর্য্য কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচকদের হাতে এ দু-দলই সমান মার খেয়েছেন। তাঁরা আর্টের দলকে বল্‌তেন—তোমাদের লেখায় সত্য নেই; আর বিজ্ঞানের দলকে বল্‌তেন—তোমাদের লেখায় সৌন্দর্য্য নেই। সমালোচকেরা অবশ্য সত্যের জন্য কিম্বা সৌন্দর্য্যের জন্য থোড়াই কেয়ার কর্‌তেন—লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁদের আসল অভি-যোগ ছিল এই যে, তাঁদের কলমের মুখ দিয়ে যা বার হয় তা কাজের কথা নয়। সত্য জেনেই বা কি হবে, আর রূপ দেখেই বা কি হবে,—সমাজ চায় সেই কথা—যা জীবনের হাটে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়, যা পরিবার নামক ছোট ঘরকর্‌না, আর সমাজ নামক বড় ঘরকর্‌না, দুয়েরই সমান কাজে লাগে। মানুষের মনের জীবন তার কাজের জীব-নের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও যে তার অধীন নয়—এ কথা জনসাধারণ মানে না; কেননা কাজ সকলেরই আছে, কিন্তু মন সকলের নেই।

কর্ম্ম ও জ্ঞান, এ দুই বিচ্ছিন্ন না হলেও যে বিভিন্ন, এ কথা ইউ-

য়োপেও লুকোনো নেই। সুতরাং সাহিত্যিকরা যখন সমাজকে সম্বোধন করে বল্‌লেন যে,—তোমাদের ঘরকর্‌না তোমরা চালাও, আমরা তার তেল-নুন-লক্‌ড়ি যোগাতে পার্‌ব না; তখন সমাজ উত্তর কর্‌লে যে, আমরা তোমাদের আমাদের বাজার-সরকারি কর্‌তে বল্‌ছি নে, আমাদের হয় হাসাও নয় কাঁদাও। তা'তে বিজ্ঞান ও আর্ট একজোট হয়ে সমস্বরে বল্‌লে আমাদের "বয়ে গেছে।" বিজ্ঞানের দল বল্‌লেন,—আমরা তোমাদের চোখের সুমুখে এমন আলো ধরে দেব, যাতে করে যা সুন্দর তাও কুৎসিত দেখাবে; আর আর্টের দল বল্‌লেন, আমরা রেখা ও বর্ণের এমনি বিন্যাস কর্‌ব যে, তাতে করে যা কুৎসিত তাও সুন্দর দেখাবে। সমাজ প্রতিকুল না হলে, লেখকেরা এতটা গোঁয়ার হয়ে উঠতেন না, এবং Zolaও সরস্বতীর মন্দিরকে ব্যাধি মন্দির করতেন না, এবং Gautierও তাকে চিত্রশালায় ভর্ত্তি কর্‌তেন না। তবে এঁদের একটা কথা খুবই সত্য; সে হচ্ছে এই যে, হাসি-কান্নার বাইরে না গেলে, কি সত্য কি সুন্দর ও দুয়ের কোনটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সত্য ও সুন্দরের চর্চ্চাও হচ্ছে একরকমের যোগসাধনা।

যে কথা Leconte-de-Lisle এবং Flaubert-এর মুখে শোভা পায়, সে কথা অবশ্য আমাদের মত লেখকের উচ্চারণ করবারও অধিকার নেই। পাঠকসমাজ যদি আমাদের কাছে হাসি-কান্না চান, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই। ফরমায়েস কর্‌লে আমি অন্তত ওর প্রথম ভাগটা কায়ক্লেশে যোগাতে পারি। কিন্তু পাঠকসমাজ হাসি ভালবাসে না, তারা চায় শুধু কাঁদ্‌তে; অথচ চোখের জলে কলম ডুবিয়ে আমি লিখ্‌লে তাতে হরফ ফোটে না। এইজন্যই ত

এত বাজে বকি, এবং যে-ইউক্লিডের আমি কোনও ধার ধারি নে, তারই গুণ গাই। আমার মাল বাজারে না কাটুক, তাতে কোনও ক্ষতি নেই—দুঃখের বিষয় এই যে, দেশে আজকাল সাহিত্য কেউ চায় না। সমাজ চায় সেই পলিটিক্স্, যাতে তার ক্রোধ ও মদ বাড়ে,—সেই ইক্-নমিক্স্, যাতে তার লোভ ও মাৎসর্য্য বাড়ে,—সেই দর্শন, যাতে তার মোহ বাড়ায়—আর সেই গল্প ও সেই কবিতা, যাতে তার কামনা বাড়ায়—এবং সে কামনা নিষ্ফল হলে, হা-হুতাশ করতে শেখায়। বলা বাহুল্য ষড়-রিপুর কোনটিকেই বাড়ানো সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়—সাহিত্যের একমাত্র কর্ম্ম হচ্ছে আত্মাকে বাড়ানো। এ কথা যে না বোঝে, তাকে তর্ক-যুক্তির সাহায্যে বোঝান অসম্ভব; কেননা আত্মা-বস্তুকে জানা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। যা সকলের ভিতর আছে, তা সকল থেকে ছাড়িয়ে কি করে আলাদা করে দেখানো যেতে পারে?—তুমি বলবে এ সব হচ্ছে mysticism-এর বুলি। অবশ্য তাই;—যে লেখার ভিতর mystery নেই, তা কি কখন সাহিত্য হতে পারে?—Mysticism-এর বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই; তবে উপনিষদের "অতিবাদ" শব্দ বোধহয় ঐ জিনিসকেই বোঝায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে যে, যে ব্যক্তি প্রাণতত্ত্ব দর্শন করেন, মনন করেন, এবং তা যে সর্ব্বের অতিরিক্ত এইরূপ নিশ্চয় করেন, তিনিই অতিবাদী হন। এবং এই সূত্রে সনৎকুমার উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ বলে তুমি অতিবাদী—তাহলে উত্তরে বলবে—হাঁ আমি অতিবাদী; নিজের অতিবাদিত্ব স্বীকার করবে, কখন গোপন করবে না। সুতরাং mysticism-কে প্রত্যাখ্যান করবার আমাদের কোনও দায় নেই। এ সত্য কি সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে যে, যার অন্তরে দর্শন নেই, তা কাব্য

নয়; আর যার অন্তরে অস্তির ধারণা নেই, তা দর্শন নয়। সে যাই হোক্, পৃথিবীর যে-কোন ভাষার যে-কোন কাব্য নিয়ে তাকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখাও ত, তার কবিত্ব কোন্ উপাদানের মধ্যে নিহিত?—যদি তুমি তা পার, তাহলে তুমি মানুষের দেহকে dissect করেও হাতে ধরে দেখিয়ে দিতে পার তার প্রাণ কোথায়। যার ভিতর রহস্য নেই, তার ভিতর আনন্দও নেই; আর যার ভিতর আনন্দ নেই—তার ভিতর সত্যও নেই, সৌন্দর্য্যও নেই। মানুষে আনন্দের অধিকারী বলেই কাব্য ও কলার সৃষ্টি করেছে।

যারা কথা নিয়ে কারবার করে তারাই জানে, ও হচ্ছে একরকম আগুন নিয়ে খেলা করা। কথার শক্তি অসীম, এবং সে শক্তি যেমন প্রাণ-বর্দ্ধক তেমনি মারাত্মক। কথায় আত্মাকে যেমন জাগিয়ে তোলে, তেমনি আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মানুষে একটা কথার মত কথা পেলে তাই আঁকড়ে ধরে জীবন যাপন করে,—সে কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাটা তারা আর আবশ্যক মনে করে না। সাহিত্যের উপর সমাজের রাগই এই যে, সাহিত্য নতুন কথা বলে, আর না হয়ত পুরোণো কথার নতুন অর্থ বার করে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ "আনন্দ" শব্দটি মানুষের মুখে সহজেই একটা বুলি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ দেশে সে ভয় বিশেষ আছে। বড় বড় কথাকে অর্থহীন বুলিতে পরিণত করতে আমরা সিদ্ধহস্ত। অতএব আনন্দ শব্দের মর্ম্ম আমি কি বুঝি, তা তোমাকে বলছি।

আনন্দ অর্থ আমোদ নয়, আরাম নয়, এমন কি সুখও নয়। আনন্দ মনের শান্তি ভঙ্গ করে। সেই কারণে যাঁরা মানুষকে আনন্দের বারতা শুনিয়েছেন, তাঁরাই পৃথিবীতে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করেছেন।

যীশুখৃষ্ট স্পষ্টই বলেছেন যে "আমি তোমাদের শান্তি দিতে আসি নি, দিতে এসেছি অসি"। শ্রীকৃষ্ণ অসি নিয়ে আসেন নি, এসেছিলেন বাঁশি নিয়ে। কিন্তু সে বাঁশি যে কি গোল ঘটিয়েছিল, তা সকলেই জানেন। সে বাঁশির ডাকে যমুনা যে উজান বয়েছিল—সে আনন্দে, সুখে নয়। যার প্রতি অণু পরমাণুকে উজান ঠেলে যেতে হয়, তার সুখই বা কোথায়, আর সোয়াস্তিই বা কোথায়? সাহিত্যের অসিই বল আর বাঁশিই বল—দুয়েরই কাজ হচ্ছে সকল মনের শান্তি ভেঙে দেওয়া। কেননা কাব্য চায় মানুষকে আনন্দ দিতে, আর কবি জানে যে শান্তি হচ্ছে সীমার ধর্ম্ম—আনন্দ অসীমের। এই সীমা অতিক্রম কর্‌বার শক্তিপ্রয়োগে আনন্দের জন্ম, এবং সেই শক্তির বৃদ্ধিতেই আনন্দের স্ফূর্ত্তি। মানুষ ঘর ছাড়্‌তে চায় না, আর সাহিত্য তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এই জন্যেই ত সাহিত্যের উপর সমাজের এত আক্রোশ, এত অত্যাচার। অতএব প্রতিদেশে প্রতিযুগে সাহিত্যের কথা সামাজিক sedition হিসাবে গণ্য। সুতরাং আমরা যদি সাহিত্য রচনা না করে বাজে বকি, তাতে আমাদের বুদ্ধির দোষ দিতে পার না।

এ কথা শুনে তুমি হেসে বল্‌বে যে, আমি যখন কবি নই—তার্কিক, তখন আমার ভয় কি?—এ কথা আমি মানি যে, আমি কাউকে আনন্দ দিতে পারি নে বলে অনেককে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু বিচার করাও যে সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়—বৌদ্ধ শাস্ত্র হতে তার প্রমাণ দিচ্ছি। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস জান, অতএব তোমাকে বলা বাহুল্য যে King Menander ছিলেন বহ্লিকের গ্রীক ভূপতি, এবং তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ভিক্ষু নাগসেন ছিলেন তাঁর দীক্ষা-গুরু। নাগসেনের সঙ্গে Menander-এর প্রথম সাক্ষাতে কি কথোপকথন

হয়েছিল, "মিলিন্দ পঞ্‌হো" থেকে এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

রাজা বলিলেন, "ভদন্ত নাগসেন, আমার সহিত আপনি আলাপ করিবেন কি ?"

—মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, আমি আলাপ করিব। আর যদি রাজাগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, মহারাজ তবে আমি আলাপ করিব না।

—ভদন্ত নাগসেন, পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?

—মহারাজ, পণ্ডিতগণের বিচারে (বাদী ও প্রতিবাদীর দুরবগাহ প্রশ্নরূপ) আবেষ্টনও করা হয়, এবং (তাহার যথোচিত উত্তররূপ) নিরাবরণও করা হয়; কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হয়, এবং তদ্বিরুদ্ধ বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত হয়। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা কোপ করেন না। মহারাজ, পণ্ডিতেরা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন।

—আর রাজারা কি প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?

—মহারাজ, রাজারা আলাপে কোন একটি বস্তুর প্রতিজ্ঞা করিয়া লন। যদি কেহ ঐ বস্তুকে প্রতিকুল ভাবে প্রতিপাদন করে, তবে তাঁহারা ইহাকে দণ্ড দাও বলিয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। মহারাজ, রাজারা এই প্রকারে আলাপ করেন।

এ কথা যে সত্য, তা একালেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; আর এ কথা কে না জানে যে, একালে সাহিত্য-সমাজের রাজাগণ হচ্ছেন জনসাধারণ,—ইংরাজিতে যাকে বলে public। সুতরাং স্বয়ং নাগসেন যখন রাজার সঙ্গে বিচার করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, তখন আমি যে

public-মহারাজার সঙ্গে বিচার কর্‌তে কুণ্ঠিত হব, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

নাগসেন অবশ্য অবশেষে মহারাজ মিলিন্দের সঙ্গে বহু বিচার করেন, তার কারণ তাঁর শেষ কথার উত্তরে মহারাজ বলেন :—

"ভদন্ত নাগসেন, আমি পণ্ডিত-বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করিব, রাজবিচার অবলম্বন করিব না। ভদন্ত, আপনি বিশ্বস্ত হইয়া আমার সহিত আলাপ করুন। আপনি যেমন ভিক্ষু সামণের (নব শিষ্য) উপাসক বা পরিচারকের সহিত আলাপ করেন, সেইরূপ বিশ্বস্ত হইয়া আলাপ করুন, আপনি ভয় করিবেন না।"

এ হেন অভয় পাঠকসমাজ আমাকে কখনই দেবেন না ;—কেননা Menander মহারাজা হলেও গ্রীক, আর আমাদের জনসাধারণ আর যাই হ'ন, গ্রীক নন। এ ক্ষেত্রে বাজে বকা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ?

২০শে জুলাই, ১৯১৮ খৃঃ

বীরবল।

সাহিত্যের জাতরক্ষা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

—:*:—

যিনি বলেন যে বহুদিন হ'ল আমরা সমুদ্র যাত্রা করি নি, আজই বা তা কর্‌তে যাব কেন? আর যিনি বলেন যে অতীতকালে আমাদের কবিরা রাধা-কৃষ্ণের গান লিখেছেন, আজই আমরা মহীন্ বা বিনো-'দিনীর মনের প্রাণের খোঁজ নেব কেন? এই দু' ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবিক পক্ষেই কোন প্রভেদ নেই। এই দু'জনের মধ্যেই রয়েছে একটা দীনতা। এই দীনতাতেই তাঁরা জাতীয়তা তথা 'পেট্রিয়টিজ্‌ম'-এর উজ্জ্বল রঙ চড়িয়ে বীরত্ব বলে' চালান করে দিতে চাচ্ছেন।

যাদের নিজের উপরে কোন ভরসাই নেই, তারাই পদে পদে পিছন ফিরে আপনার পথ ঠিক কর্‌তে চায়—আর যাদের বাস্তবিকই কিছু বল্‌বার নেই, তারাই আপনার কথা গুলোকে অতীতের ছাঁচে ঢালাই করে' তার একটা মূল্য বাড়িয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। এ যেন "কীটোপি সুমনোসঙ্গাৎ"—দেবতার মাথায় গিয়ে চড়ে' বস্‌বার চেষ্টা। এই হচ্ছে তাদের দীনতা।

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে, এমন লোকও থাক্‌তে পারেন, যাঁর বাস্তবিকই নিজস্ব কিছু বল্‌বার আছে। আর তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বল্‌বেন—আপনার ভাষায়, আপনার সুরে, আপনারই অন্তরের

রঙ্ ফলিয়ে। তাঁকে আমরা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব না। আর সেই না পারাটা অতি সুখের কথা।

কিন্তু ঐ যে দীনতা - ওদীনতা কিন্তু মানুষ কোন দিনই স্বীকার কর্‌বে না। অন্তত যে মানুষের বাঁচ্‌বার ক্ষমতা আছে সে—মানুষ। কারণ এই দীনতা যে মানুষ স্বীকার কর্‌বে সেই মানুষই প্রকৃত পক্ষে তার জাতীয়তার মূলে কুড়ুল মার্‌বে। কেননা এটা খুব স্পষ্ট কথা যে, একটা কোন জাতিকে মেরে ফেলে তার জাতীয়তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় না। আর একটা জাতিকে বাস্তবিক মেরে ফেলা হবে, যদি সেই জাতির প্রত্যেক মানুষটা আপনাকে ঐ দীনতার সাবু-বার্লি দিয়ে পুষ্ট কর্‌তে থাকে।

একটা কথা কিন্তু মনে না লেগে যায় না। সেটা হচ্ছে এই যে, যাঁরা আজ বাঙ্‌লা-সাহিত্যে 'জাতীয়তা জাতীয়তা' বলে' খুব কলরব কর্‌ছেন, মনে হয় তাঁরা ভাবছেন যে বাঙালীর জাতীয়তাটা বুঝি তাঁদের কয়েক জনের মুঠোর মধ্যেই আছে। এইটে তাঁদের একটা মহাভুল। এই ভুলটাকে তাঁরা ভুল বলে' মনে কর্‌তে পার্‌ছেন না—নইলে তাঁদের কোলাহলটা অনেকটা নরম হ'য়ে আস্‌ত। আসল কথা এই যে, বাঙালীর জাতীয়তার হিসেবটা আমাদের কারও জামার পকেটে নেই—আছে সেটা এক বিশ্ব-বিধাতার মনের পটে।

কতকগুলো জিনিস আছে যার সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না, যেমন—ব্রহ্ম, কবিত্ব। তেমনি একটা জাতির জাতীয়তা যে কি, তারও সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না, কেননা জীবন জিনিসটা জ্যামিতি নয়, পাটিগণিতও নয়। কিন্তু ব্রহ্ম বা কবিত্বের সংজ্ঞা দেওয়া না গেলেও, ব্রহ্ম বা কবিত্ব যে কি নয় তা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে।

তেমনি একটা জাতির জাতীয়তার সংজ্ঞা নিরূপণ করা না গেলেও তার জাতীয়তা যে কি নয় তা বলা তত শক্ত নয়। সেই জন্য একথা আজ আমরা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে, বাঙালীর জাতীয়তা আর যাই হোক্‌ সেটা কেবল রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা বা বৈষ্ণব মহাজনের রসতত্ত্ব নয়। কেন নয়?—এ সম্বন্ধে যা মনে হয় তা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

(২)

জগতে যত ধর্ম্ম আছে তার মধ্যে আমরা, হিন্দুরা, কেবল আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সনাতনত্বের দাবী কর্‌তে পারি। কেন পারি তাও বল্‌ছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা উল্টো ধারণা আছে, সেইটে আগে বলে' নেব।

অনেকে মনে করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তার মানে হচ্ছে এই যে, অতীত কালের যা কিছু তাই চিরকালের সত্য। বেদে যে সব উপলব্ধি বা চিন্তার কথা আছে, যে সব ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ সেই যুগের মানুষেরা যে রকম অবস্থার মধ্যে যে-রকমে আপনার জীবনের সত্যকে, জগতের সত্যকে, ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের, জগতের, ভগবানের ও সত্যের সেই রূপই কেবল চিরন্তন সত্য। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তার অর্থ এ নয়। এর মানে যদি তাই হয়, তবে আমরা বাঙালীরা আজ কেউই হিন্দু নই। কারণ আমাদের চিন্তার রাজ্য আর বৈদিক যুগের মানুষের চিন্তার রাজ্যের মধ্যে তিন সাত্তা একুশ সমুদ্র ও তিন তেরং উনচল্লিশ নদীর ব্যবধান, আর আমাদের কর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক যুগের কর্ম্মের যে

মিল সেটা শুধু "কৃ" ধাতুর মিল, তবে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, যেমন বিবাহ পৈতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে এখনও সে যুগের ক্রিয়াদির একটু ছিঁটে ফোঁটা রকমের মিল আছে। তবে বলা বাহুল্য সবাই জানেন যে, সে মিলটা অত্যন্তই বাহিরের মিল—ভিতরের নয়। কেবল তাই নয়। আমাদের ধর্ম্মের সনাতনত্বের ঐ অর্থ অনুসারে আমাদের আর হিন্দু হবার কোন দিনই উপায় নেই। কারণ, যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন, একই কল্পযুগে বিশ্বমানবের জীবনে একই ভাব ঠিক অবিকল একই রকমে দু'বার আসে না—বিশ্বমানবের যে কোন অংশ সম্বন্ধেও সেই কথা।

কিন্তু ঐ যে বলেছি "কৃ" ধাতুর মিল—ঐ মিলটাই হচ্ছে আসল মিল। ঐটেই হচ্ছে সনাতনত্বের মূল—ঐ দিক থেকেই হিন্দু সনাতন। ঐ "কৃ" ধাতুর পিছনে হাজার যুগে হাজার প্রত্যয় লাগিয়ে হাজার ভঙ্গীতে মানুষ নাচ্‌বে কিন্তু "কৃ" সর্ব্বদাই "কৃ"। এই সত্যটাই প্রাচীন ঋষিরা দেখতে পেয়েছিলেন, আর অর্ব্বাচীন আমরা, দেখতে পাচ্ছি নে। সে যুগের তাঁরা বুঝেছিলেন যে, প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তন করা চল্‌তে পারে কিন্তু ঐ "কৃ" ধাতুকে ত্যাগ করবেন যিনি, তাঁর এ জগতে নিষ্কৃতি নেই। আর আজ আমাদের যে অবস্থা তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ "কৃ" ধাতুটাকে খাটো ক'রে আমরা প্রত্যয়-টাকে বাড়িয়ে তুলে মনে করেছি যে সেইটেই সনাতন।

তেমনি আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে চার হাজার বছর পূর্ব্বের আর্য্যদের ধর্ম্মের যে মিল সেটা হচ্ছে "কৃ" ধাতুর মিল—মনের মিল নয় কিম্বা অনুষ্ঠানের মিল নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন মনকেই সনাতন বলে' মনে করেন। কথাটা আমি বানিয়ে বল্‌ছি নে।

এর প্রমাণ এই যে, আজও প্রাচীন কালের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নাম করে' মাঝে মাঝে হা হুতাশ শুনতে পাওয়া যায় এবং তা প্রবর্ত্তন করবার ধুয়োও মধ্যে মধ্যে ওঠে। এঁরা গায়ের জোরেই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান। কিন্তু মনের জোর যে গায়ের জোরের চাইতে জেয়াদাই হ'য়ে থাকে, এটা সনাতন সত্য। প্রাচীন কালের মানুষেরা নিজ নিজ মন নিয়েই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে' গেছেন আর আমরাই বা কেন আমাদের নিজের মন নিয়ে আমাদের নিজের জীবন গঠন করব না—এ প্রশ্নটা যে কেন অনেকের মনে উদয় হয় না, সেটা আশ্চর্য্যই বলতে হবে—বিশেষত এই Self-determination-এর দিনে। Self-determination যে কেবল রাজনৈতিক জগতেই সুখ স্বাস্থ্য ও আনন্দের মূল তাই নয়—মানুষের অন্তরের জগতেও তাই। তবে এই রকমের মনের ভাবের কারণও যে নেই তা নয়। আমি আগেই বলেছি—সেটা হচ্ছে মানুষের দীনতা, তার নিজের উপর ভরসার অভাব। সেকালের সবাই ছিলেন এক একজন প্রকাণ্ড ঋষি আর একালের আমরা সবাই এক একজন দীন অকিঞ্চন! মানুষের এই ভাব মানুষকে কোন দিনই অমৃতের পথে নিয়ে যাবে না। এই ভাব মানুষের শক্তিকে কোন দিনই উদ্বুদ্ধ করবার সাহায্য করবে না। আর যে শক্তিহীন তার যে আত্মদর্শন লাভ ঘটে না—এ ত উপনিষদেরই কথা।

প্রাচীন কালের ঋষিরা মনকে সত্য বলে' জেনেছিলেন. কারণ তাঁরা মানুষের প্রকৃতি বলে' যে জিনিসটা আছে, তার রহস্য বুঝেছিলেন। প্রকৃতির ধর্ম্ম যে কি, তা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা মানুষের ধর্ম্মকে কোন "ক্রীড"-এর দ্বারা আবদ্ধ করেন নি—মানুষের ধর্ম্মকে

তাঁরা "রিলিজন" করে' তোলেন নি। 'রিলিজন' হচ্ছে ভগবানে পৌঁছবার পাকা সড়ক, আর ধর্ম্ম হচ্ছে আত্ম-সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার প্রকৃতির মেঠো রাস্তা। আর আত্ম-সাক্ষাৎ লাভ হলেই ভগবান দর্শন হয়। কেননা ভগবান যে মানুষকে তাঁর নিজের 'মডেলে' তৈরী করেছেন, সে-কথা বাইবেলেও বলে।

কিন্তু 'রিলিজন' ভগবানে পৌঁছিবার পাকা সড়ক হলেও যে সেটা সোজা রাস্তা এমন নয়—কেননা মনটা 'রিলিজনের' "ক্রীডে"র জালে জড়িয়ে পড়ে। ও অবস্থায় ভগবান ত দূরের কথা—মানুষ নিজেকেই দেখ্‌তে পায় না। মনের যা সত্য তা মনের মধ্যেই আছে—তা তার বাইরে নেই। বাইরের "ক্রীড" হয়ত মনের কাছে ঘোর মিথ্যা। আর মিথ্যার মধ্যে মানুষের দৃষ্টি খোলে না কোনদিন, বরং আরও ঘুলিয়ে যায়। আর ঘুলিয়ে-যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে নিজেকেও বোঝা যায় না—ভগবানকেও পাওয়া যায় না।

এই যে এক যুগের মানুষের মন আর এক যুগের মানুষের মনের সঙ্গে এক নয়, আবার এক যুগের মানুষের মধ্যেই একজনের প্রকৃতি আর একজনের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন—এই সত্যটা প্রাচীন ঋষিরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিলেন বলে' তাঁদের মধ্যে ধর্ম্ম বলে' যে জিনিসটা গড়ে উঠ্‌ল, সেটা কোন একজনের উপলব্ধ একটা সত্য নয়। আর সেই জন্যেই ক্রিশ্চিয়ান 'ক্যাথলিক' বা 'প্রটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্মে মেরী, খৃষ্ট বা বাইবেলের যে স্থান, মুসলমান ধর্ম্মে মহম্মদ বা কোরাণের যে স্থান, হিন্দুর ধর্ম্মে মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও ঠিক সেই স্থান নয়—বেদ বা কোন উপনিষদের বা গীতার ঠিক সেই স্থান নয়। সেইজন্যে হিন্দুর ধর্ম্মজগতে চিন্তার এত বিচিত্রতা—

সংস্কারকের এত সংখ্যা। এক দর্শনেরই ছ' ছ'টা শাখা—উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণ হাতের পায়ের আঙুল গুণেও সংখ্যা করা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্মে সকল প্রকার বিচিত্রতার স্থান আছে বলেই তা সনাতন। তার ধর্ম্মে মানুষের সকল প্রকার সত্যের জন্যেই সিংহাসন পাতা আছে—তাই তা সনাতন। তাই এ ধর্ম্মে প্রকৃতি অনুসারে কেউ ভগবানকে প্রেমময় রূপে পাচ্ছেন, কেউ বা শক্তিময় রূপে দেখ্‌ছেন—কারও আরাধ্য কৃষ্ণ, কারও আরাধ্য কালী। কারও জীবনে চরম সত্য বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল—নিরাকার আনন্দময় ব্রহ্মে, আবার কেউ দেখতে পেলেন সাকার ভগবান। এমন কি চার্ব্বাকও হিন্দু, কারণ চার্ব্বাকও মানুষের মনের একটা দিক, একটা অবস্থার প্রতিনিধি। তার স্থানও সনাতনের মধ্যেই—তার বাইরে নয়, অর্থাৎ এক কথায় সনাতন—সনাতন, কারণ তা সমস্তকেই আলিঙ্গন করে' আছে। আর ব্রহ্ম যে চরম সত্য তার কারণ হচ্ছে, ব্রহ্মে সকল সত্যের আরোপ করেও তাঁকে আনন্দময় রূপেই পাওয়া যায়।

এখন উপরের ঐ কথা যদি মানি তবে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যদি এমনি ব্যাপক, তার আধ্যাত্মিক জীবনের দিকটা যদি এমনি উদার, তবে সে হিন্দুর সামাজিক জীবন এমন সংকীর্ণ কেন? তবে সে হিন্দু এমন শুচিবাতিকগ্রস্ত কেন? সে শতাব্দী শতাব্দী ধরে' যারাই হিন্দু নয় তাদেরই 'পর নাসিকা কুঞ্চিত করে' ম্লেচ্ছ যবন ইত্যাদি নামে আপ্যায়িত করে' আস্‌ছে কেন? তারা অহিন্দু কাউকেই ছোঁয় না—কারও সঙ্গে খায় না এবং ছুঁলে খেলে তাদের ধর্ম্মের পতন হয়—একথা মনে করে কেন? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, হিন্দুর জীবনে ওটা অনেকটা আধুনিক কালের বস্তু—ওটা

তার শক্তিহীন অবস্থার কথা। হয়ত এর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক রহস্যও লুকিয়ে আছে। দেশের কথা যে কেবল একালেই অনেকের কাছে দ্বেষের কথা তা নয়, সকল কালেই সেটা কারো কারো কাছে কিছু কিছু তাই ছিল। যার সঙ্গে গায়ের জোরে পারিনে তাকে অস্পৃশ্য মনে করাই প্রশস্ত— এটা সকল বুদ্ধিমানেই বল্‌বেন। ওটা হচ্ছে হিন্দু সমাজের আচারের কথা—হয়ত তার আত্মরক্ষা কর্‌বার প্রয়াসের চিহ্ন। তবে আমাদের এম্‌নি কপাল যে, এখন এই সামাজিক আচার ব্যবহারগুলোই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের ধর্ম্মের আসল রহস্য। সামাজিক অনেক আচার বিচার যে আমাদের মনের কাছে ঘোর মিথ্যা হয়েও টিঁকে আছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা অন্তত শতকরা আশী জনা মনে করি যে, ঐ আচারগুলোই হচ্ছে বৈতরণী পার হবার আসল "লছমন ঝোলা"। তাই যখন আমাদের মধ্যে সৌখীন কেউ একখানা 'মাটন্ চপে'র পাশে পাশেই দুটো দ্বিজ-বিশেষের "হাফ্ বয়েল্‌ড্" অণ্ড নিয়ে জলযোগ কর্‌তে বসেন তখন চারিদিক থেকে অনুষ্টুপ ছন্দে সমস্বরে ঐক্যতান সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে যায়—গেল "ধর্ম্ম" গেল "জাত"! এখানে একথা আমার বলা মোটেই উদ্দেশ্য নয় যে, হিন্দু সমাজে বা অপর কোন সমাজে আচার বিচারে একটা পূর্ণ 'এনার্কিজ্‌ম্' রাজত্ব করুক, তাহলে মানুষের মধ্যে সমাজ যে জন্যে গড়ে উঠ্‌ল তা ব্যর্থই হবে; কারণ সমাজের পিছনেও একটা সত্য রয়েছে। এখানে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, হিন্দুর যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল—মানুষের জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান, মানুষের নিজের চোখের সাম্‌নে নিজেকে তুলে ধরা, নিজের সঙ্গে প্রকৃতির, জীবের সঙ্গে জগতের, জগতের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ ইত্যাদি

আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, মানুষের জীবনে যে একটা চিরন্তনের আনন্দ-রস ধারা অনাদিকাল থেকে প্রবহমান, তার আবিষ্কার ও উপলব্ধি—সেই ধর্ম্মের আজ কার্য্য হয়েছে হিন্দুর রন্ধন-শালার বিরুদ্ধে অভিযান। এ যেন কামধেনুকে দিয়ে ধান মাড়িয়ে নেওয়া—কামধেনুর অমৃত দেবার ক্ষমতার খোঁজই নেই। যদি বল যে জনসাধারণের কাছ থেকে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিকটার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করবার আশা করা পাগলামী।—তার উত্তর হচ্ছে এই যে, কেবল জন-সাধারণ নয়, আমাদের সমাজে হোম্‌রা চোম্‌রা যাঁরা, তাঁদের ধর্ম্মও হচ্ছে কোন্ দিন বেগুণ খেতে নেই ইত্যাদি। কিন্তু যাক্ সে কথা।

এখন সনাতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করা গেল, তাই যদি স্বীকার করি তবে কোন্ সাহসে আজ আমরা বল্‌ব যে, বৈষ্ণবের রসতত্ত্বই সকল বাঙালী হিন্দুর অন্তরে সকল কালে সরস হ'য়ে ও সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে বা থাক্‌বে? এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই সিদ্ধান্তটাই আপনি গড়িয়ে আসে যে, মানুষের বৈষ্ণবীভাব একটা ভাব, সনাতন ধর্ম্মে বৈষ্ণব "রিলিজন"-এর স্থান একটা স্থান, কিন্তু সব স্থানই তার নয়। এই বৈষ্ণব "রিলিজন"-কে যদি বাঙালীর ধর্ম্মের একাস্তরূপ বলে' বাংলাদেশের উপরে চাপিয়ে দি, তবে বাঙালী হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের আসল যে রহস্যটুকু তারই মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। এখন এই বৈষ্ণবীভাব যদি প্রত্যেক বাঙালীর কাঁধে বাহির থেকে চাপিয়ে দি, তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজের কাছে নিজে মিথ্যা হ'য়ে উঠ্‌বেন, সেই মিথ্যার মধ্যে দুর্ব্বল যাঁরা, তাঁরা কোন দিন আপনার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবেন না—আর শক্তিমান যাঁরা, তাঁরা বাহিরের ঐ মিথ্যার জাল ছিঁড়ে ফেলে আপনার নিজের অন্তরের সত্যকে আনন্দ-বীণা বাজিয়ে জগতের

মেলায় অভিনন্দিত কর্‌বে। হিন্দুর ধর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম। মানুষের ধর্ম্মে ভগবান নিজেকে এক স্থানেই একান্ত করে' বেঁধে রাখেন নি। দিকে দিকে তাঁর আনন্দ-বীণা সহস্র সুরে, সহস্র রাগিনীতে বাজ্‌ছে—দিকে দিকে তাঁর আনন্দ-স্বরূপ, সহস্র রূপে সহস্র নামে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই সহস্র সুর সহস্র রূপ থেকে হিন্দু মানুষকে খণ্ডিত কর্‌তে চায় নি—কোন দিন বাঙালী হিন্দুও তা থেকে বঞ্চিত হ'তে চাইবে না—এই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। আর এই কারণেই হিন্দুর ধর্ম্ম সনতান ধর্ম্ম।

হিন্দু ধর্ম্মের এই উদারতা, বাঙালী হিন্দুকে মান্‌তে হবে। কিন্তু যদি সে নাও মানে তবে, এই উদারতাই তার জীবনে চিরকাল কার্য্যকরী হ'য়ে থাক্‌বে—কারণ মানুষের জীবনে এই উদারতাই চিরকালের সত্য। আর মানুষ মানুক বা না মানুক, সত্য সব সময়েই তার অজ্ঞাতসারেও আপনাকে জয়যুক্ত করে' তোলে। মানুষ যতই মনে করুক না যে, সে এককালে স্থানুর মতো অচল অটল হয়ে থাক্‌বে, তা সে পারবে না—অনিচ্ছাসত্ত্বে হয় সে এগিয়ে যাবে, নয় অজ্ঞাতসারে সে পিছিয়ে পড়্‌বে, কারণ জীবন বলে' যে জিনিস সেটা জড় নয়, আর সৃষ্টির মধ্যে যার সাম্‌নে গতি নেই তারই অগতি, আর অগতি মানেই দুর্গতি।

সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিক্‌টায় যদি বৈষ্ণব রসতত্ত্বই একমাত্র সত্য না হয়—তবে বাঙালী হিন্দুর জাতীয়তাও তা নয়। কারণ একটা জাতির আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা একই জিনিস—শুধু একটা হচ্ছে ভিতরের স্বরূপ, আর একটা হচ্ছে বাহিরের রূপ।

এখন পূর্ব্বপক্ষ এর উত্তরে একটা কথা বল্‌তে পারেন। তাঁরা

বল্‌তে পারেন—"হে তর্কবাগীশ লেখক! তোমার তর্ক সব বাজে। কিম্বা যদি বাজে নাও হয় তাহলে আমাদের ক্ষতি নেই। কারণ তুমি ধর্ম্মের যে উদারতাই দেখাও না কেন—আমাদের যে কথা, সে হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির কথা। আমরা দিব্যদৃষ্টিতে আজ বাঙালীর প্রকৃতিকে স্পষ্ট দেখেছি। আর দেখেছি সে প্রকৃতির গলায় তুলসীর মালা, নাঁকের ডগায় কনকোজ্জ্বল তিলক, হাতে একতারা, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে পদাবলী। বাঙালীর প্রকৃতি বৈষ্ণবী। আর সেই জন্যেই আজ আমরা বাঙালীকে আর সব মিথ্যা পথ ত্যাগ করিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছি। এই পথই বাঙালার সত্য—সুতরাং এই পথেই তার জীবনের সিদ্ধি ও সার্থকতা।"

এর উত্তরে আমরা শুধু এইটুকু বল্‌ব যে,—তাঁরা ভুল দেখেছেন। আর তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যেদিন কীর্ত্তনের ভাবতরঙ্গে "শান্তিপুর ডুবুডুবু আর ন'দে ভেসে যায়" যায় হয়েছিল সেদিনও সমস্ত বাংলা বৈষ্ণব হ'য়ে যায় নি।

(৩)

আজ আমাদের সবারই মনের কোণে গোপন একটা আশা—একটা স্বপ্ন আপনাকে স্পষ্ট করে' তুল্‌ছে। আমরা সবাই আজ অনুভব কর্‌ছি, বাঙালী একদিন এ জগতের দশজনের মধ্যে একজন হ'য়ে মাথা উঁচু করে' মানুষের মতো দাঁড়াবে। আর তা কর্‌তে হ'লে প্রথম কর্ত্তব্য—এই জগতে শত সহস্র দ্বন্দ্ব কোলাহলের মধ্যে আপনাকে বাঁচিয়ে চলা। আর সেজন্যে ভগবানকে শুধু প্রেমময় বলে'

জান্‌লেই হবে না—তাঁকে শক্তিময় বলেও মান্‌তে হবে। আমাদের আত্মাকে আজ রসতত্ত্বের মিষ্টি হাঁড়িতেই ডুবিয়ে রাখ্‌লে চল্‌বে না—শক্তির রাজমুকুটেও তাকে মণ্ডিত কর্‌তে হবে।

তাই আজ আমরা আশা কর্‌ব—ঐ মনের কোণে গোপন আশা স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা কর্‌ব— তরুণ বাংলার অন্তরে অন্তরে নেমে আসুক প্রাণের স্রোতের "পাগ্‌লা ঝোরা।" নেমে আসুক আজ সে "পাগ্‌লা ঝোরা"—উর্ব্বরতাহীন অর্থহীন শত সহস্র সংস্কারের শক্ত মাটী কেটে কেটে—মনের জমাট বাঁধা পাষাণ ভার টলিয়ে দিয়ে দিয়ে—পুরাতনকে আপনার কাছ থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিয়ে—নতুনকে আপনার কাছে আপনাকে সত্য করে' সার্থক করে' তুলে তুলে। নেমে আসুক "পাগ্‌লা ঝোরা,"—এই তরুণ বাংলার উপরে শত ধারায় সহস্র ধারায়— শিল্পে, কথায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, যশে গৌরবে—সহস্র দিক মুক্তির গান গেয়ে গেয়ে—তৃপ্তির গান গেয়ে গেয়ে। আত্মার মুক্তি হোক্—আত্মার তৃপ্তি হোক্। আজ যে তরুণ বাংলার হৃদয়ে আকুল স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে—মুক্তি, মুক্তি। সে মুক্তি কেবল বাহিরের নয়—ভিতরের ;—কেবল দেহের নয়—অন্তরের। সে যে আজ—

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে যায়
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়।

আজ সে যে এ জগতের মুখ নতুন করে' দেখেছে। তাই আজ তার প্রাণে প্রাণে নতুন সুর বেজে উঠেছে—

দেখিব না আজ নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে
আমি—ঢালিব করুণা ধারা,
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

সে আজ নিজের পথ নিজে কেটে কেটে চল্‌বে। সে পথ যদি অতীতের সঙ্গে মেলে তবে মিলুক—কিন্তু অতীতের অনুকরণ সে করবে না—তাতে পদে পদে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রোম।

(প্রথম প্রস্তাব)

(১)

জোর করে' লেগে থাক্‌লে দেখ্‌ছি অসাধ্যও সাধন করা যায়। এভ্‌রিম্যানের অনুবাদে' চার ভালুম মম্‌সেনের রোমের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। অবশ্য এ পুঁথির শেষে পৌঁছে দেখি গোড়াঁর দিক্‌কার অনেক কথা, মনের মধ্যে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। কেল্টজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার করুণ কাহিনী, স্যাম্‌নাইটদের রোমের নাগপাশ থেকে মুক্তির বৃথা প্রয়াসের ইতিহাসকে একরকম ঢেকে ফেলেছে। সিজারের জয়ধ্বনিতে, হ্যানিবালের স্তুতিগানও প্রায় ডুবে গেছে। সন তারিখের ত কথাই নাই। প্রথম থেকেই তার গোলযোগ সুরু হয়েছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সব একাকার হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনারও লোপ ঘটেছে। মোট কথা, রোমের ইতিহাসে পরীক্ষা দিতে বস্‌লে যে, সে পরীক্ষাতে ফেল হব এটা নিশ্চয়। তবুও ল্যাটিন্ জাতির বিজয় যাত্রার এই অধ্যায়গুলি, মম্‌সেনের বর্ণনায় মনের মধ্যে যে দাগ কেটে গেছে, তা সহসা মুছে যাবে না। ভূ-মধ্যসাগরের চার পাশের যে ভূ-খণ্ডকে আধুনিক যুগের রোমের ঐতিহাসিকেরাও পৃথিবী বলেই উল্লেখ করেন, তার বহু রাজ্য ও বিচিত্র জাতিগুলির উপর রোমের এক-রাট্ ও একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মনকে যে দোলা দিয়েছে, তার বেগ শেষ হতে কিছু সময় লাগ্‌বে।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মমসেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংরেজি অনুবাদের বাঙ্গলা তর্জ্জমা ক'রে' দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই ক'র্ব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বল্‌তে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্ন-তত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য্য—এ দুয়ের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়্‌তে সুরু করেছেন তাঁরা হয়ত আর অগ্রসর না হ'লেই ভাল কর্‌বেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উল্টে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা একবার শেষ পর্য্যন্ত পড়বার চেষ্টা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন।

(২)

প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাষ্টার ম'শায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাক্‌তে তাঁরা যে কেমন করে হিন্দু-সভ্যতার মত এমন দুর্ব্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে বস্‌লেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেম্‌নি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানা রকম সম্ভব অসম্ভব, অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদের প্রচার করেছেন। গল্প আছে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্‌ রয়েল সোসাইটীর নতুন প্রতিষ্ঠা করে' পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, মাছ মর্‌লেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে

গলদঘর্ম্ম হয়ে গেলেন। অবশেষে একজন বল্লেন, আচ্ছা দেখাই যাক্ না ওজন ক'রে, মাছটা মরলেই তা যথার্থ বেশী ভারী হয়ে ওঠে কিনা। মম্‌সেনের বিপুলায়তন পুঁথি শেষ করে' এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমান-সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হাল্কা বলেছেন, 'সভ্যতা' বল্‌তে তাঁরা কি বোঝেন? সভ্যতার কোন্ মাপকাটিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন্ তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমান-সভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোক ঝল্‌সে গেছে, এ ত একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারি সাহায্যে উত্তরের ইট্রাস্‌কানদের ধ্বংশ করে' ইতালীর আর সকল জাতিগুলোকে পিষে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়ানের ওপারের প্রবল রাজ্যটা, সিসিলির সেতু পার হয়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কা-তেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালীর সাহায্যে তাকে সমূলে উচ্ছেদ; এবং কার্থেজের অধিনায়ক 'হামিলকার ব্যর্কা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা সুরু করে' বজ্র হয়ে রোমের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্য বিস্তার। এম্‌নি ক'রে দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচ্‌ল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পূবের দিকে। গায়ে জোর থাকলে এ 'আশঙ্কার' ত আর শেষ নাই। পূবে তখন ছিল আলেক্‌জেণ্ডারের ভাঙা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা। ওরি মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল—ম্যাসিডন আর এশিয়া, তারা তখন রোমেরই যুদ্ধ

আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে' নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জ্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে' রাজ্য ও বলবৃদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ করতে হ'ল; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেঁটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি নড়াচড়া না করে' ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হ'ল। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর করলে না। ইতালীতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। তারি গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রীসের ছোট ছোট নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে' রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশি দিন খেলতে পারল না। কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হ'ল—স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা করতে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রীসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে', ম্যাসিডনের আবার মাথা তুলবার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ করল, তখন এই পূবের দেশগুলির আধা স্বাধীনতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজা-সুজি এদের করায়ত্ত করে' নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাকল না। এর পর রোমান চোখের দিক্‌চক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকী থাকল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হ'ল

না। অবস্থা দেখে তারা আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা টেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠ্‌ল তখন কাজে কাজেই তার "বৈজ্ঞানিক চৌহদ্দি"-রও খোঁজ পড়্‌ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথ্‌রেডেসিরের রোমের শিকল ভেঙ্গে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পূব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেক্‌ল, এবং স্বয়ং জুলিয়স কেল্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন্। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও আবির্ভাব হতে খুব বেশি বিলম্ব ঘট্‌ল না। কেননা তিন শ বছর রাজ্য-জয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হয়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হ'ত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিন শ বছর ধরে' এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোন রকমেই আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা কর্‌লেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটি-জেনের' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাব্‌জেক্ট'। উঁচু আশা ও বড় আকাঙ্ক্ষার তাড়না না থাক্‌লে যে শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘরকন্নার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে উঠ্‌ল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মত রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়্‌ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূ-মধ্যসাগর ছেড়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় কর্‌ল। তারি তীরে তীরে

নবীন নানা জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হ'ল।

(৩)

এই যে ছয় সাত শ বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিকাল ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনীরও এই হ'ল অন্তত চোদ্দ আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা দূরে থাক্, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নীচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের সাম্‌নে থাকলেও নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগষ্টাশের সভাকবি তাঁর যুগের আত্মবিস্মৃত রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ছেন,—'জানি আর আর সব জাতি আছে যারা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাস খুঁজে বের কর্‌তে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্ত্তা এঁকে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেঁথে লোকের করতালি নিতেও তারা পটু, কিন্তু রোমান, এ সব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হ'ল—সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হ'ল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হ'ল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উঁচুমাথাকে যুদ্ধে নীচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান। 'এনিড' যে ইতিহাস নয় কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানোর কথা বলে' ভার্জিল বোধ হয় তারি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ

বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যা হোক, ল্যাটিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটা আধুনিক কালের রোমান-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এক রকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরি মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতে হ'লে জাতির মধ্যে যে বীর্য্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বল্‌লে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হতে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমুর্ত্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মম্‌সেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাব গণনা করে চোখের সুমুখে যখনি যাকে প্রবল বা বর্দ্ধিষ্ণু দেখেছে তারি বুকের উপর পড়ে, তার জীবনের রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না করেই পারে না; খৃষ্টান ও পার্শি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোমের এই প্রবল পলিটিকাল সভ্যতা, কেবল সম-সাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে রাখে নি, কিন্তু উত্তর-কালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে' রেখেছে। প্রাণতত্ত্ব-

বিদেরা হয় বল্‌বেন মানুষ পশুরই বংশধর; শক্তির বিকাশ দেখ্‌লেই পূজা না করে' থাক্‌তে পারে না। মম্‌সেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মত রাষ্ট্র গড়্‌তে পারে নি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খতা। কেননা গ্রীক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে' তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে', গ্রীসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রীসে জাতীয় একত্বের যখনি বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে' নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপিডিসের নাটক এই সবই ছিল হেলাসের ঐক্য-বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস কি আরিস্ট'ফেনিসের জন্ম দেয় নি বলে রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্ম্মমভাবে দমন করেছে। ফলে হয়ত ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে পড়েছে; কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও 'পেট্রিয়টিজম', গ্রীসের জীবনে যার কোনও দিন প্রবেশ ঘটে নি। এবং প্রাচীন সভ্য-জাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হয়েছে। সেই জাতীয় ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলেনিক জাতির উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হয়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'পুরুষের' শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই 'পরা গতি'। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানব সভ্যতার 'পুরুষ', তার 'কাষ্ঠা' ও 'পরা গতি'! ঐ প্রভুত্ব ত

কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয়; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েক খানি নাটক রয়েছে। এগুলি ত কেবল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশ শ' বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মত আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠ্‌ছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানব-সভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হয়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান কর্‌বে। আর রোমের প্রভুত্ব?—সেটি রয়েছে—ঐ মম্‌সেনের পৃষ্ঠায়। এই যে প্রভেদ, এ ত মম্‌সেনের চার ভ্যলুমও মুছে ফেল্‌তে পারে না। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে' আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা বয়ে যাচ্ছে—কেবলই কালের মধ্য দিয়ে, জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নতুন জাতি, নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখ্‌ছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে' ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট কর্‌ছে; কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংশ নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে ত পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ চির-নূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্ম্মাণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত

হয়ে উঠ্‌ছে। হোক্ না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপুর। কিন্তু মানুষ ত কেবল জীব নয়। সে যে মর অমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হয়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে ; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তা চিরদিন সমান মধুর।

দুই সভ্যতার যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা কর্‌তে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই অক্ষয় ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হ'ল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপ কাটিতে মাপ্‌লে, রোমান সভ্যতা গ্রীক কি হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যতদিন তার সাম্রাজ্য ছিল, ততদিন তার বলের কাছে —সবারই মাথা নীচু করে' থাক্‌তে হয়েছে। কিন্তু উত্তর কালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্ভ্রমে নতশির হবে ? তাদের জন্য ত সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে' রেখে যায় নি। তার যা প্রধান দাবী, তার পলিটিকাল শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা ত তার সম-সাময়িকেরা এক রকম ষোল আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবীর জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চৌদ্দ আনা হ'ল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনী হলে'ও জীবন নয়, কেবলি কাহিনী। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসী পণ্ডিত রোমানদের দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে গুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার-ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মত মনে হলেও যাদের জন্য সে গুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর

প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝতে হ'লে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে সব মিলিয়ে পড়তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

(৪)

রোমের পলিটিকাল গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে' যায় নি। সেই জন্য য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে' কতটা ঋণী, মম্‌সেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই—রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্ব্ব-পুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখ্‌ত, তবে তারা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে তাকে ধ্বংশ করেছিল, সে ঘটনাটি ঘট্‌ত আরও চার-শ' বছর আগে। এবং তা হলে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে,—স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারেনিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে' উঠ্‌ত না। আর তার ফল হ'ত এই যে, ঐ অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগুলি যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা গড়ে' তুলেছে, তা কখনই গড়তে পারত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা এক রকমে ঘটে গেছে, সেটা সে রকম না ঘটে' অন্য রকম ঘট্‌লে তার ফলাফল কি হ'ত এ তর্ক নিরর্থক।

তাতে 'স্বপ্নলব্ধ' ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্ব্বিবাদেই দেওয়া যাক্। কিন্তু এ ত রোমান সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনী নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চার-শ' বছর ধরে' রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেন নি। আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেননা রোম যদি আরও চার-শ' বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখ্‌তে পারত, তবে ত আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আরও চার-শ' বছর পিছিয়ে যেত, এবং হয় ত সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠ্‌তে পার্‌ত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চার-শ' বছর ধরে' পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হ'ল কি? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিকাল সভ্যতা, রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাশনের সভ্যতার, উপর এটা একটা বিস্তৃত ভাষ্য। বিস্তীর্ণ বাগানের চার পাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হ'ল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নস্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হয়ে' দাঁড়িয়ে থাক্‌ল কিন্তু বাগানে ফুলও ফুট্‌ল না, ফলও পাক্‌ল না।

(৫)

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের

দিকেই টানবে। যেই যখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তারি মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংশ করে' পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব লাভেরই পথ। এ যে অতি-শয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মমসেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মমসেন এই বলে' আরম্ভ করেছেন—যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার যো নেই, তেমনি এও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হ'য়ে গড়ে উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস করবে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশিদের উচ্ছেদ করবে। এই নিয়মের বলে ইতালীয় জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিকাল উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণ ভাবে এবং কতকটা বহিরা-বরণের মতই ছিল) পূবের গ্রীকদের, যাদের ধ্বংশের সময় পূর্ণ হয়ে এসেছিল, তাদের করায়াত্ত করতে, এবং পশ্চিমের কেল্ট জার্ম্মাণদের, যারা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন করতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে' অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবী হয়ত হেগেলের 'লজিকে'ও মিলবে না। সে যাই হোক্ এ 'নিয়ম' ও 'অধিকারের' মুস্কিল এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাকতে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ 'অধিকার' প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বসতে পারলেই প্রমাণ হ'ল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর

তাই হল এ অধিকার প্রমাণের একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাক্‌লেই যখন 'অধিকার' আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না কর্‌লে ত শক্তিটা ঠিক আছে কিনা তা আগে থেকে অমনি জানবার উপায় নেই। শেষ পর্য্যন্ত ফেল হ'লেও "হলে" ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে'? গেল চার বছর ধরে' এই পরীক্ষাটা সারা য়ুরোপ জোড়া চল্‌ছে। মম্‌সেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তাঁর প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয় নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্ম্মাণির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্ম্মাণির পক্ষে অগৌরবের কিসে? আজকার পলিটিক্সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন্ ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিকাল শক্তি ও সভ্যতার স্তুতিগান—এ মূলে হ'ল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি 'অধ্যাস',—একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে' আস্‌ছে, আর কোন 'লীগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে' যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লীগের' একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যারা আসবে না তারা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের একজমালীতে দমন করা চল্‌বে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়—পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়—

ধ্বংসের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হ'ল 'অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয়' হ'লে-ত 'অধ্যাসেরও' উৎপত্তি হয় না।

(৬)

আমার এ প্রবন্ধটা যখন আগাগোড়াই অল্পবিস্তর অবান্তর রকমের, তখন নির্ভয়ে একটা খাঁটি অবান্তর কথা দিয়েই এর প্রথম প্রস্তাব শেষ করা যাক্।

ভাদ্রের 'সবুজ পত্রে' শ্রীমান চিরকিশোরের বরাবর শ্রীযুক্ত বীরবলের যে চিঠি বেরিয়েছে, তাতে জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের 'সিসেরোর' প্রেতাত্মার গায়ে লেখনীর নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের কথাটা তোলা হয়েছে। এবং এ কাজটাতে যে তাঁরা আন্টনীর পত্নী 'ফুল্‌ভিয়াব' মত পতি-ভক্তিরই পরিচয় দিচ্ছেন, যে পতি হলেন সীজার—যিনি জার্ম্মাণিতে 'কাইজার'রূপ নিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে।

এই যে সিসেরো-বিদ্বেষ, আর সিজার প্রীতি, মম্‌সেনকে এ দুয়েরই এক রকম সৃষ্টিকর্ত্তা বলা চলে। তাঁর 'রোমান ইতিহাস' বের হওয়ার পর থেকেই এ দুটি মনোভাব ইউরোপে অতি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা মম্‌সেনের হাতে সিসেরোর মত "ভাষায় বিদ্যুন্মণ্ডিত বজ্র" ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁর 'ইতিহাস' হ'ল আদিম অরণ্যের প্রকাণ্ড বট। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাড়্‌তে বাড়্‌তে তা মনের অন্তঃস্তল ভেদ করে এমন গভীর শিকড় ঢুকিয়ে দেয়, শাখা থেকে বহু পদ

নামিয়ে সমস্ত মনকে এমন করে' আঁকড়ে ধরে, যে তাকে মন থেকে উপড়ে ফেল্‌তে প্রায় প্রলয়ের ঝড়ের প্রয়োজন হয়। তবে আপাতত ইতালী আর ফ্রান্সে একটু একটু করে' সুর বদলাচ্ছে। কিন্তু একটা অপরাধের দায় থেকে মম্‌সেনকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর যে সীজার স্তুতি, তা এক অদ্বিতীয় সিজার অর্থাৎ 'গোয়াস জুলিয়াস সিজার'-এরই স্তুতি। মাতৃভাষায় অনুবাদ হ'লেও 'কাইজারের' স্তুতি নয়। মম্‌সেন তাঁর 'রোমান ইতিহাসের' যে জায়গায় এ কথাটা খুলে বলেছেন তা ভাবে ও ভাষায় এমন তাজা ও চোখা যে মহামহোপাধ্যায় জর্ম্মাণ অধ্যাপকের রচনা হ'লেও সেটা 'বীরবলের' লেখাতেও চল্‌তে পারে। মম্‌সেনের সেই কয়টি কথা উদ্ধৃত করে' বক্তব্য শেষ করব। মম্‌সেন থেকে অনুবাদ করব না প্রতিজ্ঞা করে' পাঠকদের আরম্ভেই যে ভরসা দিয়েছি এতে সম্ভব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা এ কটি লাইন ইতিহাসও নয়, প্রত্নতত্ত্বও নয়।

আমাদের পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি মহেশ্বরের যেমন সব স্তব আছে, 'জুলিয়াস সিজারের' সেই রকম একটা স্তবের পর মম্‌সেন লিখেছেন—

ঐতিহাসিকেরা সব সময়েই মনে মনে একটা কথা ধরে' নেন যেটা হয়ত একবার এখানে প্রকাশ করে' বলাই ভাল। ইতিহাসের যে নিন্দা ও ইতিহাসের যে প্রশংসা তাকে তার চারপাশের ঘটনা ও অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' কোনও শ্রেণীবিশেষের মানুষ, কি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ 'নিন্দা প্রশংসা' হিসাবে প্রয়োগ করা চলে না। সে চেষ্টা করে—হয় যার মগজে বুদ্ধি নাই, না হয় যার মনে মতলব আছে। সুতরাং এখানে সিজারের যে বিচার ও মূল্য নির্দ্ধারণ, সেটাকে যেন কেউ 'সিজারিয়ানিজিমের' অর্থাৎ সিজার-তন্ত্রের মূল্যনিরূপণ বলে'

চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করে। অতীত যুগের ইতিহাস যে বর্ত্তমানের শিক্ষাদাতা একথা সত্য। কিন্তু এর এমন গ্রাম্য ও মোটা অর্থ নয় যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে গেলেই কোন না কোন জায়গায় বর্ত্তমানটা-কেই হুবহু দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, এবং আজকার দিনের পলিটিকাল ব্যাধির নিদান ও ব্যবস্থাপত্র একবারে হাতে হাতেই মিল্‌বে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভ্যতার ইতিহাস কেবল তখনি শিক্ষাপ্রদ, যখন তা থেকে মানুষের সভ্যতার প্রাণশক্তিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, যে শক্তিগুলির মুল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক, কিন্তু যাদের সংমিশ্রণের রীতি প্রতি-জায়গাতেই বিভিন্ন, এবং যখন তা মানুষকে অন্ধ অনুকরণের পথে না নিয়ে গিয়ে নবীন সৃষ্টির কাজেই উৎসাহ দেয়। এই হিসাবে সিজার ও রোমান 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-এর ইতিহাস, তার সমস্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠাতার অমানুষী প্রতিভা সত্ত্বেও, আজকার দিনের 'অটক্রেসির' যে তিক্ত ও কঠোর সমালোচনা, তেমন সমালোচনা কোন মানুষের হাতের লেখা থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে নৈসর্গিক নিয়মে অতি ক্ষুদ্র জীবদেহের কাছেও গঠন কৌশলের পরা-কাষ্ঠায় হাতগড়া যন্ত্রের হার মান্‌তে হয়, ঠিক সেই নিয়মেই যে শাসনতন্ত্রে দেশের অধিকাংশ লোকের নিজেদের ভালমন্দ নিজেদেরই স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার অবকাশ আছে, তা বহু বিষয়ে অপূর্ণ ও নানা দোষে দুষ্ট হ'লেও অতি ভাস্বর ও পিতৃতুল্য 'অটক্রেসি'রও তার সঙ্গে তুলনা চলে না। কেননা ওর একটির বিকাশ ও বৃদ্ধির সম্ভাবনার শেষ নাই, অর্থাৎ তার জীবন আছে; অপরটি যা তাই, অর্থাৎ মৃত। রোমান 'ইম্পিরিয়ালিজম্'-এর সেনাপতি-তন্ত্রের ইতিহাসে এই নৈসর্গিক নিয়মটির পরীক্ষা হয়ে গেছে, এবং সে হ'ল চরম পরীক্ষা। কেননা

এর সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিভার বেগে এবং সমস্ত রকম বাইরের বাধার অভাবে এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি যেমন অমিশ্র ও অবাধ ভাবে গড়ে' উঠতে পেরেছিল এমন আর কোথাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু তবুও, যেমন গিবন অনেক পূর্ব্বেই দেখিয়েছেন, সিজারের সময় থেকেই রোমান রাষ্ট্রের ঐক্যটা ছিল কেবল বাইরের চাপের ঐক্য, এর গতি ছিল কলের চলা। এবং এর জীবনের রস নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে এর অন্তরটা তখন থেকেই হয়েছিল একবারে মৃত। যদি 'অটক্রেসির' প্রথম যুগে, এবং সব চেয়ে সীজারের নিজের মনে, রাজ-শাসনের একাধিপত্যের সঙ্গে জনসাধারণের উন্নতির স্বাধীন বিকাশের একটা মিলনের স্বপ্ন উঠে থাকে, তবে জুলিয়ান বংশের প্রতিভাশালী নৃপতিদের রাজ্য-শাসনে সে স্বপ্ন টুটতে বেশি দেরী হয় নি। আগুন আর জল এক পাত্রে রক্ষা করাটা যে কতদূর সম্ভব তার পরীক্ষাটা লোকের চোখের সাম্‌নে খুব ভীষণ রকমেই হয়েছিল। ইতিহাসে সিজারের সে কাজ তার প্রয়োজন ছিল, এবং তাতে সুফলও ফলেছিল। কিন্তু সে কাজ এমন নয় যার নিজেরই ভিতরেই কোনও মঙ্গল আছে। সেটা ছিল সমস্ত রকম গস্তবপর অমঙ্গলের মধ্যে সব চেয়ে কম অমঙ্গল। যে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাসত্ব প্রথা, জন সাধারণের প্রতিনিধিমূলক শাসন যার কল্পনাতে কখনও ওঠে নি, যার প্রচলিত রাষ্ট্রপ্রণালী ছিল পাঁচ-শ' বছরের পুরাণো—যা এই আধ-হাজার বছরের মধ্যে পরিণত হয়েছিল প্রবল ও খাঁটি ধনীতন্ত্রে, সে ব্যবস্থার সাম্‌নে সিজারের সেনাপতি-তন্ত্রের একাধিপত্যই ছিল একমাত্র বাঁচবার পথ। ইতিহাসের বিচারে সিজারের 'সিজারিয়ানিজম্'-এর এই হ'ল বৈধতার দলিল। যখন ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যেও 'সিজারিয়ানিজম্'

মাথা তোলে, তখন সেটা একদিকে জবর দখল, অন্যদিকে মুখ-ভেংচান। কিন্তু ইতিহাস আসল সিজারকে তার প্রাপ্য সম্মানের এক চুল থেকেও বঞ্চিত কর্‌তে রাজী হবে না। যদিও সে জানে যে, তার বিচার শুনে, হয় ত অতিসরল ব্যক্তিরা জাল-সিজারদের সাম্‌নেও মাথা নোয়াবে, এবং অতিশঠ ব্যক্তিরা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার একটা সুযোগ পাবে। কেননা ইতিহাসও একটা বাইবেল। এবং বাইবেলেরই মত যদিও সে মূর্খকেও ভুল বোঝা থেকে বারণ কর্‌তে পারে না, এবং সয়তানকেও বচন তুলে আওড়াতে বাধা দিতে পারে না, তবুও তারি মত এ দুই ব্যক্তিকেও সহ্য কর্‌বার এবং মার্জ্জনা করবার ক্ষমতা তারও আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

নব-বিদ্যালয়।

(ভাষা-শিক্ষা)

——:*:——

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু।

আমরা যখন বাঙলা ভাষাকে স্কুল কলেজের ভাষা করে তোল্‌বার প্রস্তাব করি, তখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক, আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিশ্বাস বাঙলা, বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজি শিখ্‌বে না। এর পাল্টা জবাব অবশ্য এই যে, তারা ইংরাজি না শিখ্‌তে পারে কিন্তু বিদ্যা শিখ্‌বে। কিন্তু এ জবাবে কারও মন ভিজ্‌বে না। আমাদের দেশের কর্ত্তাব্যক্তিরা এর উত্তরে সমস্বরে বলবেন যে, সে বিদ্যে নিয়ে কি হবে—যার সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। ইংরাজি না জান্‌লে যে ভদ্রসন্তানের 'দিন আনা দিন খাওয়া' চলে না, এ কথা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেও জানে। ও ভাষায় অজ্ঞ হলে যে আমাদের ওকালতি, ডাক্তারি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারি, এমন কি রাজ-নীতির নেতাগিরি করাও বন্ধ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং এসব ক্রিয়া বন্ধ হলে বাঙালীর জীবনে আর কি কাজ থাকবে? ও অবস্থায় আমরা যে ঘরে বসে সাহিত্য রচনা করব তারও সম্ভাবনা কম। যা কথায় কথায় ইংরাজির তরজমা নয়, তা যে বাঙলা

সাহিত্য, অন্তত সাধু-বাঙ্‌লা সাহিত্য হতে পারে না, তার প্রমাণ শতকরা নিরনব্বই জন বাঙ্‌লা গদ্য লেখকের লেখায় অর্থাৎ আমাদের সকলের লেখায় নিত্যই পাওয়া যায়। অতএব ইংরাজি না শিখ্‌লে যে বাঙ্‌লার সর্ব্বনাশ হবে, এ বিষয়ে দ্বি মত নেই—এবং থাকতে পারে না। তবে বাঙলা না শেখাটা ইংরাজি শিক্ষার সদুপায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রসাদে দেশের লোক যে ইংরাজি শিখ্‌ছে—ইংরাজি নবিশদের এই ধারণাটি অনেকটা অমূলক। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে'—আমাদের বিদ্যার্থীরা যে, ইংরাজি ভাষার উপর কতটা অধিকার লাভ করে, তার পরিচয় যিনি কখন B. L. পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করেছেন, তিনিই পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে যাঁদের হাতে উকিলের সনন্দ দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাধু-ইংরাজি লেখা দূরে থাকু শুদ্ধ ইংরাজিও লেখেন না, শতকরা পঁচিশজন লেখেন বাবু-ইংলিশ, আর শতকরা দশজন যা লেখেন, তা দিনেমার ওলন্দাজ কিম্বা আলেমানের ভাষা হতে পারে—কিন্তু ইংরাজের নয়; অথচ এঁরা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট! এত দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজি ভাষার এই একাগ্র চর্চ্চা এতটা বিফল হয় কেন? বাঙালী জাতি সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত নয়, তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণ কি?—কারণ এই যে, পাঁচ বৎসর বয়েসে ছেলেরা ইংরাজি ধরে এবং পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত তারা দিবারাত্র এক ঐ ইংরাজিরই চর্চ্চা করে।

সকল শিক্ষার মত, বিদেশীভাষা শিক্ষাও কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। শৈশব এ শিক্ষার উপযুক্ত কাল নয়, বালক এ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নয়। শিশুর দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ যা, বালকের মনের পক্ষে মাতৃভাষাও তাই। অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য বিনা বালকের মন গড়ে ওঠে না। ছেলেরা যে ভাষা অষ্টপ্রহর শোনে, আর যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা কয়, সেই ভাষার সাহাযেই তারা পরের কথা বুঝতে ও নিজের কথা বোঝাতে শেখে। ছেলের মন ও ছেলের ভাষা, ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ; সুতরাং এ দুই এক সঙ্গে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি গড়ে ওঠে। তারপর আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টাতেই মানবসন্তানের ভাষার উপর যথার্থ অধিকার জন্মে এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহের সঙ্গে তার মন এবং তার মনের সঙ্গে তার স্বভাষা-জ্ঞান যে এক রকম স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে বিদেশী ভাষা, সজ্ঞানে শিখতে হয়; সুতরাং তা শেখবার জন্য সেই মন চাই—যে-মন বালকের নেই। বারো বৎসর বয়েসের পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শেখবার চেষ্টাটা ছেলেদের পক্ষে যে, শুধু কষ্টকর ও ব্যর্থ, তাই নয়—তার মনের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। মদ্য মাংস সেবন ছোট ছেলের দেহের পক্ষে যতটা উপকারী, একটি বিদেশী ভাষার চর্চ্চা ছোট ছেলের মনের পক্ষে তার চাইতে বেশি উপকারী নয়। আমরা ছোট ছেলেদের তা গিলিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা জীর্ণ করবার শক্তি তাদের নেই। ফলে অল্প বয়েসে ইংরাজি শিখতে গিয়ে, আমাদের ছেলেরা ইংরাজিও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে না এবং লাভের মধ্যে শুধু মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মন ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষার চাপে জড় হয়ে

পড়ে, সে মন কৈশোর ও যৌবনে তার পূর্ণশক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ যুবকদের মনের যে দম ও কশ নেই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ইংরাজি শেখাটা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্য এতই প্রয়োজন, যে আমাদের সমাজের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক একবাক্যে বল্‌বেন,—হোক আমাদের ছেলেরা মনে পঙ্গু, তাদের ঐ পাঁচ, বছর বয়েস থেকেই A. B. C. শিখ্‌তে হবে, নচেৎ তারা বয়েসকালে ইংরাজি-নবিশ হতে পার্‌বে না। না ভেবেচিন্তে কথা কওয়াটা, বিশেষত সেই সব বিষয়ে— যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেননা অপর দেশের শিক্ষার প্রণালী এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু খোঁজ খবর রাখতেন, তাহলে এঁরা এ কথা জান্‌তেন যে, বারো বৎসর বয়েসের পরে, অর্থাৎ মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার লাভ করবার পরে, ছেলেরা দু-তিন বৎসরে বিদেশী ভাষা যতটা আয়ত্ত করতে পারে, পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে সুরু করে তারপর দশ বৎসরের অবিরাম চর্চ্চায় তার সিকির সিকিও পারে না। এই কারণে নব-বিদ্যালয়ে ছেলেদের বারো বৎসর বয়েসের আগে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার সংশ্রবে আস্‌তে দেওয়া হয় না। এদেশেও পুরাকালে উপনয়নের পরই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অতএব ভাষা শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে—মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বাঙালীমাত্রেরই অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশির ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা

বাঙলা লিখ্‌তে বস্‌লে অবিলম্বে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌বেন। সাহিত্যে আমাদের তুল্য মুখচোরা জাত যে অপর কোনও সভ্যদেশে নেই, তার কারণ আমাদের শিক্ষার গুণে আমরা আশৈশব আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাই নি। স্কুলের ছেলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব এবং বাঙলাতে করা বারণ। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ লোকের ভাষাজ্ঞান ছোট ছেলের জ্ঞানেরই সমতুল্য, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য যতখানি ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে ক'টি কথা না জান্‌লে নয়, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী সেই ক'টি নিত্য ব্যবহার্য্য কথাই অক্লেশে ব্যবহার কর্‌তে পারেন। আমাদের অন্তরে মাতৃভাষার ভিৎ আছে কিন্তু সে ভিৎ এত কাঁচা যে, তার উপর কি দেশী কি বিলেতি কোনও পাকা ভাষার ইমারৎ খাড়া করা যায় না। অতএব মাতৃভাষা যদি আমরা শিক্ষা করি, তাতে করে ইংরাজি-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হবে না; উপরন্তু, আমাদের মন সবল, সুস্থ এবং স-ক্রিয় হয়ে উঠ্‌বে। তখন আমাদের আর, এ বলে দুঃখ কর্‌তে হবে না যে, দেশে এত বিদ্যে আছে অথচ তা দেশের কোনও কাজে লাগে না। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের সকল বিদ্যা যে আমাদের মনের চক্রব্যূহে ঢুক্‌তে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না, তার কারণ আত্মপ্রকাশের সহজ পথটিই আমরা বাল্যকালেই ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়েছি।

মাতৃভাষাও শিক্ষা কর্‌বার জিনিষ, কিন্তু তাই বলে যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে আমরা একটি বিদেশী অথবা একটি মৃতভাষা শিক্ষা করি, সে উপায় সে পদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকও নয়—

উপযোগীও নয়। বিদ্যারম্ভেই অমরকোষ ও মুগ্ধবোধ কণ্ঠস্থ করাই হয়ত সংস্কৃত শেখার সহজ উপায়, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্যে কাউকেও মাতৃভাষা শিখ্‌তে হয় না; সুতরাং ও উপায় অবলম্বন করতে শিশুদেরও বাধ্য করা অসঙ্গত। যেউপায়ে ছেলেরা ভাষা নিজে শেখে, সেই উপায় অবলম্বন করেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, অতএব এশিক্ষার গোড়ায় ব্যাকরণ অভিধানের কোনও স্থান নেই। বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে, বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ শেখা। কিন্তু মাতৃভাষার গোড়াকার শিক্ষা হচ্ছে—বস্তুর সঙ্গে তার নামের, বাচ্যের সঙ্গে তার বাচকের সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা। ছেলেরা গ্রন্থ কিম্বা গুরুর সাহায্য না নিয়ে, আপনা হতেই যে-সব কথা শেখে, সেই শব্দসংগ্রহই হচ্ছে সব ভাষারই মূল উপাদান, এই উপাদান করায়ত্ত না করতে পারলে, ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার জন্মে না, এবং একটি বিদেশী-ভাষা শেখার মুস্কিলই এই যে, সে ভাষার মূল উপাদানের পুঁজি নিয়ে আমরা তার বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করতে বসি নে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষা লেখাপড়া দিয়ে সুরু করবার দরকার নেই, অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়াটা বিদ্যারম্ভের প্রথম ক্রিয়া নয়। নব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তারিত পরিচয় বারান্তরে দেব।

১লা অক্টোবর, ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।
